মহাশ্বেতা



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ঃ বারো

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ়, ১৩৬৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন, ১৩৬৭

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—বঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭/এ, বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট-শিল্পী
কানাইলাল পাল

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
প্রীতি ও স্নেহভাজনেষু

এক

"ক্ষমা কর। আমাকে তুমি ক্ষমা কর!" হাত থেকে বিনোবাবুর তুলিটা পড়ে গেল। ত্রস্ত কাতর কণ্ঠে অত্যন্ত দ্রুত কথা ক'টি বলে শেষ করলেন তিনি। যেমনভাবে অসম্বৃতবসনা তরুণী কারুর সাড়া পেয়ে কাপড়খানা সারা অঙ্গে জড়িয়ে ধরে; ঘরের মধ্যে হঠাৎ দপ করে আগুন জ্বলে উঠলে লোকে যেমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে দুই হাতে কিছু দিয়ে সে-আগুন চাপা দেয়, তেমনিভাবে। তেমনি লজ্জার সঙ্গে, তেমনি ভয়ার্ত কাতরতার সঙ্গে। কিন্তু নীরা আগুনের মত মেয়ে—জীবনে সে জ্বলেই আসছে—এ নিয়ে তার অনেক অহংকার এবং সে সচেতনভাবেই উদ্ধত হয়ে থাকে সদাসর্বদা। বিনো সেনের এ-লজ্জাকে সে চাবুক মেরে বলে উঠল—

—ক্ষমা? আপনার এ নির্লজ্জতা কি ক্ষমা করা যায়? ক্ষমার যোগ্য? আপনি না প্রবীণ? আজই না আপনার পঁয়তাল্লিশতম জন্মদিন পালন করেছি আমরা? আপনি না সর্বত্যাগী দেশসেবক? আশ্রম করে বসে আছেন? আপনি না খ্যাতিমান চিত্রশিল্পী? আজই আমি আপনাকে বরেণ্য ব্যক্তি বলে দশের সম্মুখে স্তুতি করেছি। কি ভেবেছিলেন আপনি? আপনার প্রেম-নিবেদন-করা পত্রখানি পেয়ে আমি বিগলিত হয়ে যাব? আমি আপনার প্রেমে পড়েই আছি?

যেহেতু না—আপনার আমি আশ্রিত! আপনার আশ্রমে চাকরী দিয়ে আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন—সুতরাং গল্প-উপন্যাসের যুক্তি অনুযায়ী কৃতজ্ঞতাহেতু প্রেমে পড়তে আমি বাধ্য!

—আমাকে তুমি ক্ষমা কর! বিনো সেন আবার কাতর মিনতি করে উঠলেন।

—না। ক্ষমা করব না। আপনি নির্লজ্জের চেয়েও আরো বেশী কিছু যার নাম আমি জানি না।

নীরা!

না-না। নীরা নয়। আমি নীরজা দেবী। নীরা বলে ডাকবেন না আপনি।

বেশ! এতক্ষণে একটু বিষণ্ণ অপ্রতিভ হাসি হেসে বিনোবাবু বললেন, কিন্তু একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না, নীরজা? তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট, তুমি আমার কাছে ছাত্রীর মত পড়েছ, তোমাকে আপনি বলতে বাধছে। এবং এমন অপরাধ কি করেছি আমি?

এবার জ্বলে উঠল নীরা।—কেন? কেন? কেন এ পত্র লিখেছেন আপনি?

এবার নিজেকে সংযত করে ধীর কণ্ঠে মাটির দিকে চেয়েই বিনো সেন বললেন—পত্রেই লেখা আছে। একটু থেমে আবার বললেন, তুমি অবিবাহিতা কুমারী—আমি অবিবাহিত; তোমাকে আমি চার বছর ধরে গড়ে তুলেছি। তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। ঘর চাই সংসার চাই—। নীরা, অকস্মাৎ আমার বাঁধ ভেঙে গেল। তুমি চলে যাবে—আমি সইতে পারলাম না।

কথার বাধা দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠল নীরা, আপনি চরিত্রহীন।

নীরা।

মর্মান্তিক যন্ত্রণায় এবার বিনো সেন যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

নীরা কিন্তু গ্রাহ্য করলে না; সেও যে ক্ষোভে এবং ক্ষোভের অতিরিক্ত একটা কোন আবেগে জ্ঞানশূন্য হয়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। সে রূঢ়তম কণ্ঠে বললে, নন চরিত্রহীন? তারপর স্থিরদৃষ্টিতে কয়েকমুহূর্ত তার দিকে চেয়ে থেকে বললে—

—তবে প্রতিমা দেবী কে?

আবার একটু চুপ করে থেকে বললে—ওঁকে আপনি ভালবাসেন বলেই কি এখানে আনেন নি? ওঁর মান অভিমান কারুর অজানা ভাবেন এখানে? আমার প্রতি আপনার এই গোপন আকর্ষণ আমি বুঝি নি কিন্তু উনি বুঝেছেন। উনি আপনাকে জানেন যে! লোকে অনুমান করে, আমিও করছিলাম, আপনার এ প্রেম পবিত্র প্রেম। বিবাহই যদি করবেন, তবে ওঁকে অবহেলা করে আমার কাছে নিবেদন কেন? আমি জানি ওঁর বুকের মধ্যে কি ক্ষোভ! ওঁকে চিঠিতে কি লিখেছিলেন? আমি দেখেছি চিঠি। ওঃ চরিত্রের সে কি বড়াই! কি নাটুকেপনা!

এবার ব্যঙ্গের সুরে চিঠির কথাগুলি বলে গেল—'আমাদের সম্পর্ক বিবাহের নয়, প্রতিমা আত্মসম্বরণ করতে হবে, আর আমার জীবন তো জান! বিবাহ তো আমি করব না!' ভদ্রমহিলার চোখের জলে বুক ভাসছিল, উপুড় হয়ে পড়েছিলেন, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছিলাম, চিঠিখানা উনি দেখান নি, আমি দেখে ফেলেছিলাম।

এবার মাথা হেঁট করে বিনোবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভেজানো দরজাটির আধখানা খুলে মাটির মূর্তির মত

দাঁড়িয়েছিল বিষণ্ণ প্রতিমা। দুটি চোখ বেয়ে তার জল গড়িয়ে নেমে আসছিল অবিশ্রান্ত ধারায়। মুহূর্তের জন্য তাকে তিনি দেখেছেন।

*　　　*　　　*

বাইরে অন্ধকার রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা : বাংলা দেশের একটি মফস্বল শহরের উপকণ্ঠে নির্জন গ্রাম্যপরিবেশের মধ্যে একটি অনাথ-আশ্রম। নিতান্ত সন্ধ্যাতেই—এখানে রাত্রির নিদ্রালু স্তব্ধতা নেমে আসে। ছেলেরা কিছু ঘুমোয়, কিছু ঢুলতে থাকে, দু চারজন পড়ে। শব্দ হয় রান্না ও খাবার জায়গায় ; চাকরেরা, পালাপড়া ছেলেদের নিয়ে অ্যালুমিনিয়মের গ্লাস সাজিয়ে যায়, কেউ তাতে জল ভরে দেয়, কেউ পিঁড়ি পাতে—তারই শব্দ হয়। এরই মধ্যে কখনও ওই নীরার কণ্ঠস্বর শোনা যায়, লাইন সোজা কর।

অথবা---

—না—না। তাড়াতাড়ি করো না, তাড়াতাড়ি নয়। দেখছ না জল পড়ছে, ভিজছে বসবার জায়গা ! তারপরই হয়তো—

—রমেন, তোমার শরীর বা মন কি আজ খারাপ আছে নাকি ?

ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর শোনা যায় না, কিন্তু নীরার কথায় বোঝা যায় যে, ছেলেটি বলেছে, না তো !

নীরার উত্তর শোনা যায়, তবে মুখে বিরক্তি কেন ? কাজ এমন দুমদাম্ করে করছো কেন ?

এরই মধ্যে প্রায়ই ছেলেদের বোর্ডিং থেকে উচ্চ চিৎকার আসে, দিদিমণি গো, দুটোতে খুন হবে এবার !

নীরা সঙ্গে সঙ্গে ছোটে টর্চটা হাতে, সেটা তার হাতেই থাকে, বলতে বলতে যায়, বাপরে বাপরে ! আর তো পারি নারে বাবা !

নতুন ইলেকট্রিক স্কীমে এখানে ইলেকট্রিক এসেছে অল্পদিন, কিন্তু তা এখন ঘরেই হয়েছে, আশ্রমটার বিস্তৃত পঞ্চাশ বিঘা জমির মধ্যে বাইরের কেবল একটা আলো, তাতে আলো আঁধারিরই সৃষ্টি ক'রে বিভ্রান্তি ঘটায়! টর্চটা না-হলে চলে না। গিয়ে দেখতে পায়, দুটো ছেলেতে নিঃশব্দে বা সশব্দে সরবে মল্লযুদ্ধ বা মুষ্টিযুদ্ধ লাগিয়েছে। নীরা গিয়েই দুটোকে আলাদা করে দেয়, ছাড়! ছাড়!

কিন্তু সে সহজ নয়, দুটোই দুটোকে ডেঁয়ো পিঁপড়ের কামড় দিয়ে ধরার মত ধরে থাকে। তবু নীরার কথায় ছাড়তে হয়। নীরার প্রভাব ওদের উপর অসাধারণ। ছাড়বার পরই বিস্ফোরণ হয়, কেন ও আমাকে—। সে ফোঁপাতে থাকে। দুজনেই অনাথ ছেলে—তাদের অভিমান ক্ষোভ বিচিত্র। ব্যাপ্তিতে বিশ্বজোড়া, উচ্চতায় বোধ করি আকাশ-প্রমাণ। সে কথা নীরা অন্তর দিয়ে জানে। সে উপলব্ধি তার আছে। নিজের জীবনটাই যে তার এই জীবন। পাঁচ বছরে বাপ মরেছে, আট বছরে মা! বাপের লাইফ ইনসিওরের তিন হাজার টাকা এবং জমি বিক্রী করা হাজার চারেক এই সাত হাজারের মূলধনে, জ্যাঠা-জেঠীর সংসারে এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিল! সেও তো এই জীবন। ক্ষোভ বিদ্রোহ যে এই বঞ্চিত বেদনার্ত জীবনে বিশ্বব্যাপী আকাশ-প্রমাণ! বিকিনি দ্বীপপুঞ্জে মানুষ আণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে। তার তেজস্ক্রিয়তায় বায়ুমণ্ডল জীবদেহের পক্ষে বিষাক্ত হয়ে উঠছে। কিন্তু মানুষের চিত্তলোকের আকাশে আকাশে বঞ্চনার ক্ষোভের বিস্ফোরণ প্রতিনিয়ত চলেছে—তার তেজস্ক্রিয়তায় সব বিষ হয়ে গেল বোধ হয়। হ্যাঁ সব বিষ! নীরার চিত্তলোকের বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তায় বিনো সেন যদি নাগাসাকি হিরোসিমার মত ঝলসেই যায় তো কি করবে

নীরা। যুদ্ধ ঘোষণার সময় জাপান কথাটা ভাবে নি। বিস্ফোরকে আগুন তো সেই দিয়েছিল প্রথম। অহিংসার সাধক—দেবতা বুদ্ধের উপাসক জাপান!

বিস্ফোরকে অগ্নিসংযোগ হলে, মুহূর্তে আসে মৃত্যুযোগ। কত দেবতার মন্দির, রাজার প্রাসাদ ফেটে চৌচির হয়ে যায়, দেবতা. ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, রাজার দেহ মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। সে রেহাই দেয় না কাউকে। নিজের উপর ফাটলে নিজেও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন মাংসখণ্ডের টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। হলেই বা বিনো দা, বিনোদ সেন সর্বত্যাগী বলে পরিচিত, দেশমান্য, রাষ্ট্রের দরবারে সম্মানিত জন। বিস্ফোরকে তিনি আগুন দিয়েছেন, তার আঘাতে তাঁকে টুকরো টুকরো হতে হবে না?

খাবার জায়গায় ছেলেদের যাবার ঠিক আগেই ব্যাপারটা ঘটেছে। আশ্রমের একপ্রান্তে বিনোদ সেনের নিজের ঘর। দুখানি ঘর, বারান্দা, একটি স্টুডিও, খানিকটা বাগান। ঠিক মাঝেখানে স্কুল, তারপাশে বোর্ডিং, তার পাশে খাবার ঘর, এক লাইনে পাশাপাশি এগুলি। তারই ঠিক পিছনে,—বিনোদ সেনের বাড়ি যে দিকে, তার বিপরীত দিকে শিক্ষয়িত্রীদের কোয়ার্টার। চল্লিশটি অনাথ ছেলে নিয়ে আশ্রম; সঙ্গে ইস্কুল, আগে ছিল—প্রাইমারী—এখন হয়েছে বেসিক, তার সঙ্গে সেকেণ্ডারি স্ট্যাণ্ডার্ডের তিনটি ক্লাস। তার জন্য আছেন দুজন বৃদ্ধ শিক্ষক; তাঁরা থাকেন বিনোদ সেনের বাড়ির লাইনে। এ লাইনে বিনোদ সেনের নিজের বাড়ির পিছনেই আর একটি কোয়ার্টারে থাকেন বিনোদ সেনের বিধবা বোন আর তাঁর ছেলেরা। তারই একদিকে থাকে এই প্রতিমা। এখানে আশ্রম পত্তন হয়েছে ১৯৪৮;

আটটি ছেলে নিয়ে শুরু হয়েছিল। পঞ্চাশ সালে সরকারী সাহায্য পেয়ে যেবার আশ্রমের রূপ বদলে গেল, সেইবার নাকি বিনোদ সেন নিয়ে আসেন এই প্রতিমাকে। ইনি বিনোদ সেনের কোন বন্ধুর বিধবা পত্নী, শুধু তাই নয়, বান্ধবীও, প্রিয় বান্ধবী বলেই সবাই জানে। এর বেশি অতীত কথা, অতীত ইতিহাস কেউ কিছুই জানে না। তবুও কারও বুঝতে কষ্ট হয়না যে এদের দুজনের মধ্যে একটা কিছু আছে। অন্য শিক্ষায়িত্রীরা মুখফুটে বলাবলি করে, মুখ টিপে হাসে; নীরা বিষণ্ণ হেসে চুপ ক'রে থেকেছে। সে যখন এখানে আসে তখনই শুনেছে ছেলেদের কাছে প্রতিমা 'মা-মণি'। ওর যেন একটা অর্থ আছে।

নীরার এমন উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনে সবাই এসে বাইরে দাঁড়িয়ে গেছে। আসে নি শুধু সেনের বোন, সে পঙ্গু। তার ছেলেরা কলেজে পড়ে। কলকাতায় থাকে। একটি চোদ্দ-পনের বছরের মেয়ে, সে এই শহরের ইস্কুলে পড়ে, সেও বোধ হয় লজ্জায় আসে নি। পাশের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বা অনুভব করা যাচ্ছে, অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। চাপা গলায় কেউ যেন বলছেন—যাও, যাও; সব আপন আপন ঘরে চলে যাও। যাও। এখানে নয়। যাও। বিহারী, এই বিহারী—যাও না— খাবার ঘণ্টা দাও গে না! যাও—যাও!

কথাটা শুনে নীরা এবং বিনো সেন দু জনেই একবার বাইরের দিকে তাকালেন। স্কুল কম্পাউণ্ডের মধ্যে একটা মাত্র ইলেকট্রিক আলো—তাও সেই খাবার ঘরের ওখানে;—কুহেলির আবছায়ার মধ্যে অনেক কালো কালো মূর্তি। সব ভেঙে এসেছে।

নীরার সে গ্রাহ্য করবার কথা নয়। সে অন্যায় করে নি, অন্যায়ের

বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। সে প্রতিবাদ উচ্চকণ্ঠেই সে করবে। বিনো সেন কিন্তু আশ্চর্য। লজ্জা নেই। নীরার কাছে মাথা হেঁট ক'রে ছিল যে বিনো সেন—সেই বিনো সেন এই—সকলের সামনে মুখ তুলেই বললেন—আমি তোমাদের যেতে অনুরোধ করছি। এ ব্যাপারটা আমার আর মিস মুখার্জীর মধ্যে। এবং উনি যা বলছেন তাই আমি মেনে নিচ্ছি। যান। আপনারা দয়া করে যান!—

ভিড় সরতে লাগল। শুধু তার মধ্যে থেকে বা চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত ভিড় ঠেলে এখানে কে একজন যেন ছুটে এল। এল, কিন্তু সিঁড়ির মুখে থমকে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল দরজার একখানা কপাট ধরে।

সে প্রতিমা। মুখ তার ছাইয়ের মত বিবর্ণ পাংশু। দেহ তার দুর্বল রুগ্ন। সে কোনমতে দরজাটা ধরে দাঁড়াল! তাকিয়ে রইল বিনো সেনের দিকে। সে কি দৃষ্টি! কি বেদনা! কি ক্ষোভ! কি ক্ষুধা।

এবার বিনো সেন মাথা হেঁট করলেন! সব সপ্রতিভতা তাঁর স্তব্ধ হয়ে গেল!

নীরা এগিয়ে গিয়ে হতভাগিনী মেয়েটার হাত ধরে টেনে এনে বিনো সেনের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল, বললে—বলুন, আপনি তো গুণী-জ্ঞানী, বড় মানুষ, বলুন, কোন মনুষ্যত্বের নিয়মে বা অধিকারে, এঁকে ভালবেসে এখানে নিয়ে এসেও এঁকে বিয়ে করবেন না? আপনি নিজে সেদিন বিধবা বিবাহ সমর্থন করে একঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়েছেন। যারা বিবাহ সত্ত্বেও আবার বিবাহ করে, মেয়েদের ভালবেসে প্রতারণা করে, তাদের জন্যে বলেছেন, তাদের মাথায় বজ্রাঘাত হোক। এর

পরও আমাকে ভালবাসেন, আমাকে বিবাহ করতে চান বলে পত্র লিখলেন কি ক'রে আপনি ?

প্রতিমা এবার কেঁদে যেন ভেঙে পড়ে গেল। দুই হাতে সেনের পা জড়িয়ে ধরে সে হু-হু ক'রে কেঁদে উঠে বললে, আমাকে আগে বললে না কেন ? আমি যে বিষ খেতাম।

বিনো সেন মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েই রইলেন।

—কি, কথা বলেন না কেন ?

বিনো সেন বললেন, আমার মাথায় বজ্রাঘাতই হোক নীরজা ! আমার বোধ হয় তাই প্রাপ্য।

প্রতিমা আবার কেঁদে উঠল, না-না-না।

নীরা বললে, ছি-ছি-ছি, আপনাকে ছি !

বলেই সে দ্রুতপদে বেরিয়ে এল। বাইরে এসে আবার ফিরে গেল, দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললে, আজ রাত্রেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

প্রতিমা তখনও কাঁদছে।

বলেই সে চলে গেল।

যেতে যেতে শুনতে পেলে বিনো সেনের কণ্ঠস্বর, তিনি দূরেদূরে টুকরো জটলায় জমাট লোকগুলিকে বলছেন, যেন একটু কঠিন কণ্ঠেই বলছেন—দয়া ক'রে আপনারা যান এবার। নাটক তো ফুরিয়ে গেছে ! যান ! যাও !

আছে যে অনেকেই। শিক্ষকেরাও আছেন। ছেলেরাও কিছু রয়েছে। বিনো সেন মহাপুরুষ, রাগ হবে বইকি।

কিন্তু, নাটক ? সে নাটক করে এল ?

*   *   *

নির্লজ্জ কোথাকার।

মানুষ সাধু—মানুষ সর্বত্যাগী। ছদ্মবেশী ভণ্ডের দল! দেহধারী মানুষ, দেহজ কামনার আগুন তার রোমকূপে-রোমকূপে ; ছাই মেখে সেই মুখ বন্ধ করে মানুষ সন্ন্যাসী সাজে! এদেশের মোহন্তদের ইতিবৃত্তের কথা সে জানে। ইয়োরোপের সন্ন্যাসীদের ব্যভিচারের ইতিহাস সে পড়েছে। ইতিহাসের দেশে বিদ্রোহ হয়, বিপ্লব হয় ; ইতিবৃত্তের দেশে হয় না। তাই একদিন যারা বিপ্লবী ছিল, তারা আজ অধিকার পেয়ে ভণ্ড ব্যভিচারীতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এদেশের লজ্জাবতী লতার মত কোমলা মেয়েরা স্পর্শ মাত্রেই নুইয়ে প'ড়ে বলে, আমার এলায়িত দেহের ভঙ্গিতে আমার উত্তর নাও, মুখে বলতে কি পারি ? এবং স্বল্পস্মিত হাস্যে তাকিয়ে মুখ নত করে। কিন্তু বিনো সেন, সে তাদের দলের নয় !

সে কঠিনা সে নিষ্ঠুরা—সে পৃথিবীকে চেনে, মানুষের অন্তর সে আয়নার মত দেখতে পায় ; এতদিন অসহায় ভিক্ষুকের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে ! আজ সে শক্তি পেয়েছে, সে আঘাত করবে না ?

বেশ করেছে—সে নাটক করেছে।

নাটক ! নাটক কি সহজ না সুলভ ? যাকে-তাকে নিয়ে নাটক হয় ?

ঘরের ভিতর বসে স্থির দৃপ্তদৃষ্টিতে দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে কথাগুলো মনে মনে যেন আউড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ বাধা পড়ল। বাইরে থেকে কড়া নড়ল। তিক্ত উষ্মার সঙ্গে অল্প ঘাড় বেঁকিয়ে সে-দিকে তাকিয়ে সে বললে, কে ?

—আমি দিদিমণি। ডাকছে ঠাকুর নটবর।

—কি চাই ?

—ছেলেরা যে খেতে আসবে, ঘণ্টা দিচ্ছে।

—দাও গে। আমি যাব না।

—আজ যে মাছ মাংস মিষ্টি হয়েছে, লুচি আছে। ওরা যে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছিঁড়ি করবে।

আজ বিনো সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ছেলেদের জন্যে ভোজের ব্যবস্থা হয়েছে। করেছিল যারা তাদের মধ্যে সেই প্রধান! নিজের সে আচরণের জন্য অনুতাপ হচ্ছে তার, রূঢ় কণ্ঠে সে বললে, করুক। আমি যাব না। আর আমি এখানকার কেউ নই। অন্য কাউকে ডাক গিয়ে। নমিতাদি কি কমলাদি, যাকে হোক।

—আজ্ঞে ?

—যা বলেছি শুনেছ। ওঁরা না আসেন খোদ সেনবাবুকে বল গিয়ে। যাও! যাও! যাও!

সে উঠে গিয়ে দরজা একবার খুলে বললে, যাও বলছি! বলেই সে আবার দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ছিটকিনি বন্ধ করে দিলে। এখানকার সংশ্রবে সে আর একদণ্ড থাকতে চায় না। আজ রাত্রেই সে চলে যেতে চায়। হ্যাঁ। আজ রাত্রেই।

হ্যাঁ, আজ রাত্রেই।

হোক রাত্রিকাল। হোক দু পাশে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা। হোক সামনে দামোদর। দামোদরের উপরে ডি ভি সি'র ব্যারাজে ব্রিজ আছে। ওপারে নতুন ডি-ভি-সি কলোনী। নতুন যুগের দেশ। শুধু সমস্যা সঙ্গে আজ জিনিস অনেক! আরও একদিন এমনি করে রাত্রে

জীবনের যাত্রা সুরু করেছিল। একবস্ত্রে বিয়ের কনে, সাজ খুলে, কপালের চন্দন, চোখের কাজল মুছে বেরিয়ে এসেছিল। বিবাহের রাত্রে এর চেয়ে অনেক কঠিনতর জটিলতর ঘটনার সংঘটন। নাগপাশ। নাটক! নির্লজ্জ সেন বললেন, নাটক শেষ হয়ে গেছে। নাটক! সে নাটক করেছে! হ্যাঁ করেছে। নাটক করে কে? যে নাটক অভিনেতা অভিনেত্রীরা করে, সে তো নকল নাটক। আসল নাটক করে তারাই যাদের চরিত্র নিয়ে নাটক হয়। যারা বিদ্রোহী, যারা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে; যারা নিজের জীবনে আগুন লাগিয়ে সংসার সমাজে আগুন ধরিয়ে তপ্ত শিকে ছেঁকা দেওয়ার যন্ত্রণার শোধ নেয়। তার জীবন নাটক যে, সত্যই নাটক! মনে পড়ছে সব ঘটনা। আশ্চর্যভাবে নাটকীয়। নাটকের আকারে সাজালেই হল।

দুই

সাজাও। সাজিয়ে নাও নীরার জীবনের ঘটনা। দেখ নাটক হয় কিনা!

সংসার রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট তৈরী কর। ১৯৩০।৩১ সালের কলকাতার উপকণ্ঠ; এই দমদমের কাছে ছোট একটি গ্রাম। তখনও এরোড্রোম হয় নি। অন্তত নীরা তার খবর জানে না। অর্ধেক পাড়াগাঁ অর্ধেক শহর। অনেক নারকেল গাছের মাথা উঠে আছে আকাশের পটভূমিতে। তার সঙ্গে সুপুরি গাছ। আর আমের বাগান। যেগুলো ভেঙে ভেঙে এখন কলোনি হচ্ছে। আধকাঁচা আধপাকা রাস্তা। অপ্রশস্ত। দুধারে কাঁচা ড্রেন। পাঁকে ভর্তি। কৃমিপোকা মাছি আর মশায় নরক। এরই মধ্যে একটি চৌরাস্তায় কিছু দোকানদানি। ইলেকট্রিক তখন দমদম পর্যন্ত এসেছে। তাদের গ্রামে আসে নি। ঘর এক পাকা আর এক ছিটেবেড়ার গোল পাতার। পাকাবাড়ির অধিকাংশই একতলা, কয়েকখানা মাত্র দোতলা। কাঠের চেয়ারে বালিশের কুশন, তক্তাপোষে ফরাস। তার উপর সরু আকারের হোমমেড টেবিলক্লথ। জানালায় রঙীন পুরনো কাপড়ের পর্দা। দরজায় রোঁয়া-ওঠা পাপোষ, অনেক কালের পুরনো। সন্ধ্যেবেলা শেয়াল ডাকত। মধ্যে মাঝে দু চারটে সাপ মারা পড়ত। দিনের বেলা, দশটা হতে না-হতে সারা গ্রাম হত পুরুষশূন্য। সব কলকাতা ছোটে। হাতে খাবারের কৌটো, পানের ডিবে। মুখে বিড়ি। ফেরে সন্ধ্যে ছটা থেকে

আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে। দমদম স্টেশনে নেমে মাঠ ভেঙে হনহনিয়ে ফেরা—যেন বিবরে ঢোকা। বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত। তবে কালের পটভূমিতে স্তিমিত নয়। কালের আকাশে তখন ঝড় উঠেছে। একদণ্ডধারী কৌপীনবস্ত্র খর্বকায় শীর্ণ ব্যক্তির পদক্ষেপে-পদক্ষেপে দেশের হৃদয় সমুদ্রের মত উথলে উথলে উঠছে। এতো দেখাতে পারবে না রঙ্গমঞ্চে। প্রতীক হিসেবে—কিছু ভাঙা ডালপালা পাতা ফুল ছড়িয়ে রেখো। একটা গাছের ডালে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা বেঁধে দিয়ো। কারণ সেটা ১৯৩০ সাল। এক মাস আগে ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প পাঠ করে বিদ্রোহের ধ্বজা উঠেছে। ওই তেরঙ্গা ভারতের জাতীয় পতাকা।

তার মধ্যে রাত্রে একটি নবজাতকের কান্না দিয়ে শুরু করো নেপথ্য সঙ্গীতের মধ্যে।

এক এক সময় মনে হয় বিদ্রোহের ওই ঝড় বেজেছিল বুঝি নবজাতা কন্যাটির রক্তস্রোতের ধ্বনির সঙ্গে। ওই কালই বোধহয় তার এই প্রকৃতির জন্যে দায়ী।

না!

তা নয়। কাল স্থান মানুষের প্রকৃতিকে কিছু দেয় না। না। নইলে ওই সালে ওই সময়ে অনেক মানুষই তো জন্মেছে। তারা তো নীরার মত নয়। তার শৈশবে দেখা কত ছেলে কত মেয়ে—! এইতো তার জাঠতুতো বোন হেনা—তার জন্ম একই বাড়ীতে তার জন্মদিন থেকে অনেকগুণে বেশী ঝড়ো রাত্রে। যে রাত্রে চট্টগ্রামে আর্মারি রেইড হয়—সেই উত্তপ্ততম রাত্রে। কিন্তু কই? সে তো নীরার মত নয়।

সংসারে একটা সাধারণ মেয়েও সে নয়। একটা পচা, হ্যাঁ, পচা মেয়ে হেনা। নীরার উপরে তার নিজের জীবনের পঙ্ক-কলঙ্ক—। না; তার জন্য সে তাকে দোষ দেবে না। তার সে পঙ্ক-কলঙ্ক নীরা নিজেই নিজের সর্বশরীর দিয়ে মুছে নিয়ে মেখেছিল।

পুষি বেড়ালের মত একটি মেয়ে হেনা। একতাল কাদায় গড়া লতলে নরম জান্তব সুখের থসথসে প্রতীক তাকিয়া বা ওই ধরনের কিছুর মত একটা মেয়ে। তার থেকে মাসখানেক মাস দেড়েকের ছোট। ম্যাট্রিক ফেল; বিয়ে ক'রে দিব্যি শ্বশুর বাড়ী গিয়েছে। মেলা পান খায়, দোক্তা খায়। ভোরবেলা থেকে বেশ বিন্যাস করে। শ্বশুর মার্চেন্ট অফিসের বড়বাবু—ছেলেও সেখানে চাকরী করে; হয়তো এরই মধ্যে ছোটবাবু থেকে সেজবাবু কি ফুলবাবুতে প্রমোশন পেয়েছে। অনেক টাকা। যুদ্ধের বাজারে ঘুষের টাকা। ব্ল্যাক-মার্কেটের টাকা। পাঁচ সাতটা ঝি চাকর ঠাকুর। তাদের উপর তম্বি করে। গুণগুণ ক'রে সিনেমার গান গায়। অনেক সিনেমা দেখে। আর স্বামীর কাপড় শুঁকে দেখে, খুঁজে দেখে কোন লম্বা চুল কোথাও লপটে লেগে আছে কিনা। স্বামী চরিত্রহীন। তাতে তার কৌতুকই আছে, ক্ষোভ নেই। সেই কৌতুকবশেই ওই সন্ধান সে করে। নইলে স্বামীর পকেটভরা টাকাতেই সে খুশী।

জন্মকালের প্রভাব যদি জাতকের জীবনে থাকে বা পড়ে তবে গ্রাম আর্মারী রেইডের রাত্রে যার জন্ম সে নিশ্চয় ওই পাষণ্ড ামীকে ত্যাগ করে কবে আদালতে গিয়ে দাঁড়াত—বলত—আমি মুক্তি ই। অথবা গর্ডিয়ান নট কাটার মত নিজে হাতে সে বন্ধন ছিঁড়ে কেটে এসে দাঁড়াত পথের উপর। ফেটে যেত।—

না।

মনের আবেগে কোথা থেকে কোথায় এসেছে। তার জীবন নাট্যের আরম্ভেই এসে পড়েছে হেনার কথায়।

হেনার আসল নাম হানাহানি। সে ওই চট্টগ্রাম আর্মারি রেডের রাত্রে জন্মের জন্যে। হানাহানি থেকে হেনা।

জন্মের সময় কিছু নয়।

বাপ মায়ের প্রকৃতি সন্তানের পক্ষে সত্য এটা সে বিজ্ঞানে পড়েছে। কিন্তু তার বাপ-মায়ের প্রকৃতিতে কি ছিল তেমন কিছু?

শোনে নি তেমন কিছু। বরং উল্টোই শুনেছে। বাপ-মা সম্পর্কে তার নিজের স্মৃতি তো খুব ক্ষীণ। বাপ মারা গেছেন পাঁচ বছর বয়সে, মা মারা গেছেন আট বছরে। দুটি দশটি ছবি ছাড়া কিছু মনে পড়ে না তার। তাদের কথা শুনেছে সে জেঠাইমা—ওই হেনার মার কাছে।

* * *

তার আগে এলোমেলো ভাবনায় মনে পড়া কথাগুলো সরিয়ে দিয়ে, সাজিয়ে নাও।—দমদমের পাশে ওই গ্রামটিতে একতলা একখানি বাড়ি। মাঝখানে উঠোন রেখে চারদিকে ছখানা ঘর। ঘরের কোলে উঠানের সামনে সামনে বরাবর টানা বারান্দা। চৌকো থাম ছিল বারোটা। খিলেন দিয়ে ছাদ ধরা ছিল না। ছিল কাঠের কড়ি। তাতে ছিল সে আমলের কাঠের ঝিলমিলি। উত্তর দক্ষিণে লম্বা ইঁট বের-করা রাস্তার সামনে পূর্বমুখো বাড়িটা। দুপাশে দুখানা ঘর—মাঝখানে চার ফুট চওড়া ফুট দশেক লম্বা রাস্তা ঘর পার হয়ে উঠোন। উত্তরে একখানা ঘর। দক্ষিণেও একখানা। পশ্চিমে খুপরি খুপরি দুটো রান্নাঘর—দুটো বাথরুম, একটা ছাদে ওঠার সিঁড়ি।

দরকার হয় কাগজে ছকে নাও। তারপর পট আঁকো। ইচ্ছে হলে বক্স সিন করতে পার। না হয় মনে মনে তৈরী করে নাও। স্পষ্ট দেখতে পাবে বাস্তব সংসার রঙ্গমঞ্চের আসল বাড়িটি। ধরণী মুখুজ্জের দুই ছেলে—হারাণ মুখুজ্জে আর পরাণ মুখুজ্জে। চাকুরীজীবী। কিছু ধানী জমি একটা বাগান এই ছিল সম্পত্তি। নিরীহ শান্ত চাকুরী-জীবী দুটি ভাই দুই বউ। বড় বউয়ের অর্থাৎ জেঠাইমার দুটি ছেলের পর একটি মেয়ে হয়েছে হেনা। আর তার মায়ের কোলে সে। দুই ভাই পৃথক হয়েছে কিন্তু উঠানে পাঁচিল পড়েনি।

১৯৩০ সালে দেশব্যাপী বিদ্রোহের মধ্যে চাকুরী নিয়ে ভয়ে দুইভাই মহা বিব্রত।

মাস কয়েকের শিশু

জেঠাইমার কাছে। জেঠাইমা তাঁকে বলতেন না। বিচিত্র জেঠাইমা! এ সংসারে দুই আর দুইয়ে জেঠাইমার জীবনে চার কোথাও হয় নি। কোথাও হয়েছে তিন কোথাও পাঁচ কোথাও আট। সে তখন মা বাবা হারিয়ে জেঠাইমাদের সংসারে থাকে, পোষ্য নয় কিন্তু তারা ছাড়াও কেউ নেই অথচ সে সে-সংসারে একঘরে।

পচা আবদেরে মেয়ে ওই হেনার জন্যেই একঘরে। বয়স তখন বারো। হেনা কাঁদতে ধরত কোন কারণে। কাঁদতে শুরু করলে থামত না। তখন জেঠাইমা অর্ধেক তিরস্কার অর্ধেক সমাদর মিশিয়ে বলতেন, কেমন রাত্রে কেমন লগ্নে জন্ম দেখতে হবে তো! ঠিক নাম দেওয়া হয়েছিল। হানাহানি। তাই থেকে বাপ করলেন হেনা। হেনা বললেই কি হেনা হয়, না হেনার খুসবই ওঠে! দক্ষযজ্ঞ নাশ

করতে শিবের প্রেতেরা এসেছিল বিষফুল কানে গুঁজে তার গন্ধে সব হতচেতন। সেই গন্ধ উঠছে। মা গো!

এই থেকেই শুরু হ'ত। ওই কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন গৌরব এবং সমাদর আছে তা বারবার শুনে শুনে মুখস্থ পড়ার মত এমন সহজ-বোধ্য হয়েছিল যে হেনার খুশি হ'তে বিলম্ব হ'ত না। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জেঠাইমা আরম্ভ করতেন সেকালের গল্প। হেনাই ধরিয়ে দিত। বলত সে বুঝি ভয়ঙ্কর মারামারি হানাহানির ব্যাপার হয়েছিল মা? বল না?

মা বলতেন—ওরে মা! তোর জন্মের কদিন পর খবর পাওয়া গেল। নইলে চট্টগ্রাম তো স্বদেশীর দল কেড়ে নিয়েছিল! সে ভীষণ কাণ্ড। রক্ত হিম। এখানে মারপিট। দেশসুদ্ধ হৈ-চৈ। ছেলের-দল চীৎকার করে। পিকেটিং করে। নুন তৈরী করে। দলে দলে জেলে যায়। বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম! কানপাতা যায় না। এখানে গুলি ওখানে লাঠি সেখানে বোমা। আজ বেতাল কাল হরতাল। তোর বাপ আপিং খায় অনেক কাল থেকে—আপিং পাওয়া যায় না। রাইটার্স বিল্ডিংসয়ে উঠে তেড়ে সায়েবকে খুন করলে। নিজেরা বিষ খেলে। গুলি খেলে। সাহেবরা ভয়ে ঝুড়ি মাথায় দিয়ে টেবিলের তলায় ঢোকে। মেয়েরা রাস্তায় বেরিয়ে ঝাণ্ডা ঘোরায়, জেলে যায়। পুলিসে মাথা ফাটায়। আমরা দুই জা মিলে চুপচাপ ঘরে বসে থাকি। সন্ধ্যে হলে বুক ঢিপ ঢিপ বাড়ে, মানুষ দুটি কখন ফিরবে! আমি ডাকি, ও ছোট বউ! রাত যে বেশ হল! ও বলে, তাই তো ভাবছি দিদি! তোর বাপের রেলের হেড আপিসে কাজ, নীরার বাপের রাইটার্স বিল্ডিংএ। তা হলে কি হবে, গায়ে তো লেখা

থাকে না; ভিড়ের মধ্যে পড়ে গেলে তখন কে কাকে চেনে। পুলিস লাঠি চালিয়ে দিলেই তো হল। সে বড় দুর্ভাবনার সময় গেছে।

বলতে বলতে হেসে উঠতেন; ওই হাসির সঙ্গেই দেশের কথায় মিশে যেত ঘরের কথা। হেসে নিয়ে বলতেন, দুঃখের মধ্যে হাসি মা; তোর বাপের মাছের লোভ তো দেখেছিস? তোর খুড়োরও কম ছিল না। সেদিন শুনেছেন শেয়ালদায় খুব গোলমাল, লাঠি চার্জ হয়েছে, ট্রাম বন্ধ। তো, দু ভাই ঠিক করেছে—দুজনে আপিস থেকে ওই সময়টায় বেরিয়ে একসঙ্গেই হয়ে রোজ আসতেন— ; ঠিক করেছে, শ্যামবাজারে এসে, ছোট লাইনে কিছুদূর এসে, হেঁটে আসবেন। শ্যামবাজারের মোড়ে এসে শুনেছেন, বাগবাজারের ঘাটে ইলিশ একেবারে অঢেল, খুব সস্তা, টাকায় এই বড় ইলিশটা দেড়সের, দুসের। দু ভাই আর লোভ সামলাতে পারে নি, গেছে, মাছও কিনেছে। এ একটা ও একটা ঝুলিয়ে নিয়ে ফিরছে, আর ওদিক থেকে হল্লা। লোক ছুটছে, পাল্লাও পুলিস। এদিক থেকে চিৎপুর ধরে, ওদিক থেকে বাগবাজার ধরে বাস—দুই ভাই মাছ হাতে নিয়ে দৌড়। একেবারে খালের দিকে। হাতে মাছ, বগলে ছাতা, অন্য হাতে খাবারের কৌটো, আরও কি-কি, বোধ হয় দুজনে দুটো ফুড কিনেছিল। দুজনেই একটু থলথলে মানুষ; শেষে ছাতা ফেলে, ফুড ফেলে, কৌটো ফেলে দৌড়। দুই ভাই হেঁটে বাড়ি ফিরল ট্রাঙ্ক রোড ধরে, রাত্রি তখন দশটা। আমরা তো দুজনে মরে ভূত হয়ে গেছি। এদিকে তোরা দুটোতে খিদেয় চ্যাঁচাচ্ছিস। আর ধড়াধ্বড় পিটছি। মর মর! তোদের ফুড কিনতে গিয়েই মানুষ দুটা গেল! শেষে ঝগড়া বেধে গেল। আমি একটু বেশী মেরেছিলুম তোকে। ককিয়ে গেছিস; ছোট বউ বললে, তুমি কি ক্ষেপলে দিদি?

এমনি করে মারে? আমি বললুম, বেশ করেছি। নিজের মেয়ে মেরেছি, তোমার কি? সে বললে, খুব করে মার। মেরে ফেল। পুলিসে ধরলে আমায় সাক্ষী দিতে হবে, তাই বলছি। আমিও অমনি জ্বলে গেলুম তেলে বেগুনে বললুম, দিস লা দিস। দেবে তো ফাঁসি, আর করবে কি? সে বললে, সেটা যদি এতই তুচ্ছ হয়, তবে ওকে না মেরে নিজেই এখুনি গলায় দড়ি দাও না। আমি বললুম, কি বললি? ব্যস, লেগে গেল তুমুল ঝগড়া। ঠিক এই সময়ে দুই ভাই এলেন, গায়ের জামায় কাদা, কাপড় ছিঁড়েছে তোর বাপের; জুতোয় বেধে পড়ে গেছেন; হাঁটু ছড়েছে। তোর খুড়োর জুতো গেছে ছিঁড়ে, সে দুটো হাতে নিয়ে ঘর ফিরলেন। কিন্তু মাছ ছাড়েননি। দুজনের হাতে দুই মাছ।

জেঠাইমা যত হাসতেন হেনা তত হাসত! সেও হাসত। কিন্তু হেনার মত নয়। এমন করে হেসে গড়িয়ে পড়তে সে পারতও না, অধিকারও ছিল না;—এমন গড়িয়ে পড়ে হাসলে, নিশ্চয়ই জেঠাইমা হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলতেন, ও কি হাসি নীরা? ওই হেনাও তো হাসছে। তোমার যে বেহায়ার মত হাসি! অবশ্য সবটাই ওই নয়, নিশ্চয় তার প্রকৃতিতে কিছু ছিল, কিছু আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন প্রকৃতিকে আপনার ছাঁচের মধ্যে পুরে তৈরী করতে চায়, ঠিক তেমনি ভাবেই প্রকৃতিও তার শক্তি অনুযায়ী ঠেলে উত্তাপে গলিয়ে ছাঁচকে বদলে অন্য রকম করে দেয়।

থাক সে কথা।

এ থেকেই কল্পনা করে নাও,—সে নিজে বেশ চোখে দেখার মতই স্পষ্ট দেখতে পায়—শান্ত পরিবার দুটিতে একটি তৃপ্তির সুখ ছিল।

বিদ্রোহ বিপ্লব এ সব কিছু ছিল না। সেই উনিশশো তিরিশ সালেও ছিল না। বাবা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ে ফিনান্সের কেরানী ছিলেন; সেখানে হিসেব কষতেন সারাদিন—ফাইল সারতেন, উপরিওলার সই করাতেন, ডিবে থেকে মধ্যে-মধ্যে পান বের করে খেতেন, তার সঙ্গে বিড়ি ধরিয়ে আরাম করতেন; দেশের স্বাধীনতা কামনা আদৌ ছিল কি না সে বলতে পারে না, কারণ জেঠাইমা বলেন, দুই ভাইই যেদিন কষ্ট পেয়ে বাড়ি ফিরতেন, সেদিন ঘরে বসে নেতাদের কটু কথা বলতেন। স্বাধীনতা-কামনা থাকলেও নিতান্ত সভয়ে মনের চোরকুঠরীর এক অন্ধকার কোণে নিষ্ঠুর পাওনাদারের ভয়ে, দেনদারের মত ভীরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে লুকিয়ে থাকত।

যেদিন কষ্ট পেতেন না, সেদিন সকৌতুকে দুই পক্ষেরই ভীরু কর্মের গল্প করে উপভোগ করতেন।—বুঝেছ না। পুলিস তাড়া মেরেছে, আর সব চোঁ-চা দৌড়। সে কি দৌড়। একজনের কাছা খুলে গেছে তো তাই নিয়েই দৌড়ুচ্ছে। বাপরে বাপরে! আবার বলতেন সায়েববেটার ঘরে ঢুকেছি, একটু বেশী শব্দ হয়েছে দরজায়, বাস, বেটা চমকে দাঁড়িয়ে উঠে বলতে শুরু করেছে, হু আর ইউ। আর্দালী, আর্দালী। সে কাঁপছে প্রায়। আমি বললাম, এক্সকিউজ মি সার। ক্যারিয়িং শো মেনি ফাইলস, আই হ্যাড টু পুস দি ডোর উইথ মাই হেড। তার পর হয়তো বলতেন, ওদের আর হয়ে এসেছে। খট শব্দ শুনে যারা চমকে উঠে প্রাণপক্ষী খাঁচার গায়ে ঝট-পটিয়ে মাথা ঠোকে, তাদের পালা খতম।

হয়তো এর পর তাকে নিয়ে আদর করতেন—নীরা হীরা জিরা ধীরা মীরা টিরা—। এমনি অর্থহীন শব্দের সমাবেশ। কিন্তু তার

মধ্যে ছিল পরমাশ্চর্য মধু। হয়তো বলতেন—যা অর্থহীন নয়—নীরা হীরা মণি মানিক! নীরাকে আমি ইস্কুলে পড়াব, গান শেখাব,—

মা বলতেন, নাচও শিখিয়ো বাপু। আজকাল আবার ভাল করে নাচ জানার রেওয়াজ হয়েছে।

বাপ বলতেন, নিশ্চয় শেখাব। কুড়ি বছরের আগে তো বিয়ে হচ্ছে না। ইনসিওরটা কুড়ি বছরে ম্যাচিওর করবে।

মা বলতেন, তিন হাজারে ভাল ঘরে বিয়ে হবে ভাবছ?

—না হলে করব কি? আরও তো ছেলেমেয়ে হবে। তাদেরও তো দায় আছে।

— তবে তোমার মাইনে বাড়বে।

—তা বাড়বে। প্রমোশন হবে। জান এবার সায়েব সার্ভিস বুকে খুব ভাল নোট দিয়েছে।

—তোমরা দুই ভাই নাকি জমি বেচছ?

—হ্যাঁ ভাল দর পাচ্ছি। নার্সারিওয়ালারা নেবে।

—টাকাটা যেন খরচ করে দিয়ো না।

—বাড়িটা মেরামত করাব। আর বাকীটা ক্যাশ সার্টিফিকেট কিনব।

—একটা কথা বলব?

—বল না, এত সঙ্কোচ কেন?

—নীরাকে একটা প্যারাম্বুলেটর কিনে দেবে?

—তা না হয় দিলাম। ঠেলবে কে?

—একটা ঝি রাখব। হেনার জন্যে একটা কিনেছেন বঠ্‌ঠাকুর, ও যা করে চড়বার জন্যে!

—দাদার মাইনে কত জান? আমার ডবল! আমার পঁচাশী টাকা, দাদার একশো ষাট টাকা।

—তা হোক। সে বাচ্চারা বোঝে না।

—বাচ্চার মা-রাও বোঝে না!

—বেশ বাপু দেবে না, দিয়ো না। এত কথা কেন? বাচ্চার মা নিজের জন্যে কোন দিন কিছু বলে? ওই তো দিদির গলার হার ভেঙে হার হল, আমি বলেছি তোমাকে আমারটাও হোক! দুই ভাই-এর বিয়েতে তো টাকা একই নিয়েছ। বাবাকে বাজারদর দেখানো হয়েছিল। এবং বলা হয়েছিল—ছেলে রাইটার্স বিল্ডিংস্‌-য়ে ঢুকেছে। বড় ছেলে রেলের চাকরে, পেনসন নেই। এর পেনসন আছে।

—বাপরে বাপ। বাচ্চার মা কথা বলে না ব'লে কম কথা বললে না।

—যাক আর বলব না। তবে কাল ওর দুটো জামা না-হলেই হবে না। ঝিটার সঙ্গে আমি কথা বলেছি, সে আর এক টাকা বেশী দিলে বিকেলবেলা বেড়িয়ে আনবে; সে আমি ওই রদ্দি জামা পরিয়ে পাঠাব না।

পরের দিনই তার বাপ শুধু ভাল ফ্রকই আনেন নি, একটা সস্তা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড ঠেলাগাড়িও এনেছিলেন। একটা ব্ল্যাক জাপানও এনেছিলেন। নিজেই রঙ দিয়ে পুরনো গাড়িটার উপর নতুনের খোলস চড়াতে চেয়েছিলেন।

এর পর নাকি তার মায়ের দুটি ছেলে হয়ে মারা গিয়েছিল। তাতে মা তার পিঠের দোষ বলে তার উপর বিরূপ হয়েছিল। কিন্তু বাবা আরও গাঢ়তরভাবে ভাল বেসেছিলেন।

ছেলেবয়সে তার দুঃখ খুব ছিল না। সুতরাং বিদ্রোহের কারণ ঘটেনি। সে ছিল বোধ হয় প্রকৃতিতে। জাগিয়ে দিল তাকে সংঘাত।

* * *

এ পর্যন্ত তো নাটকের পূর্ব কথা। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রীতি অনুসরণ করলে এটুকুও অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে সূত্রধার এই পূর্বকথা বর্ণনা করে এইখানে—'অলমতি বিস্তরেণ' বলে প্রস্থান করতে পারে অথবা অভিজ্ঞান শকুন্তলমের প্রস্তাবনার শেষ কথায় কৌশলে হরিণ এবং রাজা দুষ্মন্তের উল্লেখের মত উল্লেখ করতে পারে—

সংঘাতের চরম সংঘাত এবং অনিবার্য সংঘাত কি ?—সে ওই—।

তারপরই আরম্ভ হোক নাটক। সূত্রধার প্রস্থান করুক। সূক্ষ্ম যবনিকাটি তুলে দাও। একটি খাটিয়ার উপর শবদেহ সাজানো থাক। একখানা চাদর ঢাকা থাক। ইচ্ছে হলে কয়েকটা ফুল ছড়িয়ে দিয়ো। তার কিছু দূরে বিস্ফারিত আয়ত-নেত্রা একটি পাঁচ বছরের কালো মেয়েকে দাঁড় করাও।

অনিবার্য নিষ্ঠুরতম সংঘাতে তার ঘুমন্ত বিদ্রোহ জাগছে। নিষ্ঠুরতম আঘাত দিয়ে মৃত্যু কেড়ে নিল তার বাপকেই।

বাবা মারা গেলেন। ঠিক মনে নেই। শুধু দুটুকরো ছবি মনে আছে। সন-তারিখ-স্থানহীন একটি সূর্যাস্তের মত। লাল সূর্য কেঁপে কেঁপে ঘোরে সেই ছবিটুকুর মত। মনে আছে শবযাত্রার দুটুকরো ছবি। একটুকরো—একটা খাটিয়া তার উপর একটি মানুষ শোয়ানো। বাবার ফটো আছে। কিন্তু সে মানুষটির মুখ ওই

ফটোর মুখের মত কিনা বলতে পারবে না নীরা। কারণ খাটিয়ায় যে শুয়েছিল তার মুখ মনে নেই। একখানা সাদা কাপড় ঢাকা। তার উপর কতকগুলো ফুল ছড়ানো ছিল। আর একটা, কতকগুলি লোক এসে তার উপর দড়ির বাঁধন দিয়ে কাঁধে তুলছে। ভয়ে রাগে কষ্টে নীরা চীৎকার করে উঠেছিল—না— !

সে মনে থাকা এমন যে কদাচিত কালে-কস্মিনে তা প্রত্যক্ষভাবে মনে পড়ে! বাবার কথা উঠলে ছবি তুটুকরো মনে পড়ে বটে কিন্তু মনে পড়ার সঙ্গে সে দিনের অনুভব করা বেদনা বা ক্ষোভ বা কষ্ট মনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু কোন শবযাত্রার সঙ্গে কান্নায় আকুল কোন শিশুকে দেখলে ওই ছবি তুটুকরোর সঙ্গে সেদিনের সেই কাঁটাটা খচ করে কোন অন্তরের অন্তরে বেজে ওঠে। মনে হয় সৃষ্টিতে কি অনাচার অবিচার। কোন পিতৃহীন ম্লানমুখ শিশুকে দেখেও মনে হয়; তার স্বাভাবিক চেতনা অবচেতনে শৈশবে সঞ্চিত ওই আশ্চর্য ক্ষতবিন্দুর বেদনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রগাঢ় হয়ে ওঠে।

থাক।

শব বাঁধা খাটিয়াটার দিকে তাকিয়ে নীরা চীৎকার করে উঠল—না।

পরের মুহূর্তেই 'বল হরি হরি বোল' দিয়ে খাটিয়া উঠল।

প্রথম সংলাপ হবে—একজন প্রতিবেশী বলছে জ্যাঠামশাইকে—রেখেটেকে কিছু গেছে পরাণ? না সব খরচ করেই গেছে? জ্যাঠামশায় বলবেন ঠিক জানিনে; জমি বেচা টাকার কত কি রেখেছে তবে ইনসিওরেন্স পলিসি তো একটা আছে। এই তো কিছুদিন আগে প্রিমিয়াম দিয়ে এল।

—কত টাকার?

এ কথাগুলি নীরার কাল্পনিক। কিন্তু পরবর্তী যে নাটকীয় ঘটনায় তার জীবনে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল—যা তার মনে আছে তাই মনে রেখেই কথাগুলি নীরা বসিয়ে দিচ্ছে।

তার জীবন-নাটকের রচয়িতা যখন রচনায় বসেছিলেন এবং বসেন তখন তিনি একটি নিষ্ঠুর এবং কৌতুকপ্রবণ মন নিয়ে বসেন।

বাপের মৃত্যুতে তার সুখ বাড়িয়ে দিলেন তিনি। মায়ের হাতে টাকা এল। জমি বিক্রি করা যে টাকাটা অবশিষ্ট ছিল শুধু সেটাই নয় লাইফ ইনসিওরেন্সের টাকাও পেলেন তিনি। সবসুদ্ধ বোধ হয় হাজার ছয়েক। ১৯৩৫ সালে এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভেবে দেখ, সে বাজারে এ টাকাটা নেহাত কম ছিল না। কলকাতা কর্পোরেশনের এলাকার ভিতরে পাঁচ হাজার টাকায় তখন আড়াই কাঠা জমির উপর দোতলা বাড়ি হয়েছে।

বাপের মৃত্যুতে সুখ যিনি বাড়ালেন তিনি নিষ্ঠুর কৌতুকপ্রিয় নাট্যকার।

ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করে দিতে তিনি জেঠাইমাকে দিয়ে মাকে বলালেন—ছোটি ওঠ, মেয়েটাকে বুকে করে নে।

মা নাট্যকারের ইঙ্গিতে ঘাড় নেড়েছিলেন—না-না।

জেঠাইমা বলেছিলেন—না-নয়। নে তুই ওকে। বড় হতচ্ছেদ্দা করেছিস এত দিন। ওর পর তোর দুটো ছেলে হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুই ওকেই দায়ী করে বলতিস 'রাক্ষসী'। ঠাকুরপো ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলত আঃ কি বল, বাচ্চা মেয়ে! ওকে বলছ রাক্ষসী। কিন্তু তোমার আমার ভাগ্যকে দায়ী করছ না

কেন? আজ সে নেই। তোরও তো এই গুঁড়ো সম্বল। নে বুকে করে নে!

মা দুহাত বাড়িয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

সংসার রঙ্গমঞ্চের নাটক। খেলার নাটমঞ্চের নাটক নয়। এ নাটকের একটা দৃশ্যের অভিনয় চলে মাসের পর মাস ধরে, হয় তো বছরের পর বছর ধরে।

নীরার জীবন নাটকের এ দৃশ্য চলেছে তিন বছর ধরে। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে আরম্ভ—মায়ের মৃত্যুতে এ দৃশ্যের শেষ। তার সুপ্ত প্রকৃতির উপর মৃত্যুর আঘাতের পর আঘাত। যার ফলে সে সর্বশক্তি নিয়ে যুদ্ধ করতে উঠে দাঁড়াল।

দৃশ্যের প্রারম্ভেই বাপের মৃত্যুতে আশ্চর্য নাটকীয় ভাবে ঘটল বিপরীত ফল। তার সমাদর বাড়ল।

মা সমাদর মুখেই করলেন না। সাজাতে লাগলেন। টাকা পেয়েছিলেন হাজার ছয়েক—তার উপর বাকী জমিটুকু যা ছিল তিনি বিক্রি করলেন।

বললেন—কে দেখবে? যদি কেউ জোর ক'রে দখলই ক'রে নেয়, কে মামলা করবে? ফসলের ভাগ তাই বা কে দেখে নিতে আছে?

জ্যাঠামশাই বলেছিলেন—আমাকে অবিশ্বাস করছ?

মা বলেছিলেন—আপনি গুরুজন, আমার বড় ছোট মন। আপনার ক্ষতি হবে না, সন্দেহ করে আমার পাপ হবে। তার থেকে ও না-থাকাই ভাল।

—বেশ। আমাদের পৈতৃক জমি, আমিই নেব।

—নেবেন। তবে পাড়ায় একবার দামটা যাচাই ক'রে দেখি!

—যাচাই ক'রে দেখবে? ভাল, কে তোমার ও জমি নেয় আমি দেখি!

মা দমেন নি, কুণ্ডুবাবুর কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর স্বামীর হিতৈষী। কুণ্ডুবাবুই জমিটা নিয়েছিলেন—বাজারদর থেকে বেশী দর দিয়ে। তাতেও হাজার কয়েক টাকা পেয়েছিলেন। ক্যাস সার্টিফিকেট কিনেছিলেন।

তারপর নীরাকে সাজিয়ে ডবল বেণী বেঁধে দিয়ে গাড়ি ভাড়া করে গেলেন দমদম ক্রাইস্ট চার্চ স্কুলে। মিশনারীদের স্কুল। মাইনে বেশী। তার উপর ঘোড়ায় টানা গাড়ি আছে, গাড়ি এসে নিয়ে যায় আবার পৌঁছে দেয়। টিফিনের বাক্স কিনে দিলেন।

যে দিন প্রথম গাড়ি এসে দাঁড়াল সেদিন হেনা ছুটে এল—মা মিশনারী স্কুলের গাড়ি এসেছে।

জেঠাইমা বলেছিলেন—তা কি নাচব না কি?

ঠিক এই সময়েই নতুন জামা জুতো প'রে মাথায় রিবন বেঁধে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে ওদের ঘর থেকে নীরা বের হয়েছিল।

জেঠাইমা গালে হাত দিয়ে সবিস্ময়ে বলেছিলেন—অ মা! তুই যাবি? গাড়ি তোর জন্যে? নীরা হাসতে হাসতে ছুটেছিল গাড়ির দিকে, উত্তরই দেয় নি। মা উত্তর দিয়েছিলেন—ওকে ওই মিশন ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছি। পড়ুক।

হেনা সঙ্গে সঙ্গে আছড়ে পড়ে কাঁদতে শুরু করেছিল।—আমি যাব। আমি যাব। আমি ও ইস্কুলে যাব না।

জেঠাইমা এসে ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিলেন মেয়ের পিঠে। চুপ চুপ। চুপ বলছি।

—না—না—না। চীৎকার কিছুতে থামে নি হেনার।

হঠাৎ জেঠাইমা মাকে বলেছিলেন হেনার ওপর টেক্কা দিতেই মেয়েকে ওখানে ভর্তি করেছ না?

অবাক হয়ে মা বলেছিলেন—তোমরা হেনাকে নতুন প্যারাম্বুলেটর কিনে দিলে তো—আমি ঐ কথা বলি নি দিদি!

হেনা পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ছিল আর চেঁচাছিল। এবার জেঠাইমা আবার এসে তাকে প্রহার করে বলেছিলেন—তোর তো আর বাপ মরে নি—যে তুই মেম সাহেব বনবি! আর মরলেই বা কি? ভাই যে তোর এক গণ্ডা। তোর আগে তুটো পরে তুটো!

*　　　*　　　*

আশ্চর্য! বাপকে মনে নেই, মায়ের মুখও ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু এই কথাগুলো তার মনে অক্ষয় হয়ে আছে। সে গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়িয়ে শুনেছিল দেখেছিল। আজ কথাটা —তার মনে রয়েছে। তাই জীবনে অনাথ আশ্রমে এসে ছেলেদের কখনও কটুকথা বলে নি। বলে না সে কাউকেই। মধ্যে মধ্যে এখানে তার সহকর্মিণীরা কতদিন কঠোর হতে বলেছে, বলেছে, শাসন কর একটু, আমরা শাসন করি আর তুমি ওদের এমন নাই দাও যে সব ভস্মে ঘি ঢালা হয়।

সে তাতে হেসেছে। বলেছে, দিদি, খাদ্যের মধ্যে সেরা মিষ্টি মুন, আর তুনিয়ার সেরা মিষ্টি মধু নয়, মিষ্টি কথা! কটুকথা বলতে নেই, ও আমি পারি নে। বেশ তো শাসন তোমরা করো, ওটার ভার তোমাদের।

আজ সে কি করে এমন নির্মমভাবে কথাগুলো বলেছে, বলতে পারে না। না, পারে। মানুষের শুধু প্রাণই সব নয়, তার মান আছে। প্রাণের চেয়ে মান বড়। দুনিয়ার যে-সব ক্ষমতামত্ত প্রতিষ্ঠাবানেরা মানুষের অসম্মান করে, তাদের ক্ষমা সে করতে পারে না। না, পারে না। ক্ষমা করতে না-পারার জন্যেই সে আজ এই নীরা হয়েছে। নইলে—

থাক, আবার ঘুরে সেই আজকের কথায় এসেছে।

নাটকের দৃশ্যে পরম্পরা ভঙ্গ হচ্ছে। স্মৃতির প্রম্‌টার, স্মারক বলছে, ভুল বলছ। ও সব পরের পার্ট। বল, শোন, শুনে বল—।

এ ঘটনা একদিন ঘটেই ক্ষান্ত হয় নি। প্রায়ই ঘটত। জেঠাইমা জ্যাঠামশাইকে বলেছিলেন—হেনাকে ওই স্কুলে দেবার জন্য। জ্যাঠামশাই তা দেন নি। কিন্তু হেনা জেদ ছাড়ে নি। সে প্রায়ই কাঁদত। নিজের ইস্কুল যাবে না বলে গোঁ ধরত, জেঠাইমা পিটতেন। জেঠাইমা ওই কথাটাই বলতেন—আগে তোর বাপ মরুক—!

মা চুপ করেই থাকতেন। বোধ হয় মনে মনে হাসতেন। কিন্তু এক একদিন ধৈর্য হারাতেন।

সেদিন জেঠাইমার কথা শুনে মা বলতেন, কি বলছ দিদি? ছি!

জেঠাইমা জ্বলে উঠে বলতেন, ছি কিসের? ছি! সত্যি বলছি। আর বলছি আমার মেয়েকে।

মা বলতেন, না, বলা হচ্ছে আমার মেয়েকে।

—না-না-না। বলি নি। তুমি বললেই হল? গায়ে পড়ে ঝগড়া করতে চাও! জেঠী তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠতেন।

মা দৃঢ়স্বরে বলতেন, ভাল, বঠ্‌ঠাকুর আসুন তাঁকে জিজ্ঞাসা করি তিনি কি বলেন শুনি! না-হয় প্রতিবেশীদের বলব। তাতে প্রতিকার না হয়, সব বেচেছি, বাড়ি বেচেও উঠে যাব।

মা জানতেন ওটি ব্রহ্মাস্ত্র। কারণ প্রতিবেশী কুণ্ডুরা তখন ও অঞ্চলে রাহুর গ্রাস এবং শক্তি নিয়ে উঠেছেন। যত হাঁ—তত হজমশক্তি। জ্যাঠামশাই ওখানে টুক্‌টাক করে রেলের অপিসের পয়সায় একটি উপরাহু, কিংবা বাঘের পিছনে ফেউ থেকে অধিক-নেকড়ে হয়ে উঠেছেন। মায়ের কাছে অবশিষ্ট ধানী জমি জ্যাঠামশায়ের মুখ থেকে তিনিই কেড়ে নিয়েছেন। মায়ের তাতে বলবার কিছু নেই। তিনিও ইচ্ছে করেই দিয়েছেন এবং কুণ্ডুবাবু ন্যায্য দাম দিয়েছেন। পরাণবাবুর সঙ্গে একটু সদ্ভাবও ছিল। বাড়িটির উপরও তাঁর খুব নজর! ওটি পেলে তাঁর বাড়ির কম্পাউণ্ড প্রায় চৌকোশ হয়- অর্থাৎ বাদ থাকে শুধু জ্যাঠামশায়ের বাড়ি। কুণ্ডুবাবু মাকে বলেও রেখেছেন বউ মা এটা বিশ্বাস করো তুমি ইচ্ছে ক'রে বাড়ি না বেচলে আমি চাইব না; কিন্তু কোন কারণে যদি বিক্রি কর মা, তবে আমাকে দিয়ো। সুতরাং বাড়ি বেচে চলে যাব বললেই চমকে উঠতেন ওঁরা। ভয় পেতেন।

চুপ করে যেতেন জেঠাইমা। জ্যাঠামশায় এসে বলতেন তুমি বাড়ি বেচবে কেন বউমা। আমরাই বরং যাব। তুমি বেচলে আমাদের দেবে না, আমি কিন্তু তোমাদেরই দিতে চাই। নিয়ে নাও।

মা তাতে ভয় পেতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে জ্যাঠামশাই কখনও বেচতে পারবেন না। ছলনা যখন নকল নাটুকে হয়, তখন তাতে কেউ ভয় পায় না। এমন কি বিপরীত পক্ষ যে ভয় পাওয়ার

অভিনয় করে সেও না। দর্শকও না। জ্যাঠামশায়ের ছলনা একেবারে থিয়েটারী ছলনা হত। মা বলতেন, সে আপনার ইচ্ছে। ইচ্ছে হলে আপনি বেচে দিয়ে সুখের জন্য তো কলকাতায় যেতে পারেন। আমার তা নয়। আমার মেয়েকে আমি ভাল করে মানুষ করব, পড়াব, যাতে ভাল পাত্রে পড়ে বা বিয়ে না-হলে মাস্টারী-টাস্টারী করেও খেতে পারে। আর বুদ্ধি ওর ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট হচ্ছে। ওকে এমন করে বলা আমার সহ্য হবে না। আমার তো মায়ের প্রাণ।

জেঠাইমা আর থাকতে পারতেন না—ফোঁস করে উঠতেন এবার. আর আমার রাক্ষসীর প্রাণ, না ?

জ্যাঠামশায় এবার ধমক দিতেন, কি হচ্ছে কি ? কি বলছ এ সব ?

মা বলতেন, ওই শুনুন না।

জ্যাঠামশায় বলতেন, তুমি বড়। তোমাকে সহ্য করতে হবে।

নীরা কৌতুক অনুভব করত। ছবিগুলো ফটোগ্রাফ নয়, পাকা রঙে তুলিতে আঁকা ছবির মত আঁকা হয়ে গেছে। হয়তো বা ফটোগ্রাফের সঙ্গে আঁকা ছবির যেটা তফাত, কালোর জায়গাটা ঘন কালো, আলোর জায়গাটা আর্টপেপারের মসৃণ অমলধবল শুভ্রতায় শুভ্র। কিন্তু বিষয়টা সত্য।

নীরা এর পর সোচ্চারে গভীর মনোযোগ সহকারে ইংরেজী পড়ত। ও ইস্কুলে প্রথম থেকেই ইংরেজী উচ্চারণ পর্যন্ত মেমসাহেবদের অনুকরণে আশ্চর্য রকমে সম্ভ্রান্ত।

Tell the man to come to me.

ও উচ্চারণ করত, "ঠেল দ্য ম্যান টু কম টু মি।" মানে—ও মনুষ্যটিকে বল আমার কাছে আসিতে। উসকো বোলো মেরি পাশ আনেকো লিয়ে।

মা ওই কথাটা মিথ্যে বলেন নি; নীরার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল এবং ওই ইস্কুলে পড়ানোর গুণে পড়তেও ভাল লেগেছিল। তার সঙ্গে শিখেছিল আর একটা জিনিস। সেটা সাজপোশাক, পরিচ্ছন্নতা। বছর দুই যেতে-না-যেতে মায়ের মৃত্যুর ঠিক আগেটায় আর সে মায়ের সাজিয়ে দেওয়া নিত না। নিজেই সাজত। বলত, না। তুমি বড় লাউড করে দাও।

আশ্চর্য হয়ে মা বলতেন, কি? কি করে দি?

—লাউড! লাউড মানে উচ্চ। মানে চড়া সাজ করে দাও। লাউড কথাটা নীরা তখন শিখে ফেলেছিল।

মা গৌরবে হেসে সারা হতেন, ওরে বাপরে!

মা বেঁচে থাকতেই সে ওই ইস্কুলের তিন বছরের কোর্স শেষ করে সেকালের ইউ-পি পরীক্ষায় মাসে তিন টাকা বৃত্তি পেয়েছিল। হেনা সেবার ফেল করেছিল।

এরপর মেমসাহেব নিজে এসে মাকে বলেছিলেন, আপনার কন্যাকে কোন ভাল স্কুলে ভর্তি করিয়া ডিবেন। উহার বিড্যা হইবে। বলেন টো আমি কোন মিশনের স্কুলে বলিয়া ডেখি। টাহারা ফ্রি করিয়া ডিবে। আমি বলিব। হ্যাঁ। আমি বলিব।

মা আর ততটা সাহস করেন নি। তিনি ওখানকার গার্লস্ হাইস্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছিলেন। তারা সমাদরের সঙ্গে ফ্রিশিপ দিয়ে তাকে নিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইস্কুলে এবং পাড়ায় নাম রটেছিল 'ব্রিলিয়াণ্ট গার্ল।' কেউ কেউ বলতেন—পরাণ মুখুজ্জের মেয়েটি যদি মেয়ে না-হয়ে ছেলে হত!

মা তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে বলতেন, ওই আমার

ছেলে। ছেলের চেয়েও বড়। ঠিক একদিন এমনি করে আদর করতে গিয়েই তিনি বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, একি হল? বুকে যে—। তারপরই আঁ-আঁ শব্দ করে গড়িয়ে পড়লেন।

নীরা মা—মা বলে ডাকতে ডাকতে চিৎকার করে ডাকলে, মা গো! কি হল? মা—মা—মা!

তার চিৎকারেই জেঠীমা ওপাশ থেকে বলেছিলেন, আরে এমন করে চেঁচাচ্ছিস কেন? মা কি মরেছে?

—জানি না। কি হল দেখ! জেঠীমাগো!

জেঠীমা এসে দেখে 'সর সর' বলে পাশে বসে মুখে কয়েকবার জলের ঝাপটা দিয়ে, নেড়ে-চেড়ে দেখে, উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—খেলে মা, মাকেও খেলে? ভাই খেয়ে ক্ষিদে মিটল্ না, বাপ খেয়ে মিটল না, শেষে মা—তাও খেলে?

নীরা বড় বড় চোখ দুটো বিস্ফারিত করে জেঠীমার দিকে তাকিয়েছিল। সে খেয়েছে মাকে? সে?

দৃশ্যটা শেষ হল। নাটক নয়? মায়ের অনাদরে দৃশ্যের আরম্ভ, বাপের মৃত্যুতে আকস্মিক পরিবর্তনে আশ্চর্য সমাদর, তার পরই হঠাৎ হার্টফেল করে মায়ের মৃত্যু এবং অন্তে জেঠীমার নিষ্ঠুর কঠিন নির্মম তিরস্কার—'মাকেও খেলে মা?'

যদি কেউ তার জীবন নিয়ে নাটক লেখে এবং বেশী নাটকীয় করতে ইচ্ছে করে তবে সে যেন যোগ করে দেয়—নীরা তারস্বরে প্রতিবাদ করে উঠেছিল—না-না-না-। আমি খাই নি, আমি খাই নি। তারপর আছড়ে পড়েছিল মায়ের বুকের উপর—মা-মা-মা।

বাস্তব হল, তার মনে আছে, সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জেঠাইমার কথাগুলি তার বুকে পিঠে মুখে চাবুকের মত আছড়ে কেটে বসছিল যেন। সে চীৎকার করে প্রতিবাদ করত কিন্তু মায়ের এমন কেন হ'ল সে বুঝতে পারে নি। সে আঘাত করেছে—লাগিয়ে দিয়েছে।

ভয়ঙ্কর আঘাত দিয়ে মৃত্যু আবার তার সামনে এসে দাঁড়াল। এবার সে মূক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কাঁদল না। কান্না এল না।

তিন

আবার নূতন দৃশ্য আরম্ভ হল। দ্বিতীয় দৃশ্য।

নূতনকালে রঙ্গমঞ্চের অভিনয়ে আলোকসম্পাত একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আলোর যাদুতে অসম্ভব সম্ভবপর হয়। দিনরাত সকাল দুপুর দেখানো অত্যন্ত সহজ।

প্রথম দৃশ্যটায় আলোকসম্পাত প্রত্যূষের পরিবেশ। আলো সবে ফুটছে। উষাকাল। দুচারটে কাকের ডাক উঠেছে শুধু! কারণ নীরার জীবনের সে কালটা প্রত্যূষই বটে। তার সঙ্গে কুয়াশা।

মায়ের চিতার আগুনের আলোর দীপ্তিতে শেষটা আলোকিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কলরব করে পাখীরা ডাকল। পূর্বদিগন্ত লাল হয়ে উঠল, সূর্য উঠছে। তারই মধ্যে সে চিতায় শোয়ানো মায়ের পুড়ে যাওয়া দেখলে।

মৃত্যুকে সে এমন করে দেখে নি। বয়সই বা কত যে দেখবে। আট বছর। জীবনে তখন স্মৃতি সক্ষম হয় নি, শক্ত হয় নি; জীবনের জলময় সৃষ্টি থেকে তখনও স্মৃতির পৃথিবী তরল পলিমাটির মত সদ্য জাগছিল। বাপের মৃত্যুর স্মৃতির মধ্যে বাপ নেই, ভারী মানুষটা সে তরল পলির চোরাবালির মধ্যে কোথায় ডুবে গেছে। খুঁড়লে হয়তো একটা নরকঙ্কাল বা তার ছাপওয়ালা মাটি বেরুতে পারে; থাকবার মধ্যে আছে চওড়া হাল্কা খাটিয়াটার দাগ। কিন্তু আট বছর বয়সে তার চোখের উপর, তার প্রায় কোলের উপর মায়ের এই মৃত্যু তার

শক্ত-হয়ে-আসা স্মৃতির পৃথিবীতে প্রথম নিষ্ঠুর আঘাত। সে যেন হত-চেতন হয়ে গেল। তাকেই মুখাগ্নি করতে হয়েছিল। শ্রাদ্ধও করেছিল। সে সব আঘাতে সে কোন প্রতিঘাত দিতে পারে নি। শুধু দুর্বোধ্য বা অবোধ একটা অনিশ্চিতের ভয়ে শুধু কেঁদেই ছিল ক'দিন ধরে। শুধু একটা কথা মনে আছে। সেটা এই দৃশ্য পরিবর্তনের বিরতি-সময়টুকুর মধ্যে অথবা এই একদৃশ্যে একটি অঙ্ক শেষ যদি কর—তবে প্রথম অঙ্ক ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্যের অবসরে—সেই কথাগুলিকে গ্রীনরুমে দ্বিতীয় অঙ্কের নাট্যপরিচালকের কঠিন নির্দেশ বলতে পার। শ্মশান থেকে ফিরতে সন্ধ্যা হয়েছিল। জেঠীমা বলেছিলেন. আজ আর খেতে নেই কিছু। বিছানায় শুতে নেই। ওই কম্বলে শুয়ে পড়।

পরদিন সকালেই বলেছিলেন, ওগো মেম সায়েব, সকালে উঠেই তো চুল আঁচড়াও, মুখে হয়তো পাউডারও দাও। সে সব যেন করো না। করতে নেই।

সে নিশ্চয়ই সে সব করত না। শোকের একটা স্বাভাবিক বৈরাগ্য আছে, সুখের কথা সজ্জার কথা মনে থাকে না। কিন্তু জেঠীমা যেন পরিচালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে নির্দেশ দিলেন, তোমার মেক-আপ সব পাল্টাল। সর্বদা মনে রাখবে, তুমি দুঃখিনী।

যবনিকা উঠল—শ্রাদ্ধবাসরে? না তারও পরে।

বারো চৌদ্দ দিনেই রপ্ত হয়ে গেছে তখন মেক-আপ। মুখে তখন একটা ছাপ পড়ে গেছে ক্লিষ্ট মালিন্যের, না ছোপ ধরে গেছে। এইটে তার এ অঙ্কের মেকআপ। উঠুক যবনিকা। তোল।

মনে রেখো মা মারা গেছে। শ্রাদ্ধও হয়ে গেছে। শ্রাদ্ধের দশ দিন কম্বলে শুয়েছে, একা শুয়েছে, পৃথিবীতে সুস্বাদু খাদ্যের জন্য মন

লালায়িত হয় নি ; লোভ হয় নি—কিন্তু ক্ষিধে পেয়েছে। কিন্তু হবিষ্যি সে খেতে পারত না। শ্রাদ্ধ করেছে। কিছু বোঝে নি। কেমন একটা আচ্ছন্ন বিভ্রান্ত ভাবের মধ্যে কেটেছে এ পর্যন্ত।

শ্রাদ্ধের পরও তেমনিভাবে উদাস বিভ্রান্ত হয়ে বসে থাকবে। সেদিন রবিবার। ওদিকে জাঠতুতো ভাইবোনেরা মানে হেনারা লুডো খেলছে, একজন হি হি করে হাসছে। এরই মধ্যে ডাক আসবে, জাঠতুতো বড় ভাই এসে বলবে, বাবা নীরাকে ডাকছে।

জেঠাইমা বলবেন, কি বলছেরে ওরা ওই কুণ্ডুবাবু আর হেডমাস্টার ? কথাটা কি ?

জাঠতুতো দাদা অজিত বলবে—কে জানে বাবা। যাচ্ছি খেলতে হুকুম হয়ে গেল—অজিত, ডাকতো নীরাকে ! যত সব—। নুইসেন্স। বলেই সে ওই ঘরের দিকে 'ডেকে দিয়েছি' বলে চীৎকার করে ছুটে বেরিয়ে যাবে বাড়ি থেকে।

মনে থাকে যেন। তোল যবনিকা এবার।

না। দাঁড়াও। বাধা পড়েছে।

* * *

১৯৫৬ সালে দুর্গাপুরের দামোদর ব্যারেজের ওপারে বাঁকুড়ায় বিনো সেনের আশ্রমে যুবতী নীরার বদ্ধ ঘরের দরজায় আঘাত পড়ছে। কে ডাকছে।

১৯৩৮ সালে মায়ের মৃত্যুর পর অতীতের দিকে তাকিয়ে সে দেখছিল তার জীবন-নাট্যের অভিনয় তার মানস রঙ্গমঞ্চে। আসল সংসার-রঙ্গমঞ্চে সে ১৯৫৬ সালে তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় শেষ করে এল এই মাত্র। তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যে বিনো সেনকে নিষ্ঠুর আঘাতে

আঘাতে বিপর্যস্ত' করে দিয়ে রঙ্গমঞ্চ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বিশ্রামের ঘরে বসে অতীত অঙ্কগুলির কথা ভাবছে। তার মানস-রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয়ের পুনরাবৃত্তি চলছে। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রতিচ্ছবি ফুটবে এমন সময় বাধা পড়েছে। কে কড়া নাড়ছে।

কে আবার? নিশ্চয় বিনো সেন। অনুতপ্ত বিনো সেন। প্রখ্যাত বিখ্যাত বিনো সেন নতশির হয়ে কি বলতে এসেছেন? দরজার গোড়ায় সে উদ্ধত ভঙ্গিতে দাঁড়াল। কি চান তিনি? কি ভাবেন তিনি?

বাইরে থেকে এবার ডাক শোনা গেল—নীরা! নীরা!

নীরা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।—কেন? কেন? কেন?

বিনো সেন ডাকলেও সে এত ক্ষিপ্ত হত না। ডাকছে অণিমাদি। স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া সেই সুখা মহিলাটি।—কেন তিনি আসবেন বিনো সেনের হয়ে কথা বলতে?

—নীরা। অ নীরা! নীরা।

এবার সত্য সত্যই নীরা চীৎকার করে উঠল কেন? কেন? কেন? কি চাই আপনার?

—তোমার খাবার এনেছি ভাই। খাবারটা নাও। আমি বসি তুমি খাও।

খাবার! কি আশ্চর্য! কি অত্যাচার!

এই মিষ্টমুখী অণিমাদি।—কি বলবে একে?

—নীরা।

এবার নীরা বললে—মাফ করবেন আমাকে, এখানকার খাবার আমার মুখে রুচবে না। রুচতে পারে না। উচিত নয়।

—ভাল। খাও না-খাও তুমি দরজাটা খোল দিকি। খোল। নীরা। না খুললে আমি যাব না।

—থাকুন সারারাত্রি দাঁড়িয়ে।

---শুধু দাঁড়িয়ে থাকব না। কড়া নাড়ব। ক্রমাগত কড়া নাড়ব। নীরা!

--না, নাড়বেন না। ডাকবেন না। চীৎকার করলে নীরা।

—কিন্তু অণিমাদি নাছোড়বন্দা। বললেন ডাকব। নাড়ব কড়া। আমি তোমাকে প্রেমপত্র লিখি নি। আমাকে কি বলবে তুমি?

কি আপদ! দরজা খুলে সে পথ আগলে দাঁড়াল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েই দাঁড়াল। ইচ্ছে হল তার হাতের থালাটা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দেবে। কিন্তু অণিমাদি একটু রূঢ় দৃষ্টিতেই তার দিকে তাকিয়ে গোড়াতেই বললেন—থালা ছোড়াছুড়ি করোনা নীরা ভাল হবে না। আমি কারুর দূত বা দূতী হয়ে আসি নি।

অণিমাদির বয়স হয়েছে। দু'চারগাছা চুলও সাদা হয়েছে। তা তিনি সযত্নে ঢাকা দিয়ে রাখেন। বেশ একটু মোটাসোটা। এই কথা বলে তিনি প্রায় তাকে ঠেলেই ঢুকলেন ঘরে। বললেন, ও মা! আমি ভাবছি, তুমি জিনিসপত্তর গোছাচ্ছ! এ যে সব যেমনকার তেমনি। বসে বসে কাঁদছিলে নাকি?

– কাঁদতে আমি জানিনে অণিমাদি। জীবনে আট বছর বয়সে কান্না শেষ করেছি মরা মায়ের বুকের উপর পড়ে। তারপর আর কাঁদি নি।

হাসলে নীরা।

খাবারের থালাটা রেখে অণিমাদি বললেন, তাই তুমি এমন

নিষ্ঠুরভাবে সমস্ত লোকের সামনে এত বড় মানুষটাকে এমন করে বলতে পারলে। আমরা হলে পারতাম না।

—তার যোগ্যতা নেই আপনার।

—তা হবে। তবে—আজ যা করলে তুমি—। একটু হাসলেন অণিমাদি।

—কি? অনুতাপ করতে হবে এর জন্যে? নীরাও ব্যঙ্গভরে হাসল।

—অনুতাপ-টনুতাপ বুঝিনে ভাই। তুমি বি-এ পাস করেছ, তাও আবার ডিস্টিংশনে। আমরা সে হিসাবে মুখ্যু মানুষ। তবে বয়স বেশী প্রায় দ্বিগুণ। আমি বিনো সেনের চেয়ে বয়সে বড়। দেখেছি অনেক। পুড়েছিও। আমি বুঝি কি জান? বুঝি, যে জীবনে কাঁদে নি, তাকে কাঁদতে হবেই।

—না। কঠিনভাবে ঘাড় নাড়লে নীরা।

—আচ্ছা। আমি চললাম। ইচ্ছে হয় খেয়ো না হয় খেয়ো না। দিয়ে গেলাম।

চলে গেল অণিমাদি।

নীরা তখনও ঘাড় নাড়ছিল—না।

ঘরের দেওয়ালে টাঙানো আয়নাটায় তার প্রতিবিম্ব ঘাড় নাড়ছে, না। মৃদুস্বরে সে বললে, সব কথা সব মানুষকে খাটে না অণিমাদি। আমি কাঁদি নি সেই দিন থেকে, কাঁদব না।

ভাল। বলে চলে গেলেন অণিমাদি।

ঘরের দরজা দিয়ে আবার বসল নীরা। বড় ক্লান্ত সে। বড় ক্লান্ত। বাইরে আশ্রমটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। নীরার দেহ ভেঙে পড়ছে।

কিন্তু মনে ক্ষোভ ক্রোধ এখনও পাক খাচ্ছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার তার মানস-রঙ্গ-মঞ্চের অভিনয় সুরু হয়ে গেল।

যবনিকা—কে যেন তুলে দিচ্ছে।

* * *

তোলো, জীবননাট্যের প্রথম বিরতির পর দৃশ্যপট তোলো। দেখ চরিত্র বিচার করে, সে কাঁদবে কি না। দৃশ্যপট বদল হয়েছে তখন। তাদের এবং জ্যাঠামশায়ের বাড়ির উঠোনের মাঝখানে যে পাঁচিলটা ছিল সেটা ভাঙা হয়েছে। যেটা তাদের শোবার ঘর ছিল, রাস্তার দিকে, সেটা তখন বসবার ঘর হয়েছে। ছোটখাটো অনেক বদল। নীরাকে শুতে হয় হেনার সঙ্গে।

ডাক এল, সেই ঘরে জ্যাঠামশায় ডাকছেন। স্কুলের হেডমাস্টার এসেছেন। সঙ্গে এসেছেন কুণ্ডুবাবু।

ডাকটা জানিয়ে দিয়ে জাঠতুতো দাদা গলিতে ছুটে বেরিয়ে গেল।

নীরা একলা বসেছিল—তাদের বাড়ী অর্থাৎ যে অংশটা তার বাবার—সেই উত্তর দিকটায় তাদের শোবার ঘরের সামনে পুরনো তক্তাপোষটার উপর, যেটা একটু নড়াচড়াতেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। সে যেন তখনও নিজের আবস্থাটা বুঝতে পারে নি। তবে অত্যন্ত যন্ত্রণা, অসহনীয়। সব ফাঁকা—কেউ নেই; একা যেন একটা গাছতলায় বসে আছে। এবং তার যেন কোন অধিকার নেই। কিছু করতে নেই। কিছু ছুঁতে নেই, সব মানা, সব বারণ। খেতেও নেই। জেঠাইমা মধ্যে মধ্যে বলেন—এত খেয়ে এখনও খাওয়া। এখনও ক্ষিদে!

এই জেঠাইমা তার বাবা মরবার পর তার মাকে বলেছিল—ওসব ওকে বলিস নে।

এখন—! এখন যদি সে বলে—ক্ষিদে নেই তাতেও তিনি বলেন—থাকবে কি ক'রে? দুটো আস্ত মানুষ বাপ-মা! বাপ!

ডাক দিলেও সে নড়ে নি। তার কি যেতে আছে? জ্যাঠামশাই ডাকছেন—তবুও কি—? সে জেঠাইমার দিকেই তাকিয়েছিল। ইতিমধ্যে আবার ডাক এসেছিল। জ্যাঠামশাইয়ের গলা—নীরা! আরে নীরাকে পাঠিয়ে দিতে বললাম যে!

গলার আওয়াজটা গম্ভীর—শক্ত।—শুনছ! নীরা এবার উঠেছিল আপনা থেকেই। ওই গম্ভীর শক্ত আওয়াজই যেন তাকে টেনে তুলেছিল। চোখ ছিল জেঠাইমার দিকে। তিনি কাজই করছেন কাজই করছেন। হঠাৎ চোখে চোখ মিলতেই তিনি বললেন—যাও ডাকছে যে।

সে পা বাড়াল। জেঠাইমা বললেন—ময়লা ওই ন্যাকড়া জামাটা পাল্টে যাও। একটা ফরসা ফ্রক পরে যাও। আমাদের ছিদ্দির খুজতে এসেছে—নিশ্চয় কুণ্ডু। বলবে ঘুঁটে কুড়ুনী করে তুলেছি এরই মধ্যে।

বলেই গলা তুলে স্বামীকে জানিয়ে দিলেন—যাচ্ছে। বাথরুমে গেছে।

সঙ্গে সঙ্গে গলা নামিয়ে বললেন—ফ্রকটা বদলে নাও। যাও।

ফ্রক পালটে, নীরা নিজের অভ্যাস অনুযায়ী চুলে চিরুনি দিয়ে মুখে পাউডার বুলোবার জন্যে কৌটোটা খুললে। ওটা তার ওই মিশন স্কুলের শিক্ষা। সামনেই আয়নায় তার কালো মুখখানা আরও কালো মনে হচ্ছে, বড় গরীব বড় নোংরা দেখাচ্ছে। ধবধবে ফ্রকের সঙ্গে কেমন বেমানান লাগছে। ঠিক এই সময় পিছন থেকে কে ঢুকল।

আয়নায় দেখলে নীরা—ঘরে ঢুকেছে হেনা। আবার ডাকতে এসেছে। সে পাউডারের পাফটা মুখে বুলুতে লাগল যত তাড়াতাড়ি পারে কিন্তু হেনা বলে উঠেছিল—ও মা! তুই পাউডার মাখছিস? তোর না মা মরেছে?

হাতখানা আর নড়ে নি। কিন্তু ঠিক সে বুঝতে পারে নি! তবে মুহূর্তে এবার তার অন্তরে বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তারপর বলেছিল—কেন? এখন তো আবার মাছ খাচ্ছি, বিছানায় শুচ্ছি। জেঠীমা বললেন, পরিষ্কার হয়ে যেতে।

বলেই সে তার মনের পঙ্গুতা কাটিয়ে মুখে পাফটা বুলিয়ে নিয়েছিল।

জেঠীমা বারান্দাতেই ছিলেন; সব শুনেও ছিলেন; বারান্দায় বেরিয়ে আসতেই তিনি বলেছিলেন, একটু গন্ধ মাখলিনে? একটু সেণ্ট? তোর তো আছে।

একটা তীক্ষ্মমুখ মোটা সূচ যেন তার বুকে বিঁধে গিয়েছিল। অন্য মেয়ে হলে, সে নিশ্চয় কাঁদত বা সভয়ে মুখের পাউডার মুছে ফেলত। কিন্তু সে কোনটাই করে নি। ভুরু কুঁচকে, বাল্যের মসৃণ ললাটে, সূক্ষ্ম তিক্ত রুক্ষ রেখা জাগিয়ে তুলেছিল।

অনিমাদি ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই ক'রে, দুঃখকে যারা জয় করে, তারা কাঁদে না। ওই লড়াইয়ে কাঁদতে মানা গো। কাঁদলেই হারলে। তোমার চোখের জলেই তোমার পায়ের মাটি পিছল করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বে। নীরা কখনও কাঁদবে না। জীবননাট্যে তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে দ্বিতীয় অঙ্কে। প্রথম অঙ্ক তো তুমি জান না, জানলে ও কথা বলতে না। থাক।—

প্রম্পটার বলছে—অণিমাদি তৃতীয় অঙ্কে।

এখন কেন অণিমাদির কথা বলছ?

—ভুল হয়ে গেছে। দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় চলছে—মানস রঙ্গমঞ্চে।

নতুন ড্রয়িংরুম, হ্যাঁ, জ্যাঠামশায় তাদের শোবার ঘরখানাকে ড্রয়িংরুমই বলতে শুরু করেছেন তখন: ঘরে ঢুকতেই জ্যাঠামশায় বললেন, কাল থেকে তুমি ইস্কুলে যাবে, বুঝেছ। হেডমাস্টার মশায় নিজে এসেছেন।

নীরা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ডাগর চোখ দুটিতে তার বিভ্রান্তি এবং বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।

হেডমাস্টার বললেন, দাঁড়িয়ে কেন? বস!

সে বসল। জ্যাঠামশায় বললেন কি রে তোকে আমরা ইস্কুলে যেতে বারণ করেছি?

তা তো মনে পড়ল না নীরার। সে ঘাড় নাড়লে, না।

কুণ্ডুবাবু বললেন, তবে ইস্কুলে যাচ্ছ না কেন? ইস্কুলে গেলে তো ভাল থাকবে। পাঁচজনের মধ্যে থাকবে।

চুপ করে বসে রইল নীরা। ভুরু দুটো আবার কুঁচকে উঠল। হেনা ইস্কুলে যায়, দশটায় জেঠীমা তাগিদ দেন, হেনা! দশটা বাজে যে। কই তাঁকে তো বলেন না। তার মা মরেছে, তাকে যেতে আছে?

হেডমাস্টার বললেন, ইস্কুলে যাবে কাল থেকে। আমরা আশা করি, ভালভাবে পাস করবে। স্কলারশিপ পাবে। ইচ্ছে হলে

আই-এ, বি-এ, এম-এ পড়বে। পাস করবে। কত মেয়ে করছে। চাকরী করছে। বুঝলে না?

নীরা বললে, আমাকে ইস্কুলে যেতে আছে? আমার মা মরেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়। অশৌচ চলে গেছে, আবার কি? কাল থেকেই যাবে তুমি, এই তো হেনা যায়। ওর ইস্কুল তো আমাদেরই প্রাইমারি সেকশন। একসঙ্গে যাবে।

নীরা বলে ফেললে, জেঠাইমা বকবেন না?

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, না-না। কেন বকবেন?

—উনি তো বকেন। সব তাতেই বকেন।

জ্যাঠামশাইয়ের মুখোশ এবার খুলছিল, বললেন, না, সব তাতেই বকেন না। অন্যায় করলেই বকেন এবং বকবেন। তোমার মা তোমার মাথা খেয়ে গেছে আদর দিয়ে। যাক, ইস্কুলে যাবে তুমি, তাতে তিনি কখনই বকবেন না।

—ছি-ছি-ছি হারাণবাবু। ছি! বলে উঠলেন কুণ্ডুবাবু।—এই শিশু মেয়ে। পনের দিন আগে মাতৃবিয়োগ হয়েছে—

জ্যাঠামশাই বলে উঠলেন, বোধ করি জলমগ্ন ব্যক্তির মত তিনি রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন, কুণ্ডুমশাই! শুধু ওই একটি কথা!

কুণ্ডুমশাই তাতে ভীত হবার ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি সহাস্তে বলেছিলেন—বলুন!

উত্তর খুঁজে পান নি জ্যাঠামশাই। তিনি নীরাকেই ধমক দিয়ে বলে উঠেছিলেন—যাও, তুমি ভিতরে যাও। তুমি ইস্কুলে যাও না, ওঁরা আমাকে দোষ দেন। কাল থেকে ইস্কুলে যাবে। বুঝলে? সে চলে যাচ্ছিল, আবারও বললেন জ্যাঠামশাই—বুঝলে?

সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ।

বলেই বেরিয়ে এল। বারান্দায় বেরিয়েই সে থমকে দাঁড়াল। সামনে উঠানে বারান্দায় চার পাঁচ জোড়া চোখ তার দিকে হিংস্র আক্রোশে ধ্বকধ্বক করছে। যেন একদল নেকড়ে। তার আর পা উঠল না। কাছে গেলেই যেন ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। পিছনে বাইরের ঘরে জ্যাঠামশাইয়ের একেবার ফেটেপড়ার মত গলার আওয়াজ শোনা গেল।

কুণ্ডুমশাই, আমি প্রটেস্ট করছি আপনি ধনী বলে আমার ঘরে নাক গলাতে আসবেন না। সে আমি কখনও সহ্য করব না। নেভার।

—একশোবার করব। শুনুন হারাণবাবু, পরাণের সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ বন্ধুত্ব ছিল—

—ছিল, খাদ্য আর খাদকের।

—সে জানা আছে। ভাইয়ের সম্পত্তির ওপর লোভের কথা পরাণ জানত। সে যখন আমাকে জমি বিক্রী করে, তখন সে আমাকে একখানা চিঠি লিখেছিল। আমার সে দলিল আছে।

—কুণ্ডুমশাই!

—শুনুন হারাণবাবু, পরাণের মেয়েকে ফাঁকি দেবার মতলব আপনার এ চাকলার লোক এর মধ্যেই বুঝে নিয়েছে। কিন্তু শুনুন, ফাঁকি দিতে চাইলে তা পারবেন না। আমি পরাণের টাকাকড়ির সব হিসেব জানি, রাখছি। আমি দরখাস্ত করব এস-ডি-ও এবং পুলিস সাহেবের কাছে। জজ সাহেবের কাছেও জানাব আপনি একটি নাবালিকার অভিভাবকত্বের সুযোগ পেয়ে তাকে ঠকাচ্ছেন।

—করবেন। করবেন বলব না। করুন বলছি।

কথাগুলি বেশ উচ্চ কণ্ঠেই হচ্ছিল। বাড়ীর ভিতরেও স্পষ্ট হয়ে প্রতি কথাটি ভেসে এসে পৌঁছুচ্ছিল। সেই কণ্ঠধ্বনির আতঙ্কেই বোধ করি জেঠাইমা, হেনা এবং তার তিন ভাই চীৎকার করে আক্রমণ করতে পারছিল না, নইলে তাদের চোখে-মুখে-হাতে-দাঁতে হিংস্র নেকড়ের হিংসা ফুটে উঠেছে। আর নীরা তাদের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটা থাম ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গাছের আড়াল দিয়ে বন্য মানুষ যেমন ভাবে এমন ক্ষেত্রে নেকড়েদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয় ঠিক তেমনি ভাবে। ভয় তার দৃষ্টিতে নেই। সাহস আছে। প্রতি-রোধের সঙ্কল্প আছে ক্রোধও একটা আছে। মরতে হ'লে না মেরে সে মরবে না। মৃত্যু এলেও তাকে থাবা সে মারবে হারবার আগে।

জেগেছে তার বিদ্রোহ তখন। সেই, সেই বোধ হয় প্রথম দিন।

এ দৃশ্যের শেষ এখানে হলেই অনেকের মতে ভাল হ'ত। মানুষ-নাট্যকারের নাটকে তাই হত। কিন্তু এ নাট্যকার মানুষ নয়। ভগবান বলতে আপত্তি আছে নীরার, ভগবান সে মানে না। তবু মানুষ নয় এমন একজন নাট্যকারকে সে মানে বা অনুভব করে। আজকাল যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে যে যন্ত্রে মানুষের যে অঙ্ক কষতে একমাস লাগে তা কয়েক মিনিটে কষে দেয়। এই নাটক হয় তেমনি কোন অদৃশ্য-শক্তি যন্ত্রের রচনা। যারই হোক—তার নাটকে এ দৃশ্য এখানে শেষ হয় নি। পরের দিন সকাল দশটা পর্য্যন্ত চলেছিল।

কুণ্ডুমশাই চলে যেতেই জ্যাঠামশায় ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন—এইভাবে আমার মুখে চূণকালী না মাখালেই কি চলত না।

জেঠাইমা বলেছিলেন—মাখালাম আমরা ? না তোমার এই ভাইঝি।

তিনি হুমহুম করে এগিয়ে এসেছিলেন তার দিকে। সে কিন্তু নড়ে নি। তিনি আঙুলটা মুখের কাছে দেখিয়ে থেমে গিয়েছিলেন।

জ্যাঠামশাই চাপা গলায় বলেছিলেন—কুণ্ডু এখনও রাস্তায়। তারপর বলেছিলেন—ওকেও শাস্তি দেব না ভেবেছ? দেব কিন্তু তার সময় আছে।

নীরা কিন্তু ঠিক তেমনিভাবেই দাঁড়িয়েছিল। না, একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। সেও যেন এই পশুগুলির আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পশুই হয়ে গিয়েছিল। এতগুলি বিপক্ষের বিরুদ্ধে সে একা, বনের ঝোপে আশ্রয় নেওয়া বেড়ালের মত নখ যেন ঈষৎ বের করে দাঁড়িয়েছিল। চোখের পলক পড়ছিল না তার।

এইভাবেই শেষ হয়েছিল সেদিনের পালা। ঝোপের চারিপাশে ব্যর্থ গর্জন করেই শান্ত হয়েছিল তারা। নিশ্চিন্ত হয়েছিল এই ভেবে—যে আগলানো আছে যাবে কোথায়? রাত্রে সে শুয়েছিল একা তাদের ঘরে। কারণ তাকে শুতে কেউ ডাকে নি। বাড়ীর ঝিটা বারান্দায় শুয়েছিল যেমন শোয়। বিছানায় শুয়ে নীরা জেগেই ছিল, ঘুম আসে নি। আজ যেন তার অবস্থাটা সে প্রথম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করলে। মাতৃবিয়োগের সকাতর অসহায়তাটুকুকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে তখন হিংস্র হয়ে উঠেছে! সেই যে উঠল বিদ্রোহের হিংস্রতায় উগ্র হয়ে তা আর তার গেল না। রাত্রে জেগে ছিল, ঘুম আসে নি ; মায়ের মৃত্যুর আগে থেকেই সে এটুকু বুঝেছিল যে, ওরা সম্পর্কে নামে আপন হলেও ওরা আপন নয়, ওরা পর। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে আজকের ওই ঘটনার আগে পর্যন্ত তার ওই ধারণাটাই

দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে এসেছিল। এই ঘটনার পর বাড়ী ঢুকেই ওদের চোখেমুখে কঠিন আক্রোশ এবং হিংসা দেখে সে বুঝেছে এরা শুধু পর নয়, এরা তার শত্রু। পরের কাছে হয় সঙ্কোচ। শত্রুর কাছে হয় পায়ে লুটিয়ে পড়তে হয়, নয় দাঁত নয় যে কোন অস্ত্রই তার থাকে, তাই উদ্যত করে ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে হয়। নীরা তাই দাঁড়িয়েছিল তার প্রকৃতির নির্দ্দেশে, পায়ে লুটিয়ে পড়ে নি। সে দাঁড়িয়েছে প্রস্তুত হয়ে। এবং নিজের যুদ্ধকৌশল আপনিই তার ভিতর থেকে আবিষ্কৃত হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তার মধ্যে। নীরব অথচ উদ্ধত সহিষ্ণুতা তার প্রধান ধর্ম। জেঠীমা ভেবেছিলেন একা ঘরে শুয়ে নীরা ভয় পাবে। কিন্তু তাও সে পায় নি। এমন কি একলা থাকার সুযোগেও সে কাঁদে নি। সে রাত্রিটি নীরার জীবনে অক্ষয় স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত।

পরদিন সকালে ইস্কুল যাবার সময় সে বইখাতা সমস্ত ঠিক করে স্নান করবার আগে এসে দাঁড়িয়েছিল জেঠীমার সামনে। জেঠীমার বাড়িতে সেই নতুন ঠাকুর এসেছে। মায়ের শ্রাদ্ধে এসেছিল, আর তাকে বিদায় করা হয় নি।

দাঁড়াবার মধ্যেই যেন কিছু বলা হয়েছিল। জেঠীমা তবু তাকে কোন কথা বলেন নি। বলেছিলেন ঠাকুরকে—ক্লাসের ফার্স্ট মেয়েকে ঘণ্টাখানেক আগে ইস্কুলে যেতে হয় ঠাকুর। যা হয়েছে দিয়ে দাও।

এবার সে বলেছিল, আমি কি পরে ইস্কুল যাব? আমার সাদা ফ্রকটা সেদিন হেনা পরে ওদের স্কুলের ফাংশনে গিয়েছিল। সেই থেকেই সেটা ও পরছে।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল জেঠীমা। তার মুখের উদ্ধত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে তিনি ডেকেছিলেন, হেনা।

ও ঘরে হেনা তখন চুল আঁচড়াচ্ছে। বলেছিল, কি ?

—নীরার ফ্রক নিয়েছ, দিয়ে দাও।

—না তুমি সেদিন বের করে দিয়ে বল নি, এটা তুই পরিস ? তা হ'লে অমি দেব কেন ?

—তর্ক করো না, দাও।

—না, দেব না। আমাকে এমনি একটা সুন্দর ফ্রক না-দিলে আমি দেব না। কক্ষনো না। না। এটাই আমি নেব। ওকেই তুমি কিনে দিয়ো।

—দাও।

—না।

—না ? জেঠীমা গিয়ে ওকে দুমদাম শব্দে মেরেছিলেন, এবং ফ্রকটা কেড়ে এনে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, ওই নাও।

নীরবেই সে কুড়িয়ে নিয়েছিল। এবং সেইটে পরেই ইস্কুল গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে পাট করে সযত্নে তুলে রেখেছিল। পরদিন সকালে দেখেছিল সেটা ফালি ফালি করে ছেঁড়া। খানিকক্ষণ সেটাকে হাতে ধরে তাকিয়ে দেখে, বাড়ির বাইরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসেছিল। কিচ্ছু বলে নি।

এইটেই প্রথম দৃশ্যের শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক সুদীর্ঘ। দশ বৎসর। প্রথম দৃশ্য চব্বিশ ঘণ্টার ঘটনা। তার পরেরটি—দীর্ঘ অঙ্কটির অর্দ্ধেক সময় জুড়ে—একটি পাঁচ

বৎসরের দৃশ্য। হেনারা ভাইবোনে পাঁচজন, জ্যাঠামশাই জেঠাইমা এবং সে—এই আটজনের সংসারে সে একা এবং ওরা সাতজন একদিকে। সেই ঝোপের মধ্যে বন্দী বেড়ালের মত স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি, উদ্যত নখ, কিন্তু আক্রমণ প্রতীক্ষায় নীরব, স্থির। শুধু একটা পরিবর্তন উভয় পক্ষই অনুভব করেছে, সেটা হল এই যে, ঘরের কোণের বন্দী যে জীবটিকে বিড়াল মনে হয়েছিল, সেটা বড় হয়েছে—এবং সকলেই কিছুটা পিছু হটেছে; কারণ নেকড়েরা যেটাকে বিড়ালের বাচ্চা ভেবেছিল—সেটা তো বিড়ালী নয়—এযে একটা কিশোরী চিতা বাঘিনী। তবে শীর্ণ, দীর্ঘ, কুৎসিত।

পটভূমিকে কোন রকমে প্রতীকের মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে পারা যায়। একখানা ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে চমৎকার হয়। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য—একটা ঝোপের মধ্যে একটি সন্ত্রস্ত সতর্ক দৃষ্টি বিড়ালের ছবি দিয়ে ১৯৩৮ সালের মাস-পঞ্জী লাগিয়ে টাঙানো থাকবে এবং এই দ্বিতীয় দৃশ্যে ১৯৪৬ সালের ক্যালেণ্ডারে একটি কিশোরী চিতা বাঘিনীর ঘুম ভেঙে আড়ামোড়া ছাড়ার ভঙ্গির ছবি দিয়ো, চমৎকার হবে।

না। উপরের দিকে তাকিয়ে আছে এমনি ছবি দিয়ো। বনের মাথায় ঝড়ের টান। ঝড় চলছে। ১৯৪২ সাল থেকে দেশে তখন যুদ্ধের ঝড় এসেছে। ঘরের আলোয় ঠুঙি পরিয়ে দিয়ো। ব্ল্যাক আউট। ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর এয়ার রেড সুরু হয়েছে। '৪২ সালের সাইক্লোনে বাড়ীর পাশের একটা বড় গাছ ভেঙেছিল—ঠিক মাঝখানে সেটা কন্ধকাটার মত দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাঠামশায়ের বাড়ীর দিকটায় ভারা বেঁধে রেখো; জ্যাঠামশায় যুদ্ধের বাজারে জমি নিয়ে এবং আরও সব কি কি নিয়ে যেন গোপনে

ব্যবসা করছেন। ফাঁপতে ধরেছেন। দমদমে এরোড্রোম হয়েছে। বাড়ছে।

দিনে রাত্রে প্লেনের গোঙানিতে আকাশ কাতরাচ্ছে। গুজব নানান রকম। ইংরেজ, এ্যামেরিকান, কাফ্রি, নিগ্রো, চীনে সেপাইয়ে ভরে গেছে কলকাতা। তারা নাকি নানান অত্যাচার করছে। নোট উড়িয়ে দেয় শীতের উত্তরে হাওয়ায় ঝরা পাতার মত। ক্যাঙালীতে ভরে গেছে এ দিকটা। দখ্‌নে ক্যাঙালী। '৪২ এর আশ্বিনে সাইক্লোন গেছে, তাদের সব উড়ে গেছে। সুরু হয়েছে দুর্ভিক্ষ।

এই দৃশ্যের পটভূমিতে জ্যাঠামশায়ের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্বলতর বেশভূষা কিন্তু তার বেশভূষা সেই এক। মলিন না হলেও উজ্জ্বল নয় ; মূল্যের তারতম্যও দেখলেই বোঝা যায়।

নেকড়ের পালের রাজত্বের মধ্যে সতর্ক যুদ্ধে আত্মরক্ষা করে বেড়ে ওঠা কিশোর বয়সের চিতাবাঘিনীর সঙ্গে তুলনা কষ্ট-কল্পনা নয়—সাদৃশ্য অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হয়েছিল, সেটা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি কিশোর চিতাবাঘিনীতে।

সত্যই তাই। শুধু প্রকৃতিতে নয়, আকারেও সে এমন লম্বা ঢেঙা হয়ে উঠেছিল যে জ্যাঠামশায়ের বেঁটেখাটোর সংসারটিতে যে-কেউ এলেই একদৃষ্টিতে বুঝতে পারত, এ তাদের কেউ নয়।

গৌরাঙ্গী সে নয়, শ্যামাঙ্গী। কিন্তু বাল্যবয়সে একটা বড় কোমল লাবণ্য ছিল, শ্রী ছিল। চৌদ্দ পনের বছর বয়সে সে ঢেঙা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব যেন হারিয়ে গেল। শুধু রইল ওই বড় বড় চোখ আর একপিঠ চুল। আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে দেখে, নিজের উপরেই তার রাগ হত। কিন্তু কাঁদত না সে।

হেনা তখন আশ্চর্য সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছোটখাটো মেয়েটি, নধর গড়ন, মুখে কোমল লাবণ্যই শুধু নয়, সে ততদিনে নারীসুলভ কটাক্ষও আয়ত্ত করেছে। নাটক নভেল অনেক পড়েছে। পড়ায় সে কাঁচা বরাবর, সেটা তখন এমন অবস্থায় পৌঁচেছে যে, ওদিকে পাকার সম্ভাবনা একেবারেই নষ্ট হয়েছে। নীরা পড়ছে তখন ক্লাস নাইনে, হেনা ফেল করে তখনও পড়ে আছে ক্লাস সিক্সে। আট বছরে যে অঙ্ক সুরু হয়েছে তারপর পাঁচ বছর শেষ হতে চলেছে, এই পাঁচ বছরে হেনা তুবার ফেল হয়েছে। গোড়া থেকেই হেনা ওর থেকে একক্লাস নিচে পড়ত। কিন্তু তাতে হেনাও খুব তুঃখিত নয়, তার মা বাপও নয়। হেনার নারীত্ব এবং নারী সুলভ লাবণ্য বিকশিত হতে দেখেই তাঁরা খুশী ছিলেন। নিত্য চৌদ্দ বছরে পা-দেওয়া মেয়ের চুল বেঁধে দেবার সময় মা তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলতেন—টাকা খরচ করব, কত বেটা বড় লোকের ছেলে এসে সেধে নিয়ে যাবে। টাকাও তো আসছে লক্ষ্মীর কৃপায়।

একটা হারমোনিয়াম কিনে দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই। সেটা বাজিয়ে সে গলা সাধত। সা-রে-গা-মা। সারেগা, রেগামা, গামা পা! তারপর ক্রমে—তু চারখানা আধুনিক সিনেমার গানও সে শিখেছিল। ভাইদের সঙ্গে ছাদে থিয়েটার করত। নায়িকা সাজত।

সে চুপ করে বসে থাকত।

ভাইরা লোকের প্রয়োজনে তাকে ডাকত, কিন্তু সে যেত না।—না। কি সাজবে সে? ঝি? না।

পাড়ার অন্য তুটি মেয়ে এবং কটি ছেলে আসত। অজিতদা বড় হয়েছে। ম্যাট্রিক একবার ফেল করেছে। কিন্তু কালচারে তার খুব

অনুরাগ। ফ্যামিলি থিয়েটার করবে। জেঠাইমা তেমনি কঠোর তেমনি নির্মম তার উপর। এই সুযোগে তার দিকে তাকিয়ে বলতেন —ওমা, কি হবে মা? এ মেয়েকে পছন্দ করবে কে?

হেনা বলত, ও কি শুধু পুরুষদের সঙ্গে লেখাপড়ায় পাল্লা দেয়? ও যে টিফিনের ছুটিতে ইস্কুলে স্কিপিং করে। লং জাম্প দেয়, পুরুষদের সঙ্গে বক্সিং করবে। হবে না এমনি চেহারা? শেষ পর্যন্ত না বেটা ছেলে হয়ে যায়। আজকাল খবরের কাগজে বের হয়!

হি-হি করে হাসত।

সে চুপ করে থাকত।

জেদ করে সে সাজসজ্জা প্রসাধন ছেড়ে দিয়ে নিজেকে আরও শ্রীহীনা করে তুলতে চেষ্টা করলে। একদিন সে আর থাকতে পারলে না; জেঠীমাকে বললে, ভাববেন না। আমাকে কেউ পছন্দ করবে বলে ভগবান বোধ হয় সৃষ্টি করে নি। কিন্তু ভয় নেই, আমি কারুর গলগ্রহ হতেও জন্মাই নি। তা আমি হব না।

জেঠীমা বলেছিলেন, কি বললি? ক্লাসে ফার্স্ট হোস বলে এত অহংকার তোর?

সে বলেছিল, যার কেউ নেই তার অহং না থাকলে সে বাঁচে কি করে, বলুন? অহং যার সর্বস্ব, তার অহংকার ছাড়া কি আছে সংসারে?

—তার মানে?

—তার মানে, অহং মানে আমি। আমার আমি ছাড়া আর তো কেউ নেই, কিছু নেই। তাই অহংকার করেই বেঁচে আছি। নইলে হয় বিষ খেতে হয়, নয় গঙ্গার জলে ঝাঁপ দিতে হয়।

আশ্চর্য। মানুষের যে কখন কি হয়, আর কিসে কি হয় তা কেউ বলতে পারে না। ওই কথাকটি কিভাবে যে জেঠীমার মনে গিয়ে বাজল আর তার কণ্ঠস্বরও সেদিন কি মুহূর্তের জন্য তার অজ্ঞাতসারে কোমল করুণ হয়ে উঠেছিল? হয়তো উঠেছিল। নইলে সেদিন এমনটা হল কেন? তার সমস্ত জীবননাট্যে আর একটা কি ছুটো ছাড়া অমন সুন্দর নাটকীয় বিস্ময় আর আসে নি। গোটা জেঠাইমা মানুষটাই যেন আগাগোড়া পালটে আর এক মানুষ হয়ে সামনে দাঁড়াল। সে কি তার কথার সুরের ছোঁয়ায়? হ্যাঁ, তার ওই কথার সুরের ছোঁয়ায়!

তখন জেঠীমা কিছু বলেন নি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তার ঘরে এসে জেঠীমা তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বাড়িতে হেনারা ছিল না। তারা ভাইবোনেরা মিলে গিয়েছিল পাড়ার অ্যামেচার থিয়েটার দেখতে। সে যায় নি। যেত না কখনও। পড়ছিল সে।

জেঠীমা ডেকেছিলেন, নীরা।

সে মুখ তুলে তাকিয়েছিল, সুর শুনে বিস্মিত হয়েছিল।

জেঠীমা বলেছিলেন, তোর মনে হয় নীরা, আমরা কেউ তোকে একটু ভালবাসিনে, না?

নীরা অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। কথা বলে নি।

জেঠীমা বলেছিলেন, না যতটা ভাবিস তা নয়। তোর নিজেরও দোষ আছে। ভেবে দেখিস। তুইও আমাদের আপনার ভাবতে পারিস নি। তবে হ্যাঁ, দায়িত্বটা আমাদের আগে। তুই সেই একদিন কুণ্ডুবাবুর কাছে আমার এমন কুৎসা করলি, যে—।

বলেই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন,

তা ছাড়া আমার ছেলেমেয়েতে পাঁচটা, তারা গুণে তোর চেয়ে এমন ছোটরে, যে তাদের জন্যে—

কথাগুলো তিনি উচ্চারণ করতে পারছিলেন না। যেখানে সত্য কথা বলে নিজেকে খাটো করতে হয়, তার চেয়ে নিষ্ঠুরতর সত্য আর নেই। সে সত্যকে ভয় ওই বিনোসেনও করেন। জোড়হাত করে বলতে হয়, আমাকে ক্ষমা কর। আমাকে ক্ষমা কর!

আঃ আবার ক্রম ভঙ্গ হচ্ছে। ভুল হচ্ছে। জীবন রঙ্গমঞ্চে বিনোসেনের সঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের অভিনয় শেষ করে সে তার ঘরে বসে পিছনের অভিনয় দেখছে তার মনের রঙ্গমঞ্চে।

* * *

ওই অসমাপ্ত কথা আর তিনি সমাপ্ত করতে পারেন নি। করেন নি। কেঁদে ফেলেছিলেন। নীরা সবিস্ময়েই তাকিয়েছিল তাঁর মুখের দিকে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! জেঠাইমার চোখের কোল থেকে ছুটো ধারা গড়িয়ে এল। মনে আছে ডান চোখ থেকে আগে তারপর বাঁচোখ থেকে।

নীরা কাঁদে নি। কান্না তার পায় না। সে অভিভূত হয়ে বসেই ছিল। চুপ করে বসেছিল।

জেঠাইমা তাঁর চোখ মুছে একটু ধরা ধরা গলায় বলেছিলেন— পড়। তুই ভাল ক'রে পড়। রূপ না থাক। গুণ আছে তোর, তার দাম যে আরও বেশী! পড় তুই।

নীরা আবার উৎসাহভরে বলে উঠেছিল—দেখবেন আমি স্কলারশিপ নেবই!

জেঠাইমা বলেছিলেন—যেন ভাবতে ভাবতে বলেছিলেন—একালে বড় বড় পণ্ডিত বিদ্বানেরা বিদ্বান পরিবার চায়। তারা রূপের চেয়ে বিদ্যের আদর করে। তেমনি কেউ যেচে এসে নিয়ে যাবে তোকে। আমি বলছি।

বলেই তিনি চলে গিয়েছিলেন।

জেঠাইমা মেয়েদের বিবাহ-না-হওয়া জীবনের কথা ভাবতে পারতেন না। শুনলে যেন দিশেহারা হয়ে যেতেন!

প্রসন্ন হাসি মুখে মেখে নীরা চুপ করে বসেছিল। এমন একটি প্রসন্ন দিন এর পূর্ব্বে তো তার জীবনে আসে নি!

পরের দিন স্কুল যাবার আগে জেঠাইমা ডেকেছিলেন— নীরা শোন!

—কি জেঠাইমা।

—বস তো। এক রাশ চুল, না করিস যত্ন, না সামনেটা একটু ফেরাস। বস।

নীরা খুশী মনে বসে নি, কারণ রূপের অভাবের জন্য প্রসাধনে তার তিক্ততা ছিল। তবুও সে কথা অমান্য করে নি। তিনি চুল আঁচড়ে বেণী বেঁধে সামনেটা সুশ্রী করে দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিয়ে নীরাকে দেখে বলেছিলেন --কে বলে শ্রী নেই। তাই তো রে মুখখানা একটু ভরলে যে বড় সুন্দর হবে।

হেনা বলেছিল, ও মা! আমি যাব কোথায়?

অর্থাৎ জেঠীমার এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখে।

কিছুটা দিন সুখেই গিয়েছিল। গোটা ক্লাস নাইনের বছরটাই। জেঠীমা সত্যিই স্নেহ করেছিলেন। কিন্তু নীরার জীবন যে নাটক। ব্যঙ্গ করলে কি হবে। হঠাৎ নাটকীয় পরিবর্তন ঘটল; যেন কেউ

ঘাড় ধরে ঘটিয়ে দিলে। এবং তার মুখ দিয়ে বললে তাকে দিয়েই ঘটালে।

সে ওই হেনার জন্য। হেনার জন্য স্বেচ্ছায় জেঠাইমার মর্মান্তিক ঘৃণার বিষদৃষ্টিতে পড়ল নীরা।

জেঠাইমার স্নেহের স্পর্শে ঔদ্ধত্য তার বেড়েছিল। জীবনের ভঙ্গিটা পাল্টেছিল। আগে হাসত না। এখন হেসে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত। হেনাদের সঙ্গে মেলামেশাও করত। ঔদ্ধত্য প্রকাশ করত লেখাপড়ার কথায়। সহপাঠিনীদের এমন কি দিদিমণিদেরও ব্যঙ্গ করত।

জেঠাইমা বলতেন, না। এমন করে অহঙ্কার করে না।

নীরা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলত, আচ্ছা আর করব না।

কিন্তু আবার করত। দিদিমণিদের ব্যঙ্গ করে বলত—বি টি পাস হলে কি হবে, উনি জানেন না কিছু। বড়লোকের মেয়েদের উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। এরই মধ্যে ঘটল নাটক। পার্শ্ব অভিনয়ে এরই মধ্যে হেনার পরিবর্তন হয়েছিল প্রচণ্ড—সে নীরা কেন, জেঠাইমাও জানতেন না। হেনা তার চেয়ে বয়সে কয়েকদিনের ছোট হলেও—বয়সে চৌদ্দ বছরে পা দিলেও মনে মনে এবং দেহের গঠনেও তখন কৈশোর অতিক্রম করেছে। নাটক নভেল পড়ে মন তার স্বপ্নরঙীন হয়ে উঠেছে, দেহেও তার জোয়ার আসছে।

ঠিক মাস ছয়েকের মধ্যে ঘটে গেল। সে এক আশ্চর্য দ্রুতসঙ্গত ছন্দ এসে গিয়েছিল গোটা বাড়ীটাতে। জ্যাঠামশাই রিটায়ার করলেন। এক্স্‌টেনসন্ পেতেন কিন্তু নিলেন না। বেনামীতে জমি কিনে রেখেছিলেন দমদম এরোড্রোমের পাশে, যুদ্ধের প্রয়োজনে এরোড্রোম

বড় হচ্ছে, জমির দাম হু-হু করে বাড়ছে, সেই চড়া দামে জমি থেকে পেলেন প্রচুর টাকা। এবং ব্যবসাদার হয়ে বসলেন একমাসের মধ্যে। কলকাতায় আপিস খুললেন। সদ্য-মেরামত-করা বাড়ীখানার তাঁদের অংশে আবার ভারা বাঁধা হল। ভেঙ্গেচুরে ফ্যাসন বদল হবে। দোতলায় ঘর উঠবে। একদিন জ্যাঠামশাই স্যুট পরে বাড়ী এলেন। অজিতদাও স্যুট পরে কলেজ ছেড়ে আপিসে ঢুকল ছোটসাহেব হয়ে। সুজিত মেজ. সেও স্যুট পরে ইস্কুল যেতে লাগল। হেনার জন্যে শাড়ী এল। সেও দু'তিনখানা পেয়েছিল। কিন্তু হেনার নিত্য নূতন শাড়ী পরা বাতিক হয়ে উঠল। জেঠাইমা বলতেন—পরে পরে পুরনো করিসনে। বিয়ের সময় লাগবে। বিয়ের সম্বন্ধও দেখা হচ্ছিল। বাড়ীটায় লক্ষ্মীর চঞ্চল অঞ্চলের বাতাসে এমনই একটা এলোমেলো হাওয়া বইল যে হেনার পরিবর্তন কারুর অস্বাভাবিক মনে হয় নি। সপ্তাহে দুদিন সিনেমায় যেত। ভাইয়ের সঙ্গে পাড়ার সঙ্গিনীদের সঙ্গে। গান গাইত। সাজত। ইস্কুলে তার উচ্ছ্বলতা বেশি ক'রে চোখে পড়ত। কিন্তু নীরা—পড়ার নেশায় এবং জীবনের সেই শৈশবের একাকীত্বের একটি স্বাভাবিক গতিতে আপন পথেই চলেছিল। পড়া। পড়া! পড়া! তাছাড়া রূপহীনা সে—তার একটা লজ্জা ছিল। সে পারত না। হেনাও তাকে চাইত না। ক্রোধ ঘেন্না বা হিংসে তাদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই, সেই ফ্রকের ব্যাপার থেকেই। কিন্তু সেটা ইদানীং বেড়ে উঠেছিল—হেনার পৈত্রিক সমৃদ্ধিতে আর নীরার প্রতি জেঠাইমার আকস্মিক মতিগতির পরিবর্তনে।

বোধ হয় একজনের চোখ এড়ায় নি। সে জেঠাইমার। তিনি মধ্যে মধ্যে হেনাকে শাসন করতেন—বকতেন।

—তোকে আমি সাবধান করে দিচ্ছি হেনা—

—কেন কিসের সাবধান? হেনা উত্তর দিত।

জ্যাঠামশাই বাড়ী থাকলে বলতেন—কেন ওকে মিছিমিছি বক বলতো?

—বকি ওর ভালর জন্যে।

ভাইরা বলত—মাম্‌স—সে কাল আর নেই। এ ভাবে তুমি চেঁচামেচি করো না। কি হয়েছে? ছি!

হেনা কাঁদতে বসত। কেঁদে জিতত।

জেঠাইমা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন। শেষ পর্যন্ত হার মানতেন। নীরা দেখত। আবার কিছুক্ষণ পর পড়ায় মন দিত। জেঠাইমা কিন্তু ভুল দেখেন নি।

হঠাৎ হেনার সে রূপ নাটকীয়ভাবে প্রকাশ পেল। পেল পেল— নীরার কাছেই। সে আশ্চর্য ভাবে প্রকাশ পেল।

হেনা তার নিচে পড়ে। তার ছুটি হয় নীরার অনেক আগে। হেনার নিজের একটি দল আছে। তাদের সঙ্গেই যায় আসে। দূরত্বও বেশী নয়, মিনিট দশ বারোর পথ। নীরার ক্লাস নাইন। সে ভাল ছাত্রী। স্কলারশিপ পাবার খুব আশা। তাই স্কুল থেকে হেড মাস্টার ব্যবস্থা করেছেন ছুটির পর আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিট কোচিং ক্লাসের। একা নীরা নয়—আর দুটি মেয়েও আছে। হেনা বাড়ী ফেরার প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর সে বাড়ী আসে। একাই আসে। এই পাড়ারই মেয়ে। এবং ভাল মেয়ে বলে সকলেই তাকে স্নেহ করে। সে পিতৃমাতৃহীনা সেও একটা কারণ। এবং সে কুশ্রী। সব থেকে বড় কারণ সে নিজে সাহস রাখে দুঃসাহস। পাড়ার দুষ্ট ছেলেরা

তাকে বলে—এম-পি। অর্থাৎ মেয়ে পুরুষ। কিন্তু মুখে বলে—মিলিটারী পুলিশ।

সেদিন কোচিং ক্লাস সেরে বেরিয়ে এসে সে অবাক হয়ে গেল। হেনা একা চুপ ক'রে বসে আছে। মুখখানা শুক্‌নো। তাকে দেখেই বললে—বাবাঃ—বসে আছি কখন থেকে!

নীরার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।—বাড়ি যাস নি? বসে কেন?

অদ্ভুত রকমের হেসে সে বলেছিল, তোর জন্যে। তোর সঙ্গেই যাব।

—জেঠীমা বলেছেন বুঝি?

—হ্যাঁ।

মনে মনে জেঠাইমার উপর তার ভালবাসা আবেগের উত্তাপে গাঢ়তর হতে চাইল। সে বললে—চল।

স্কুল থেকে বেরিয়েই গ্রামের বাজারের পথ। পাঁচটা বাজছে, লোকজন এসময়ে একটু বেশি। এখন এলাকাটা দমদম মিউনিসি-প্যালিটির মধ্যে এসেছে। ইলেক্‌ট্রিক লাইট হয়েছে। ওরা দুজনে গল্প করতে করতেই চলছিল। একাই কথা বলছিল নীরা। হেনাকে বলছিল ক্লাসের একটা গল্প। ইতিহাসের টিচার আজ পড়াতে পড়াতে রবীন্দ্রনাথের কোটেশন দিতে গিয়ে ভুল কোটেশন দিয়েছেন, সে তা ধরে দিয়েছে। অবশ্য আপনার ভুল হচ্ছে বলে ধরে দেয় নি। সে বলছিল—জানিস? কোট করলে, 'শক হূণ দল মোগল পাঠান এক দেহে হল লীন।' আমি প্রথমটা কিছু বললাম না। বুঝলাম মোগল পাঠান বই আছে; খেলা আছে, সেইটেই ভদ্রমহিলার মনে আছে। ওঁর শেষ হলে বললাম, দিদিমণি কবিতাটার মিলটা কেন

খারাপ করলেন ? রবীন্দ্রনাথ আর হিস্ট্রীও উল্টোপাল্টা হয়েছে। শক হুণ দল পাঠান মোগল হলে কেমন মিল হত আর হিস্ট্রীও ঠিক থাকত। আগে পাঠান তারপর তো মোগল এসেছে। দিদিমণি কিন্তু খুব ভাল মেয়ে। আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ। ওটা তাই হবে। কবির ভুল নয় ওটা, ওটা আমারই ভুল।—বুঝলি—। বলতে বলতে থেমে গেল সে, প্রশ্ন করলে—কি ?

হেনা হঠাৎ যেন তার গায়ে এসে সেঁটে লেগেছে। হেনা উত্তর না-দিয়ে বললে—মরণ। বলেই সে তাকে রাস্তার দিকে ঠেলে দিয়ে এপাশে এল।

আরও বিস্মিত হল সে। হেনা খুব ভয় পেয়ে গেছে। কি হল ? এবার নীরার চোখে পড়ল—একটি সাইকেলে চড়া ছেলে। ছেলেটি পাশ দিয়েই পার হয়ে গেছে এখুনি। এই মুহূর্তে সেই সাইকেলে-চড়া ছেলেটিই গাড়িটা ঘুরিয়ে মন্থরগতিতে ইচ্ছে করে সাইকেলটাকে এঁকিয়ে বেঁকিয়ে চালিয়ে হেনার দিকে চেয়ে একটা বিশ্রী হাসি হেসে এগিয়ে আসছে। নীরা ভুরু কুঁচকে বললে, ও কে ? তোর দিকে তাকিয়ে হাসছে কেন ?

হেনা বললে, ওই ওরই জন্যে। ও আমায় জ্বালিয়ে খেলে। ইস্কুলের মেয়েদের সঙ্গে যাই, ও আমাকে যা-তা বলে। পিছু নেয়। সে তার লম্বা কাঠের মত হাতখানা চেপে ধরলে। নীরা অনুভব করলে কাঁপছে সে।

তবু প্রশ্ন করলে—কিন্তু ও কে ? তুই চিনিস ?

—ও মনা ঘোষ। থিয়েটার করে !

মনা ঘোষের নাম সে শুনেছে বটে।

মনা ঘোষ তখন কাছে এসে গেছে। প্যাডেলে একটু একটু ধাক্কা মেরে অতি মন্থর গতিতে এসে হেসে বললে, কি? আজ এত দেরী যে?

নীরা বললে, কি চান আপনি?

—তোমাকে নয় মণি।. ওই ওকে!

মুহূর্তে এক কাণ্ড করে বসল নীরা—সাইকেল-আরোহীর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়েই এক চড় কষিয়ে দিলে। মনা ঘোষ সাইকেল ছেড়ে গালে হাত দিতে গিয়ে সাইকেলসুদ্ধ পড়ে গেল। নীরা চিৎকার করে উঠল, লম্পট কোথাকার!

১৯৪৩ সালের কলকাতার শহরতলী। লোক জমে গেল। কিন্তু তার আগেই মনা ঘোষ উঠে সাইকেলটা নিয়ে চলে গেল, বলে গেল—আচ্ছা, আমিও চিঠি নিয়ে ফাঁস করে দেব।

হেনা ফোঁস ফোঁস করে কাঁদছিল। এ রাস্তায় ওরা দুজনেই, বিশেষ করে নীরা, বিশেষ পরিচিত। তার ঢেঙাপনা ও শ্রীহীনতার জন্যও বটে এবং ওর ভাল মেয়ে বলে সুখ্যাতির জন্যও বটে। সে বললে, পথ ছাড়ুন, আমরা বাড়ি যাই। একটা কুকুরকে মেরেছি, তার জন্যে হৈ চৈ করছেন কেন? পথও সে করে নিয়েছিল। হেনার হাত ধরে সে হনহন করেই চলতে সুরু করেছিল। এবং ভিড় এড়াবার জন্য সদর রাস্তা ছেড়ে কুণ্ডুবাড়ীর পিছন দিকের খানিকটা পড়ো জমির উপর পায়েচলা পথ ধরেছিল। কিন্তু হঠাৎ—হেনা হাত টেনে নিয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নীরা বলেছিল—কি হল? হেনা হাউহাউ করে কেঁদে উঠে বলেছিল, আমি কি করব নীরা, মা যে আমাকে কেটে ফেলবে।



—কেন ?

—ওরে সবইতো জানাজানি হবে রে এরপর। ঢাকাতো থাকবে না। আমি যে ওর সঙ্গে মজা করবার জন্যে ইয়ার্কি করেছি। হেসেছি, ঠাট্টা করেছি।

স্তম্ভিত হয়ে গেল নীরা। হেনা কেঁদে উঠল, ওরে আমার যে বিয়ে হবে না এরপর। আমার যে বিয়ের কথা হচ্ছে। আমায় তুই বাঁচা নীরা। কোন উপায় কর। আঃ, তুই ওকে মারলি কেন ?

জায়গাটা বাড়ির কাছেই এবং একটু নির্জন। হেনা হাউ হাউ করে কেঁদে বসে পড়ল।

নীরা বললে, তুই বলবি, তুই কিছু জানিসনে। নীরা জানে।

—ও চিঠি লিখেছিল, আমি যে তার উত্তর দিয়েছি। মনা ঘোষকে জানিসনে। আমি কি করলাম, আমি কি করব ?

—কিছু করবিনে, বাড়ি চল। আমি সব দোষ ঘাড় পেতে নেব। ভাবে নি মুহূর্তের জন্য এবং এও মনে হয় নি যে তার উপর কেউ কোন মন্দ ধারণা করতে পারে। তার মনে হয়েছিল সে বলবে হেনা কিছুই জানে না। সে একলা আসত, ছেলেটা তার পিছন নিত, মন্দকথা বলত। তাই সে আজ হেনাকে বলেছিল তুই একটু থাকিস তো ভাই। একসঙ্গে যাব। ইচ্ছে ছিল হেনাকে সাক্ষী রেখেই সে তাকে শিক্ষা দেবে।

—আমি যে চিঠি লিখেছি।

—চিঠি ও দেখাতে আসবে না। এত সাহস হবে না।

—হবে। ও মনা ঘোষ। তুই জানিসনে।

এক মুহূর্ত কি কয়েক মুহূর্ত সে স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়েছিল।

প্রেম—পুরুষের প্রতি কিশোরী হৃদয়ের অনুরাগ ও আকর্ষণ, ফুল ফোটার মত দেহমনের যে অনিবার্য চঞ্চলতা এ সম্পর্কে কোন অনুভূতি উপলব্ধি তার ছিল না। না--ছিল না। ফুল না-ধরা কাঁটা গাছের মত তার জীবন। আয়নায় সে নিজেকে দেখেছে আর তার মনে হয়েছে সে কি কুশ্রী! বাড়িতে শুনেছে—বাইরে শুনেছে। পথে চলতে চলতে মনে হয়েছে—লোক তাকে দেখে ভাবছে কি কুশ্রী মেয়েটা? চিত্ত তার কঠিন হয়েছে। কপালে কোঁচকানো রেখার সারি দেখা দিয়েছে। মনে মনে একে সে চেষ্টা করে ঘৃণা করতে শিখেছে এবং পেরেছে। দুরন্ত ঘৃণা হয়েছিল হেনার উপর।

মনে পড়ছে—চকিতের জন্য মনটা হেনার এই চোখের-জলে-বুক-ভাসা অসহায় অবস্থা দেখে খুশিও হয়ে উঠেছিল। তার পরই সে মাথা নাড়া দিয়ে নিজেকে তিরস্কার করে অভয়দাত্রীর মত তাকে অভয় দিয়ে বসেছিল—কোন ভয় নেই তোর। ওঠ। সব ভার আমার। তার মনে অপার সাহস---অফুরন্ত বল—সে এ সবের উর্ধ্বে। এত উর্ধ্বে যে কেউ কাদা ছুঁড়তে সাহস করবে না। এবং কল্পনা করেছিল—তার এই সাহস—মনাকে চড় মারার জন্য—জেঠাইমা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলবেন—তুই আমার মহিষমর্দিনী!

হেনা তবু ওঠে নি। বলেছিল—ওরে আমার চিঠি আছে ওর কাছে। মজা করবার জন্যে দিব্যি ক'রে বলছি নীরা—মা কালীর দিব্যি। দক্ষিণেশ্বরের কালীর দিব্যি।—নীরা বলেছিল---বেশ, তাও বলব, আমি লিখেছি তোর নাম দিয়ে। তোর লেখা নকল করে। বলব, আমি ওকে একটু মজাই দেখাতে চেয়েছিলাম। পেছনে লাগে—তাই মারব বলে এই করেছি।

হেনা সকরুণ মুখে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—দিব্যি কর।

—করছি। ভগবানের দিব্যি।

—না। দক্ষিণেশ্বরের মা কালীর দিব্যি কর।—দক্ষিণেশ্বরের মা কালী হেনার কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। অলজ্ঘনীয়া। কিন্তু সে তখন ঈশ্বরে দেবতায় অবিশ্বাসিনী। সে হেসে বলেছিল—হ্যাঁ তাই করছি। এবং তাই করেছিল। বাড়িতে এসেও তাই বলেছিল। কারণ বাড়িতে ততক্ষণে খবর পৌঁছে গেছে। জেঠীমা দোরগোড়ায় থমথমে মুখ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

* * *

জেঠাইমা শুনে তার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়েছিলেন। যেন বিশ্বাস কিছুতেই হচ্ছিল না। হঠাৎ এগিয়ে এসে নিজের পা বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, পা-ছুঁয়ে দিব্যি কর!

সে তাই করেছিল। নীরার কিশোর মনে যেন একটা আত্মত্যাগের নেশা লেগেছিল। আবার আশ্চর্য নাটক ঘটে গেল। জেঠীমা বুকে জড়িয়ে ধরলেন না, পাগলের মত ওকে চুলের মুঠো ধরে মারতে স্থরু করেছিলেন। সে তার কল্পনার এই সম্পূর্ণ বিপরীত সংঘটনেও বিচলিত হয় নি; স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাঁদে নি। জেঠীমা আশ্চর্য মানুষ! তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন নি যে, নীরা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে মিথ্যা বলতে পারে। এবং তাঁর বিশ্বাসমত এই কৌতুকের ছলে যে পাপ করেছে নীরা—তাও অমার্জনীয়। অবশ্য তার সঙ্গে তাঁর চিরকালের বিদ্বেষ যা এতকাল—ঝাঁপিবন্দী সাপের মত বন্দী ছিল—সেটাও ছাড়া পেয়েছিল।

জ্যাঠামশায়ও বিশ্বাস করেছিলেন কিনা সে বলতে পারে না।

তাতে নীরার সন্দেহ আছে। কারণ তিনি অবিলম্বে হেনার বিয়ে দেবার ব্যবস্থায় লাগলেন।

সে উঠে-পড়ে লেগে বিয়ে দেওয়া। টাকা তাঁর তখন অনেক তবুও তিনি বেশি টাকা খরচ করবেন। হেনা বিয়ের সম্ভাবনায় খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলো। আর সে তার কলঙ্কের পসরা মাথায় করে হল বন্দিনী। সব হারাতে হয়েছিল। জেঠীমাকে হারিয়েছিল, পড়ার সুযোগ হারিয়েছিল—

ইস্কুলেও আর তার ঠাঁই হয় নি। মনা ঘোষ চড়ের শোধ নিতে তার কথাটাই সত্য বলে ঘোষণা করেছিল।

বাড়িতে বন্দিনীর মত জীবন হল। জেঠীমা সত্যই তাকে বন্দিনী করেছিলেন। শুধু বন্দিনী নয়। অস্পৃশ্য--অপবিত্র বলে বাড়ির একপাশে নির্বাসিত হয়েছিল সে। থাকত তাদের ভাগের রান্না-ঘরটায়। চুপ-চাপ বসে সে ভাবত আর বই ওল্‌টাতো। ওইটে সে কোন দুঃখ-হতাশায় ছাড়তে পারে নি। অনুশোচনা করে নি। কিন্তু ভাবত, এ হল কি? এতটা তো সে ভাবে নি। এরই মধ্যে একদিন হল জ্বর। তারপর চেতনা হারাল। তারই মধ্যে যখন খানিকটা চেতনা হয়েছে—তখনই দেখেছে পাশে বসে হেনা।

আশ্চর্য! এতেই সেই রোগের অসুস্থতার মধ্যেও সে এক অদ্ভুত সান্ত্বনা সুখ পেয়েছিল। না। হেনা তো অকৃতজ্ঞ নয়। এই তো তার অনেক পাওয়া।

বত্রিশ দিন পর সে পথ্য পেয়েছিল। তখন তার কঙ্কালসার কুৎসিত কালো চেহারা। কালো রঙ আরও কালো হয়েছে। এর উপর দিন বিশেকের মধ্যে মাথার চুলগুলি প্রায় সব উঠে গেল।

তার পরেই হল পনের দিনের মধ্যে হেনার বিয়ে সে মহাসমারোহের বিয়ে।

সে বের হয় নি। কিন্তু তার উপর জেঠীমা তার ঘরের দরজায় তালা দিয়েছিলেন। কি জানি তাকে নিয়ে কেউ যদি কোন কথা তোলে। ইঙ্গিত করে। তা ছাড়া জেঠীমা বিচিত্র জেঠীমা—তাঁর কাছে নারীজীবনের এইটেই সব থেকে বড় এবং হয়তো একমাত্র অপরাধ! সে অচ্ছুত।

কোলাহল কলরব রসুনচৌকির বাতাবরণের মধ্যে সে ঘরে বই খুলে বসে থাকত। তার প্রাইজের বইগুলি পড়ত। নটা ক্লাসে বরাবর ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে—খান তিরিশেক বই। বাংলা ইংরিজী। সাহিত্য, ইতিহাস বিজ্ঞানের নানারকম বই। রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা, বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', ইংরিজী পৃথিবীর ইতিহাস—এই পড়ত বেশি। মধ্যে মধ্যে পড়ত ইংরিজী এলিস ইন দি ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড! খুব যখন ভার হত মন—তখন পড়ত প্রেমেন মিত্তিরের ছেলেদের গল্প আর শিবরামের ছেলেদের গল্প—ওগুলো পেয়েছিল নিচের ক্লাসে।

ওই বিয়ের সময় থেকেই পড়া আরম্ভ করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাস দিয়ে সুরু। এইখানে নীরার জীবননাট্যে দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ।

শেষ হয়েছিল এইভাবে।

হেনা শ্বশুরবাড়ি যাবে। রসুনচৌকি বাজছে। সানাইয়ের সুর উঠেছে। কলকল করছে বাড়িটা।

হঠাৎ হেনা এসে ঘরে ঢুকল।

—নীরা।

—হেনা ?

হেনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলেছিল—তোর কি হবে নীরা ?

নীরা কি বলবে ভেবে পায় নি। তবে কাঁদেও নি। হেসেও কিছু বলতে পারে নি।

জেঠীমা—হেনা—হেনা বলে ডাকতে ডাকতে ঘরের সামনে এসে প্রশ্ন করেছিলেন—কে খুললে ঘরের তালা ?

বলে উত্তরের অপেক্ষা করেন নি—ঘরে ঢুকে হেনার হাত ধরে টেনে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন—শুভক্ষণ পার হয়ে যাচ্ছে। চল।

বেরিয়েই ঘরে তালা দিয়েছিলেন।

নীরা এবার একটু হেসেছিল—তারপর বই খুলে বসেছিল—পৃথিবীর ইতিহাস। শেষ হল দ্বিতীয় দৃশ্য।—

চার

তৃতীয় দৃশ্যের পটভূমি গাঢ় অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। পাঁচ বৎসরব্যাপী দ্বিতীয় দৃশ্যের পর তৃতীয় দৃশ্য।

এবার গোটা বাড়িটা নয়। রঙ্গমঞ্চের এক কোণে নীরার বন্দী জীবনের ঘরখানা। বাড়ির এক কোণের ঘর। বাকী বাড়িটায় এখন উৎসবের সজ্জা খোলা হচ্ছে। সে দিকটা এখন অন্ধকারই থাক। আলো ফেল নীরার ঘরে।

হেনার বিয়ের পর।

হেনা চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। ফিরে এল স্বামীর সঙ্গে হাসি মুখে। নীরা ঘরে বসে কথা-বার্তার হাসির ধ্বনি শুনতে পায়। সে প্রায়-অন্ধকার ঘরে বসে বই পড়ে আর উঠানের দিকে যে জানালাটা সেই দিকে তাকিয়ে আকাশ দেখে। বাইরের দিকে জানালা নেই বলেই এঘরে তাকে রেখেছেন জেঠাইমা। বাইরে থেকে যদি মনা ঘোষ পত্র ছুঁড়ে দেয়, সে উত্তর দেয়, কথা বলে ! আকাশের দিকে তাকিয়ে ছেলেবেলার ছড়া মনে পড়ে নীরার, এক তারা নাড়াখাড়া--।

বাইরে আনন্দ কলরব ওঠে। জামাই এসেছে। জ্যাঠামশাইয়ের গলার সাড়া পাওয়া যায়। জামাইয়ের সামনে ভারিক্কি বড়লোকী চালে কথা বলেন। অজিতদা, সুজিত, অন্য ভাইরা দল বেঁধে উল্লাস করে উপরের ঘরে উঠে যায়। উপরে ঘর কখানা এই বিয়ের আগেই শেষ হয়েছে। নীরা শুনেছে মোজেইকের মেঝে হয়েছে। বিয়ের

সময় মেঝে শুকিয়ে নেবার জন্যে না কি চারটে খুব বড় স্ট্যাডিং ইলেকট্রিক পাখা কেনা হয়েছিল—পাখা চারটে সপ্তাহখানেক চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরেছিল। উপরের ঘরেই হেনা তার বর এবং জেঠীমার ছেলেরা থাকে। রেডিয়ো বাজে। হারমোনিয়ম বাজিয়ে হেনা গান করে।

হেনা এসে অষ্টমঙ্গলা সেরে আবার চলে গেল। একদিন মাত্র উঁকি মেরে বলেছিল—কেমন আছিস নীরা।

নীরা বলেছিল—ভাল। তুই?

—সে বলিসনে। দিন রাত্রি ছাড়বে না। খেয়ে ফেল্‌লে আমাকে। বলে হেসে উঠল।

নীরা একটু হাসল। বললে—যা—এখুনি হয়তো খুঁজবে। নয় জেঠাইমা দেখতে পাবে।

—পরে আসব। হ্যাঁ? বলেই সে চলে গেল। পালিয়ে বাঁচল। নীরারও ভাল লাগছিল না।

যদি বল ঈর্ষা—তবে বলো। নীরা কিছু বলবে না। কিন্তু এইটুকু বলবে—সুখ দুঃখ, ঈর্ষা বিদ্বেষ, স্নেহ প্রেমের অস্তিত্ব আলোছায়ার মত একটার সঙ্গে অন্যটার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক হলেও ওর উপরেও এই বাস্তব মাটির জগতের মতই একটা অতি সত্য জগত আছে। Thy need is greater than mine বলে মরুপ্রান্তরে যে নিজের মুখের জল অন্য তৃষ্ণার্তকে দিতে পারে—তার মৃত্যু ওই মরুভূমিতে জলাভাবেই ঘটে—দেহের কষ্টও হয়, নিশ্চয় হয় কিন্তু মনের কষ্ট কি অনুশোচনা হয় না—এটা নীরার কাছ থেকে শুনে রাখ।

জেঠীমা কঠিন নিষ্ঠুর। তাঁর কাছে এ অপরাধের ক্ষমা ছিল না। অসুখের সময় বলতেন, ও মরে যাক। ও মরে যাক।

সে-কথা অসুখের ঘোরের মধ্যেও তার দু চারবার কানে গেছে। মনে আছে তার। রোগ সারলে বলতেন—জীবনে যার দুর্ভোগের জন্যে জন্ম, মরণও তার হয় না। যম নিতে আসে—ওই দুর্ভোগ তার পথ আগলে দাঁড়ায়। বলে, না—আমার শিকার তুমি পাবে না। দুর্ভোগের সহায় যে নিজে ভগবান। যমকে ফিরে যেতে হয়। সৌভাগ্য যাদের, সুখ যাদের, তাদের বেলা ভগবানের অন্য বিচার। আয়ু থাকতেও তারা মরে। সে মরণ তাদের মোক্ষ যে!

কখনও কখনও বলতেন, তুই যদি আমার পেটের মেয়ে হতিস, ওই হেনা যদি এই কাজ করত, তবে বিষ দিয়ে আমি মেরে দিতাম।

আবার বলতেন, ভাবতাম, আমি হেনার জন্যে। ওর জন্যে তো ভাবনা হয় নি।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতেন, এ ওই ক্রীশ্চান ইস্কুলের শিক্ষার ফল।

নীরা বেশ একটি নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে শুনেই যায়। হাসে। হাসিটি বিষণ্ণ বটে কিন্তু বিক্ষুব্ধ নয়। কারণ একটা আশ্চর্য অনাবিল আত্মপ্রসাদ ছিল। তা ছোট ভেবো না। ভাবলে ভাবতে পার। তা হলে তুমি জেঠাইমা থেকেও সংস্কার বা অন্ধ বিশ্বাসে বদ্ধ এবং অন্ধ। কারণ জেঠাইমার সংস্কারেও তবু একটা আদর্শ আছে। তোমার সংস্কার সে-ক্ষেত্রে বাস্তবতার দোহাই দিয়ে 'চোরের—সবাই চোর ধারণার মত' নীচ এবং কুটীল।

ও-বিশ্বাসে পৃথিবীতে ক্ষুধা আর খাদ্য—কাম আর নারীপুরুষের দেহ ছাড়া আর কি আছে বলো? শুধু ভাব-ভাবনার ক্ষেত্রেই নয়। বস্তুজগতেও তো তা হলে খাদ্য আর দেহ ছাড়া কি প্রয়োজন?

জন্তুর আলো লাগে না ঘর লাগে না শিল্প লাগে না সাহিত্য লাগে?

যাক।

ধীরে ধীরে এবার রঙ্গমঞ্চটার আলো ফুটে উঠছে।

বিয়ের উৎসবের সাজ খোলা হয়ে গেছে, তবুও জ্যাঠামশায়ের ভোল পাল্টানো বাড়িখানা রঙে গড়নে মনোহারী দেখাচ্ছে। জানালা দিয়ে দেখা যায় নতুন তৈরী সিঁড়িটা। সম্পূর্ণ হাল ফ্যাশনের। বিশেষ করে সিঁড়ির পাশের ঘের বা রেলিংটা। চমৎকার লাগে। ওখানে স্বীকার করতে হয়—জ্যাঠামশায় পয়সার সঙ্গে সত্যিই বড়লোকী রুচিও পেয়েছেন। ওই সিঁড়ি দিয়ে হুড়বুড় করে জাঠতুতো ভাইরা নামে ওঠে। সকলের পরণেই চমৎকার কাপড়চোপড় মানে পোষাক। ধুতি পাঞ্জাবী নয়, স্যুটের রেওয়াজ বেশী হয়েছে। অজিত সুজিত তো পরেই, তার ছোট রণজিৎও পরছে। কারণ সেও এবার ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছে। তার ছোট অভীজিত এখনও হ্যাফপ্যাণ্ট পরছে। তবে তাও বেশ দামী। সুজিত তার থেকে বয়সে বড়, কিন্তু ফেল ক'রে ক'রে ক্লাস টেনেই ঠেকে রয়েছে। তাতে তার দুঃখ নেই। পড়াও সে ছাড়তে চায় না। কারণ সে খেলা নিয়েই মেতে আছে। নিত্য অপরাহ্নে খেলার পোষাক পরে ছোটে। দমদমে নয়—কলকাতার মাঠে। ফেরে রাত্রি সাড়ে আটটা ন-টায়। জ্যাঠামশায় আপিসে তাকে ঢোকাতে চান; সে ঢুকছে না, তাতে নাকি খেলায় অসুবিধে হবে।

অজিতদা ফেরে আরও রাত্রে। সে আপিসের ছোটবাবু। মধ্যে



মধ্যে জড়িত স্বরে উচ্চকণ্ঠে কথা বলে।—I don't care. বলতে হয় বাবাকে বল—that old husband of yours, ask him ; সেই আমাকে পাঠিয়েছিল—হোটেলে সাহেবদের এণ্টারটেন করতে। তাকে জিজ্ঞেস কর!

নীরা বুঝতে পারে—অজিতদা নিজের মাকে বলছে। তিনি কিছু বলেছেন। হয়তো জড়িত কণ্ঠস্বরের কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন।

জ্যাঠামশায়ের কথাও শুনেছে।—দেখ ব্যবসা করতে হয়। মুদীর দোকান নয়। ধানচালের আড়ত নয়। বিলিতী ব্যবসা। পার্টি বাগাতে—হোটেলে খাওয়াতে হয়। হ্যাঁ হয়। টাকা এমনি আসে না। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক।

নীরা শুনেই যায়।

জেঠীমায়ের আদর্শ সে জানে, এরপর আর তিনি কথা বলবেন না। বলেনও না। তবে মধ্যে মধ্যে এক আধদিন বলেন, দেখ নিজে ওই বলে খেতে স্থুরু করেছ, এখন নিত্যি। না হলে চলছে না—

জ্যাঠামশাই বলেন—নইলে বুড়ো বয়সে এনার্জি পাব কোথায়। শরীরটা তো বাঁচাতে হবে। এবং ওটা ওষুদ। ডাক্তারের প্রেসক্রুপসন মতই খাই। তুমি নিজে মেপে ঢেলে দাও। ইচ্ছে মত তো খাইনে। আমার এখন অনেক কাজ। বাঁচতে হবে। বুঝেছ!

হঠাৎ নাটকে নাটকের মতই নাটকীয়ভাবে গতি দ্রুত এবং ধ্বনি উচ্চ হয়ে উঠল। রাত্রে সেদিন জ্যাঠামশাই স্খলিত স্বরে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ঘরে ঢুকলেন।

—ফরটি ফাইভ থাউজ্যাণ্ড্‌! পঁয়তাল্লিশ হাজার! নেট প্রফিট!

তোল একশো এক টাকা পূজো!

নীরা সেদিন একটু চকিত হয়ে উঠল। জ্যাঠামশাই!?

আজ শব্দ শুনতে পেলে—ঠাস্ ঠাস্—ঠাস্! সঙ্গে সঙ্গে জেঠীমার কণ্ঠস্বর—এই—এই—এই! কপাল! হায়রে কপাল!

চীৎকার করে উঠল জ্যাঠামশাই—শাট আপ! বুড়োমাগী কপাল চাপড়ায় না। এই নে—এই নে! গুণে নে পঞ্চাশ হাজার টাকার করকরে নোট! নে! নে!

—ও কি হচ্ছে কি? নোটের বাণ্ডিলগুলো—।

—নে—নে। নে!

—আঃ!

—কেয়া আঃ! কিসের আঃ।

মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। মিলিটারী সাহেব, তারা মদ খাওয়ালে খুশী হয় না, তাদের সঙ্গে খেলে তবে হয়। ভাবে—ঘেন্না করছে। দমদমের ওপাশের জলো জমি কিনেছিলুম আড়াইশো টাকা বিঘে, ওরা দর ঠিক করেছিল দু হাজার টাকা বিঘে; পার্টি দিয়ে ওদের সঙ্গে ক' গেলাস খেয়ে আড়াই হাজার বিঘে করেছি। কুড়ি বিঘে জমি, টোয়েন্টি ইনটু টোয়েন্টি ফাইভ হাণ্ড্রেড—ফিফ্‌টি থাউজ্যাণ্ড। নেট প্রফিট ফরটিফাইভ থাউজ্যাণ্ড। এখনও পনের বিঘে আছে। ঝাড়ব। মওকা পেলেই ঝাড়ব!

জেঠীমা চুপ করে গেছেন। নীরা জেঠীমার আদর্শ জানে। কতবার শুনেছে। তিনি হেনাকে শিক্ষা দিতেন। বিশেষ করে বিয়ের আগে, তার অর্থাৎ হেনার কলঙ্ক নীরার স্বেচ্ছায় মাথায় নেওয়ার পর হেনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তার চুলের গোছা মুঠোয় ধরে বলে যেতেন—বেটাছেলের কাছে হিসেব নিয়ো না। কাজ ওদের—ধর্ম মেয়ের।

ভগবানে ভক্তি আর মেয়েধর্ম—এই দুয়ের ওপর সংসারের ভাল মন্দ; পৃথিবী ওতেই শীতল—বাসুকি ওতেই স্থির। পুরুষে টাকা আনে—জিজ্ঞেস করো না—কোথা থেকে আনলে? রাজলক্ষ্মী রাজ্য নিয়ে হানাহানি করুক কুরুক্ষেত্র হোক; কৌরব যাক পাণ্ডব রাজা হোক, সংসারে গেরস্ত লক্ষ্মী মেয়ের হাতে মেয়ের ধর্মে স্থির। তাতেই সৃষ্টি থাকে, পৃথিবী বেঁচে থাকে।

শেষে কোটেশন তুলতেন রামায়ণ থেকে, রামায়ণ পড়ে দেখ। ব্রাহ্মণের ছেলে রত্নাকর দস্যুবৃত্তি করত। একদিন নারদ আর ব্রহ্মা এলেন, তাকে বাল্মীকি ঋষি করতে হবে। রত্নাকরকে বললেন—ভাল, তুমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করছ, এর পাপের কথা ভেবেছ? রত্নাকর বললেন—ঠাকুর এ পাপের ফল আমরা গোটা সংসার মিলে ভোগ করব। এক সঙ্গে থাকব যেখানেই থাকি। ভাবনা কি? ব্রহ্মা বললেন—উঁহু, তুমি জিজ্ঞাসা করে এস তোমার সংসারকে। রত্নাকর নারদ আর ব্রহ্মাকে গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যে এই দস্যুবৃত্তি নরহত্যা করে টাকা আনি, সোনা আনি, নানা জিনিস আনি, এর যে পাপ, তার অংশ তোমরা নেবে তো? স্ত্রী-বাপ-মা-বোন-ছেলে সবাই বললে, না। তুমি কোথা থেকে কি করে উপার্জন কর তা আমাদের দেখার কথা নয়। সে দায় তোমার। স্ত্রী বললেন, আমি তোমার সেবা করি, সুখী করি তোমাকে, তোমার সন্তান গর্ভে ধরি—সেই দায় শুধু আমার। বাপ-মা বলেন—বাল্যকালে তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছি, আমাদের দায় চুকে গেছে। ছেলে বললে—তুমি বুড়ো হলে তোমাকে খাওয়াবার দায় আমার। তোমার দায় তোমার, তার জন্যে কোন প্রশ্নও নেই,

তার পাপ পুণ্য কিছুর ভাগই আমরা নেব না। বুঝলে মা, এই হল ধর্মের শিক্ষা। ভুলো না। তোমার বাপ আজকাল মদ খেয়ে বেসামাল হয় কখনও কখনও, কিছু বলিনে। শুধু সংসারের মধ্যে মেয়েদের ভার আমার। আমি তাই নিয়ে আছি। তোর দাদাও মদ খায়। বলি নে কিছু। হয়তো আরও দোষ ঘটেছে। বিয়ে করতে বলি, করতে চায় না। বুঝি।

সেই জেঠীমার জ্যাঠামশায়ের ওই কথার পর চুপ না ক'রে উপায় কি? উঠানের দিকের ওই একমাত্র খোলা জানালাটাও সে সেদিন বন্ধ করে দিয়েছিল।

পরের দিন স্নান করবার সময় বাইরে এসে দেখেছিল—পুজোর উদ্যোগ হয়েছে—সে অনেক।

জ্যাঠামশায় গরদের কাপড় পরেছেন। জেঠীমাও। আজ রবিবার। পুজো নিয়ে যাচ্ছেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি উঠানের মাঝ বরাবর আঙুল দেখিয়ে বলছেন—সোজা পাঁচিল টেনে দেব। বেশ উঁচু করেই দেব। থাকবে ওদিকটা যেমন ওর আছে। আমাদের এদিকটা হবে পিছন—পিছন দিকটা হবে সামনে। ওই দিকটায় ফেন্সিং করে এদিকটা জুড়ে নেব পেছনে।

তাকে দেখেও তিনি থেমে যান নি। বরং বলেছিলেন—কি কাজ আমার ভাইঝির বাড়ির অংশ নিয়ে। ন্যায্য মূল্য দিয়ে কিনলেও লোকে দুর্নাম করবে। ঘোষেরা দাম বেশী চাচ্ছে। তাই দেব।

নীরা বুঝতে পেরেছিল পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা মুনাফা তাঁকে দক্ষিণ পাশের ঘোষেদের বাড়ি কিনতে উৎসাহিত করেছে। কিনবেন বা কিনছেন।

বাথরুমে স্নান করতে করতেই সে শুনতে পেলে মোটর থামবার শব্দ। জ্যাঠামশাই একখানা পুরনো মোটরও কিনেছেন। শুনেছে—বাইরের দরজায় পিতলের নেমপ্লেট বসানো আছে। এইচ সি মুকুরজী। কন্ট্রাকটর এ্যাণ্ড মারচেন্ট। আর একটা কাঠের প্লেটে আছে এইচ সি মুকুরজী ইন্ আর আউট তার নিচে এ কে মুকুরজী ইন আর আউট। নিচে খানিকটা জায়গা খালি আছে সেখানে সুজিতের নাম উঠবে—এস কে মুকুরজী। গাড়িখানা এসে থামল। এবার ওঁরা যাবেন। না। ও কে? কার গলা?

—এ্যাঁ আমি কিন্তু একখানা গয়না নেব। হ্যাঁ।

হেনা। হেনার গলা। হেনা এসেছে। সেও যাবে পুজো দিতে। এখানা তা হলে হেনার বরের গাড়ী।

স্নান সেরে বেরিয়ে নীরা আপনার ঘরে গিয়ে ঢুকল। হেনাই বটে। সঙ্গে তার বর। চোখোচোখি হল বারেকের জন্যে। কিন্তু তার চোখে নীরাকে সে যেন দেখতেই পেলে না। নীরা হাসলে একটু। ঘৃণার হাসি। একবার মনে হল সে বের হবে নাকি এই নাটকীয় মুহূর্তে। বলবে আমি স্বেচ্ছায় বিনাদোষে বন্দিনী হয়েছিলাম, আজ মুক্তি নিলাম। কলঙ্ক আমার নয় কলঙ্ক ওই পচা মেয়েটার!

সেই মুহূর্তেই শাঁখ বেজে উঠল বাড়িতে। শাঁখ? পুজো দিতে যাচ্ছে শাঁখ বাজিয়ে? কই? সাধারণতঃ তো যায় না। তবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা তো কম নয়।

রঞ্জিৎ অভিজিৎ—সমস্বরে বলে উঠল—সন্দেশ। সন্দেশ।

সুজিত বললে—নো সন্দেশ। চাঙোয়ায় ডিনার।

বেলা তিনটে নাগাদ ফিরল ওরা। তারপরই হেনা এসে ঘরে

ঢুকল—নীরা। উদ্ধত ভঙ্গিতে তাকিয়েছিল নীরা তার দিকে। রাগে তো তার সর্বাঙ্গ রি-রি করছিল।

হেনা সে গ্রাহ্যই করল না। প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে গলা বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে কানে কানে বলেছিল—ওরে নীরা আমার—আমার ছেলে হবে রে।

নীরা অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হেনার ছেলে হবে খুশী হয়েছিল কিনা ঠিক বলতে পারবে না। তবে তার বিক্ষুব্ধ মনটা কেমন শান্ত হয়ে পড়েছিল।

* * *

হেনাকে সে ক্ষমা করেছিল—সেদিন—অত্যন্ত স্বভাবিকভাবে। কার্য কারণ এবং যুক্তিযুক্ততার দুনিয়ায় যাকে স্বাভাবিক বলে—সেভাবে স্বাভাবিক নয় বা না-হতে পারে, বা হতেও পারে সে নীরা জানে না—সে তার নিজের মনের স্বভাবের দিক থেকে বলছে—স্বভাবিকভাবে হেনাকে ক্ষমা করেছিল। বা ক্ষমা এসে গিয়েছিল। হেনা বিনো সেন নয়—সে অজ্ঞান পাপী। বিনো সেন জ্ঞান পাপী। তিনি অজগরের মত নিঃশ্বাস দিয়ে টেনে টেনে তাকে কাছে এনে পাক দিয়ে জড়িয়ে ধরে গ্রাস করতে চেয়েছিলেন। বিনো সেন তাকে ব্যঙ্গ করে বলে—নাটক করে গেলে! হ্যাঁ—নীরার জীবন নাটক এবং সে নাটকে তুমি বিনো সেন যে ক'জন ভিলেন এসেছে—তাদের নায়ক!

থাক—ক্রম ভঙ্গ হচ্ছে।

হেনা আনন্দে গলছিল সেদিন। এবং তার জীবনের সেই বিগলিত ধারায় তাকেই সে স্নান করাতে চেয়েছিল। বোধ করি কৃতজ্ঞতা-বশেই করেছিল। আরও একটা কারণ ছিল—হেনার চরিত্রের মধ্যে

যে একটা কদর্য ভীরু স্বৈরিণীপনা ছিল—তার কথা মুখে বলে উল্লসিত হবার মত লোক আর কেউ ছিল না। জেঠীমার কাছে বলতে বোধ করি সাহস করত না।

সেদিন সে আর শ্বশুরবাড়ি ফেরে নি। বর ফিরে গিয়েছিল। বিকেলবেলা অজিতদা আর সে বেরিয়ে গিয়েছিল, সিনেমা দেখে অজিতদা ফিরবে—বর বাড়ি চলে যাবে—দু দিন পর এসে নিয়ে যাবে হেনাকে।

হেনা বরকে বিদায় দিয়ে ফিরে এসে ধপ ক'রে ব'সে বলেছিল—আয়—এঘরে নয়। উপরে আয়। এ ঘরে মানুষ থাকে।

—না তুই যা বরং। আমি একটু পড়ি।

—পড়বি ?

হঠাৎ সে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল—বলেছিল—এ দুঃখ তোর আমার জন্যে।

—হোক আমার দুঃখ কাটিবে একদিন। তোর হলে কাটত না। তুই সইতে পারতিস নে। তুই বরকে নিয়ে সুখী হয়েছিস—ভালবাসে—

—ছাই রে ছাই। মিছে কথা। সব মুখে।

—কি বলছিস যা তা ?

—ঠিক বলছি। তোরা হলে ধরতে পারতিস নে। আমি বাবা হেনা। আমার কাছে চালাকি ?

খুক্ খুক করে হাসতে সুরু করলে সে।

—হাসছিস কেন ?

—কেন ? সে যা কাণ্ড। লোকটা ভারী চালাক। জানিস,

সিগারেট ছাড়া কোন নেশা করে না। কিন্তু ভারী খারাপ চরিত্র। সন্ধ্যাবেলা কোন দিন বাড়িতে ফেরে না। ব্যাপার কি? জিজ্ঞাসা করি তো বলে—ভুরু কুঁচকে বলে—কিসের ব্যাপার কি? বলি-- নরম হতে হয় ভাই—হয়ে বলি—ছুটি তো অনেকক্ষণ হয়েছে। থাক কোথায় এতক্ষণ? বলে---কোথায় থাকব? থাকি চুলোয়-- যেখানে ইচ্ছে! আমি ভাই চুপ করে যাই। অথচ গায়ে যেন কেমন কেমন গন্ধ। ব্যাটাছেলের গায়ে মেয়েদের গায়ের মত গন্ধ। সিগারেটের গন্ধের সঙ্গে মিশিয়ে—আর একরকম। চুপ করে গেলে বলে--- সারাদিন আপিসে থাকি—বেরিয়ে ময়দানে একটু বেড়াই। তারপর উপরি পাওনাগুলো আদায় করতে হয়, এনগেজমেন্ট থাকে। মেয়েছেলে মেয়েছেলের মত থাক। বেশ তাই—তাই। কিন্তু পুরুষকে জানি তো! ওরে মনা ঘোষ সবাই! রকম ফের। ভদ্র-অভদ্র। তারপর বুঝলি একদিন—।

বাস খিলখিল্ করে হাসতে লাগল হেনা।—"সে বুঝলি—।" হি-হি-হি-হি।। —হি-হি-হি-। গায়ের পাঞ্জাবীটা খুলেছে--গেঞ্জি খুলবে—ধবধবে--সাদা সিল্কের গেঞ্জিতে চুলের তেলের দাগ —আর এই একগাছা লম্বা চুল। খপ করে হাত চেপে ধরেছি। এ কি?— বলে—কি?—কি? এই যে লম্বা চুল —আর গেঞ্জিতে দাগ? তখন বুঝলি ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল ভ্যাবা গঙ্গারাম। আমি তখন খুব জোর পেয়েছি। খুব ইস্কুরুপ টাইট করছি। তখন একেবারে মুখোস খুলে দাঁত বের করে বলে—বেশ করেছি; রোজগার করি— করেছি। তোমার বাপের পয়সায় করি নি! আমি চ্যাঁচাতে লাগলুম। তখন বলে চুপ-চুপ। বাপকে খুব ভয় তো। হুঁ-হুঁ শুধু বাপ

নয়—আপিসের বড়বাবু। আর খুব কৃপণ। মাইনের টাকা তো হাতে দেয় না। তার উপর বাইরের রোজগারেরও হিসেব নেবে। বলবে, ওই ঠিকেদারের বিলের দরুণ কত নিয়েছিস, ওই পার্টির কণ্ট্রাক্টের দরুণ? "হলে হবে কি, বাজার যে যুদ্ধের। দু হাতে রোজগার। ঘুষের টাকার হিসেব আছে, না ধরা যায়? এক একদিন চার পাঁচশো টাকার নোট পকেটে থাকে। তবে একশো দেড়শো, এই নিত্যি। ওদিকে, আপিসে মেয়ে কেরানী, সন্ধ্যার পর তো ধর্মতলায় মেয়েদের মাইফেল। করব কি? ওই করি আর কি! এবার বলেছি, যা করবে করগে যাও বাবু, ছোট নজর করো না, আর বাঁধা পড়ো না। তা পড়বে না। সেদিকে হুঁশিয়ার আছে। আর নজরও ছোট নয়, সে গায়ের গন্ধে বুঝতে পারি। গায়ে একটা গন্ধ পাই। সেদিন বললাম, কি ব্যাপার কি বলতো? বলে কি? বল না, কোথায় গিছলে? দিব্যি করে বলছি কিছু বলব না। গন্ধটা কেমন অচেনা লাগছে, মনে হচ্ছে। বললে, কি? শুনি? বললাম, মেট্রোতে গিয়ে মেমসাহেবের পাশে বসলে এই রকম গন্ধ পাই। হেসে সারা। বলে, বাপ-রে। তুমি বাবা শার্লক হোমস! ঠিক ধরেছ। পার্ক স্ট্রীট এরিয়ার গন্ধ! বললাম, কত টাকা লাগল? বললে, ঈশ্বরের দিব্যি আমার নট-এ ফার্দিং। একটা পাঞ্জাবী ঠিকাদার, সে নিয়ে গিয়েছিল।

এখানেও থামে নি—হেনা। মনের খুশীতে বলেই চলেছিল—এখন একটা কম্প্রোমাইজ ক'রে নিয়েছি—যেখানেই যাও—নিচু জায়গায় যাবে না। আর দশটার বেশী রাত করতে পাবে না। তিন দিন আটটায় ফিরে আমাকে নিয়ে নাইট শোতে সিনেমায় যেতে হবে।

আর মাসে একশো টাকা আমাকে লুকিয়ে দিতে হবে আমি আপনার বলে রাখব। এই যে আজ গেল—এখানে ফিরবে না, বাড়ী যাবে বললে। বাড়ী যাবে না। সব মিছে কথা। আজ সমস্ত রাত্রি বাইরে কাটিবে। অজিতদাও তো ওর সঙ্গী এখন।

জেঠীমা এর মধ্যে বার কয়েকই ডেকেছিলেন হেনাকে। প্রতিবারই হেনা বলেছিল—যাচ্ছি। কিন্তু যায় নি।

এবার জেঠীমা এসে ঘরে ঢুকেছিলেন। বলেছিলেন—দেখ আজ শুভ সংবাদের দিন। আমি কিছু তাই বলি নি। ওর দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়লে পাছে কিছু ক্ষতি হয়। কিন্তু আর সহ্য হচ্ছে না আমার। এস—রাত্রি নটা বাজে। ওঠো।

হেনা বলেছিল—নীরা কিন্তু আমার সঙ্গে চলুক। কাছে শোবে।

রূঢ় কণ্ঠে জেঠীমা বলেছিলেন—না।

—কেন?

—কেন, তা তো জান। আমার ঘর অপবিত্র হবে। তুই জানিস, অজিত এখন মদ খায় মনে হয় অন্যদোষও ঘটেছে। কিন্তু বিয়ে দিই নি ওই পাপ ঘরে আছে বলে। আগে ওর গতি করি তারপর নিশ্চিন্দি।

হেনা কেমন হয়ে গিয়েছিল। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলেছিল—ওর কি ক্ষমা নেই মা?

—না।

—ওকে তুমি ক্ষমা কর মা।

—না।

চুপ করে গিয়েছিল হেনা। পরের দিন সে চলে গেল। দুপুরবেলা যাবার সময় বলে গেল নীরাকে—নীরা।

নীরা বলেছিল, তুই যাচ্ছিস ?

—হ্যাঁ। আবার আসব মাস দুই পর।

—কোন মাসে ছেলে হবে তোর ?

এই তিন মাস। দু মাস পর এখানে চলে আসব।

বলে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কিছু বলতে চেয়েও পারে নি। হঠাৎ বলেছিল, আসি তা হলে। বলেই যেন হঠাৎ চলে গিয়েছিল।

নীরার মনে হল আবার দু মাস নিরন্থ সঙ্গীহীন জীবন। হেনার সঙ্গে অনেকদিন পর তার সঙ্গে কিছুটা সময় কাটল। পায়রার মত বকবক করে আপন মনে, আপনার কথাই বলে গেল। শুনতে বেশ লাগল। হেনাকে মনে হল তার স্নেহাস্পদা। সেই হেনাকে সুখী করেছে। বিনো সেন তুমি হেনা নও। হেনা ভণ্ড নয়।

হেনা চলে গেল। গাড়ির শব্দ পেলে নীরা। মোটরের হর্ণ।

হেনার যাবার সময়ে বিদায় নেওয়ার মুখচ্ছবি ভেসে উঠল। বড় যেন মলিন লাগল হেনাকে। কাল সন্ধ্যার হেনা আর আজকের এই দুপুরের হেনায় যেন অনেক তফাৎ ঘটে গেছে। মনে লেগেছে হয়তো। কাল জেঠীমার সঙ্গে কথা বলবার সময়েই সে অকস্মাৎ নিভে-যাওয়া আলোর মত যেন কালো হয়ে গিয়েছিল।

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একটু ম্লান হেসেছিল। বেচারা! তবে শ্বশুরবাড়ি যেতে যেতেই ও আবার জ্বলে উঠবে। সে নীরা জানে। বইটা সে খুললে। নাঃ। থাক পৃথিবীর ইতিহাস। এলিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড পড়বে সে। পরীর রাজ্য যাদুর রাজ্য স্বপ্নের রাজ্য—।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। ফিরে তাকালে নীরা। জেঠীমা ঢুকেছেন। সে মুখ নামিয়ে বইয়ের দিকে ফেরালে। জেঠীমাকে দেখলেই ক'দিন থেকে তার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে—তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

—নীরা।

কণ্ঠস্বরে ভ্রূ কুঞ্চিত করে নীরা আবার ফিরে তাকালে। মনে হচ্ছে এবার সে আর সামলাতে পারবে না। পারছে না, যেন আগুন লেগেছে। জ্বলে উঠল বলে দাউ দাউ করে।

জেঠীমার কণ্ঠস্বরে কি ক্রোধ! নীরার চোখেও তার প্রতিচ্ছটা বাজছে। তবু সে কথা বললে না। শুধু তাকালে।

জেঠীমা একখানা পত্র বাড়িয়ে দিলেন—হেনা দিয়ে গেল। এ সত্যি ?

নীরা পড়লে। হেনা সব অকপটে স্বীকার করে পত্র লিখেছে। মুখে বলতে পারে নি, পত্রে স্বীকার করে লিখেছে, আর ওর কষ্ট দেখতে পারলাম না, লিখলাম। তুমি ওকে এমন করে কষ্ট দিয়ো না।

পত্র পড়েও চুপ করে রইল নীরা। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। হেনা এটা পেরেছে শেষ পর্যন্ত !

—নীরা ! বল !

—কি বলব ?

—এ সত্যি ?

—হেনা নিজে যখন স্বীকার করেছে—তখন আর আমার না বলে লাভ কি বলুন। হেসেছিল একটু।

স্থির বিচিত্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিলেন জেঠীমা।

তারপর কঠিন ঘৃণার সঙ্গে বলেছিলেন, তোর পাপ হেনার চেয়ে বড়। সে মতিভ্রষ্ট হয়ে ভুল করে করেছিল, আর তুই মতিস্থির করে করেছিস। কলঙ্কের কাজ করে ভয় পেয়ে মিথ্যা বলে সে-কলঙ্ক ঢাকতে যাওয়ার চেয়ে পাপ না করে পাপের কলঙ্ক মাথায় নেয়—তারা তো সব পারে। হেনার উপর যত ঘেন্না হল আমার, তার চেয়ে বেশী ঘেন্না হল তোর উপর!

অদ্ভুত নিষ্ঠুর সে-ঘৃণার অভিব্যক্তি তাঁর। অবাক হয়ে তাকিয়েছিল তাঁর দিকে নীরা। তিনি আবার বলেছিলেন, তার মানে পাপে কলঙ্কে তোর ঘেন্না নেই, লজ্জা নেই। তা হলে তো তুই সব পারিস!

বলে তিনি চলে গিয়েছিলেন। দীর্ঘদিন পর অকস্মাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিল নীরা। আপনা-আপনি যেন অকস্মাৎ বন্ধন-মুক্ত জীবের মত উঠে দাঁড়িয়েছিল। বন্ধন কেটে গেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দরজাটা দেবেন না।

এসে দরজাটা চেপে ধরেছিল। জেঠীমা দরজাটা বন্ধই করেছিলেন অভ্যাসমত। এই এক বৎসর তাব ঘরের দরজা বন্ধ করেই রাখতেন। রাত্রে তার ঘরে ঝিটা শুতো, বাইরে থেকে তালা দিতেন। তিনি ভয় করতেন নীরাকে মনে মনে, সে নীরা জানত। একদিন, কবে ঠিক মনে নেই, জেঠীমা বলেওছিলেন কাকে যেন, হয় অজিত বা সুজিতকে—ও সব পারে। ভয়ঙ্কর সাহস ওর। পালিয়ে যেতে পারে। ছুটে বেরিয়ে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে। তাই তালা দি।

জেঠাইমা খুব জোর করেন নি। ছেড়েই দিয়েছিলেন। নীরা বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে, জেঠাইমার মুখের দিকে—সেই পুরানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—শুনুন, সব যখন জেনেছেন,

তখন আজ থেকে আমি বাইরে বেরুলাম। কাল থেকে আমি আবার ইস্কুলে যাব।

জেঠাইমা বললেন, না। তা তোমাকে যেতে দিতে পারব না।

--কেন?

—একথা প্রকাশ হবে, হেনার শ্বশুরবাড়ি যাবে। তা ছাড়া, তোমাকে বিশ্বাস কি?

—না, আমি সে-কথা প্রকাশ কখনও করব না।

--সে বিশ্বাস করলাম। তা আমি বলি নি। তোমার নিজের কথা বলছি—কলঙ্ককে যার লজ্জা নেই, ঘেন্না নেই, তাকে বিশ্বাস আমি করিনে। মনা মরেনি, বেঁচে আছে। শুনছি সে এখন গরিব গেরস্ত বাড়ির মেয়েদের নিয়ে যুদ্ধের বাজারে দালালী করছে। এ বাড়ির বাইরে তোমাকে যেতে দিতে পারব না আমি। আর ইস্কুলেই বা বলবে কি, হেনার কথা প্রকাশ না করলে।

—বেশ। ইস্কুলে আমি যাব না, কিন্তু এবারই আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব প্রাইভেটে।

—যে লেখাপড়া শিখে মিথ্যে পাপের বোঝা মাথায় করে নিজের আত্মানারায়ণের এত বড় অপমান করলে—তা শিখে হবে কি?

—পেটের ভাত হবে। আপনাদের হাত থেকে মুক্তি পাব।

একটু চুপ করে থেকে জেঠীমা বলেছিলেন, তাই দেবে। তোমার জ্যাঠাকে বলব।

সেদিন আর একটি বিচিত্র ঘটনা ঘটেছিল। সেই বাইরের মানুষের সঙ্গে ঘাতে সংঘাতে নয়—নিজেকে দেখে নিজের মনের মধ্যে সেটা জেগেছিল—সে যুদ্ধ যেন নিজের সঙ্গে।

এক বৎসর, হ্যাঁ, গণনা করা এক বৎসর সাতাশ দিন পর পরিপূর্ণ উন্মুক্ত আলোয় দাঁড়িয়ে সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছিল একখানা বড় আয়নার মধ্যে। হেনা চলে গিয়েছিল দুপুরবেলা খাওয়া দাওয়ার পরই। জেঠীমা ঠিক আধঘণ্টা পরই এসে তার ঘরে ঢুকেছিলেন হেনার চিঠিখানা নিয়ে। মিনিট দশেকের মধ্যেই কথা শেষ হয়েছিল। জেঠীমা তাকে ক্ষমা না করে, ক্ষমা কেন তাঁর আশীর্বাদ করা উচিত ছিল তাকে, তা না ক'রে তিনি তাকে বেশী ঘৃণা করছেন বলে বেরিয়ে আসবার সময় দরজা বন্ধ করতে গিয়েছিলেন, সে দরজা চেপে ধরে বন্ধ করতে দেয় নি। সে নিজেই যেমন একদিন স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল একটি কথাও বলে নি তেমনিভাবেই সে নিজেই মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। বাড়িটা তখন প্রায় স্তব্ধ। প্রায় দুটো বাজে। জ্যাঠামশায় অজিতদা আপিসে। সুমিত আর তাদের অন্য ছোট ভাই দুজনও ইস্কুলে। বাড়িতে একা জেঠীমা। ঠাকুরটা রান্না-বান্না সেরে বাইরে একবার বেড়াতে গেছে। কলকাতার ঠাকুরেরা দুপুরে ঘুমোয় না। জুতো জামা প'রে বেড়াতে বের হয়। চাকরটা ঘুমুচ্ছে। ঝিটা এখনও রান্নাশালে সব ধোয়া মোছার কাজ করছে।

পাড়াতেও বিশেষ সাড়াশব্দ নেই। এই সময়টা স্তব্ধই থাকে। সদ্য অপরাহ্ণমুখী পশ্চিমে অল্প ঢলে পড়া সূর্যের রোদ তখনও তাদের উঠোনটায় পরিপূর্ণ ভাবেই পড়েছিল। সেই সূর্যের আলোয় দাঁড়িয়ে মুক্তির আস্বাদই অনুভব করছিল তার উত্তাপের মধ্যে আর দেখছিল জ্যাঠামশায়ের বাড়ির ঐশ্বর্য সম্পদের নূতন সমাবেশের দিকে তাকিয়ে। বাড়িটার ভাঙাগড়া অনেক হয়েছে। দেখেছেও, কিন্তু খুব ভাল করে দেখে নি। একটা কঠিন আত্মনির্যাতনের প্রবৃত্তি তাকে যেন পেয়ে

বসেছিল। সেটা তার জীবনের বিদ্রোহের আর একটা চেহারা। তখন এটা যেন তার নিজেকে খুব তৃপ্তি দিত। একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করত। হয় তো অভিমান ছিল। যাই সত্য হোক, সে এসব দেখেও দেখে নি। দেখতে চায় নি। আজ মুক্তি নিয়ে বেরিয়ে সে উঠানে দাঁড়িয়ে দেখছিল সেইসব।

মুখে একটু হাসিও ফুটে উঠেছিল। নাঃ, জ্যাঠামশায়ের তারিফ করতে হয়। জেঠাইমা ওই জীবন দর্শনের অনেক মূল্য পেয়েছেন। সুতরাং ভুল বললে কি করে চলবে? বাঃ। জ্যাঠামশায় আজকাল মধ্যে মধ্যে স্যুট পরেন, আপিসের বড়বাবুদের মত ঢলঢলে পেণ্টুলান আর গলাবন্ধ কোট নয়। দস্তুর মত স্যুট। তবে অর্ডারী নয়, রেডিমেড। বাড়িটার চেহারাও ঠিক সেই রকম দাঁড়িয়েছে। রেডিমেড স্যুট পরা হারাণচন্দ্র মুখুজ্জের এইচ সি মুকুরজী-স্বরূপের মত। নতুন ফার্নিচার হয়েছে। অবশ্য সেখানে ওই অসামঞ্জস্য নেই, সব নতুন এবং অত্যন্ত মডার্ন।

বাইরে অর্থাৎ উঠানের সামনে বারান্দাটা চমৎকার হয়েছে। সেই বারান্দায় অভিজাত রুচি অনুযায়ী হ্যাট-র‍্যাক সমেত একটি সুন্দর খাড়া করা আলনা; তার নীচে জুতো রাখবার বাক্স, আর প্রায় গোটা মানুষের মাপের একটা স্ট্যাণ্ডিং মিরার। সেই আয়নার মধ্যে ফুটে উঠেছে—রৌদ্রলোকে আলোকিত নীরার প্রতিবিম্ব।

শিউরে উঠল সে। ভয়ে চোখ বুজল।

আয়নাটার মধ্যে —ও—ও—কে? সে? নীরা?—সে?—না—না। কিন্তু সত্য-সত্য।

পাথর চাপা বিবর্ণ ঘাসের মত বিবর্ণ যক্ষ্মারোগীর মত, ফ্যাকাশে—

তেমনি শীর্ণ কঙ্কালসার একটি মেয়ে, মুখের হনুর হাড় দুটো উঁচু হয়ে উঠেছে, তার উপর পিছনে ফোলা ফাঁপা একরাশ বিশৃঙ্খল চুল তাকে আরও কদর্য করে তুলেছে, না—কদর্য নয়, বীভৎস। শুধু রয়েছে সেই চোখ দুটো বড় বড় ঝকঝকে চোখ। সেই দুটি চোখ দেখে সে চিনতে পারলে—এ সে নিজে!

আয়নায় প্রতিবিম্বটাও তার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

জীবনে ত্যাগ-স্বীকারের এই পরিণতি! পুণ্যফল?

না। জেঠীমার কথাই সত্য। নিজের আত্মার যে অপমান সে করেছে, এ তারই ফল।—এ তার প্রাপ্য।

অকস্মাৎ সে উঠে চলে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাদের উপর। সূর্যের পরিপূর্ণ আলো—মুক্ত বাতাস—স্বাধীন মন তার চাই। তাকে বাঁচতে হবে। সূর্যালোকিত পৃথিবীর দিকে তাকালে। ওঃ, এই এক বছরে জায়গাটা কত বদলে গেছে। মাথার উপর প্লেন উড়ছে। ১৯৪৪ সাল। কোলাহল কলরব বেড়েছে। কলকাতা লোকে লোকে পিঁপড়ের রাজ্য হয়ে উঠেছে।

সারাটা দিন সে ছাদের উপর ঘুরল। সন্ধ্যেবেলা সে নতুন করে জীবন সুরু করলো। সর্বাগ্রে জেঠীমার কাছে গিয়ে স্থির কণ্ঠে বললে—জেঠীমা আমার নিজের ঘরের চাবীটা চাই। ওই ঘরে আমি আর থাকব না।

জেঠীমা তার মুখের দিকে শুধু একবার তাকালেন, কিছু বললেন না। তাতে যত অবজ্ঞা—তত ঘৃণা। তিনি সেই এসে ঘরে ঢুকে বসেছেন আর বের হন নি। ভাবছেন বসে বসে।

সেদিন তার মনে হল, এই মেয়েটির মত নিষ্ঠুর সে আর জীবনে

কাউকে দেখে নি ! এই নিষ্ঠুর ঘৃণা আর তাঁর কোনদিন যায় নি। শুধু কি তার উপর ! এরপর থেকে হেনাকেও তিনি ঘৃণা করতেন। যেন তাঁর জীবন সংস্কারের এক ফলহীন পুষ্পহীন শুধু শাখা পল্লব-পত্র-সার পুণ্য-বিষে বিষাক্ত একটা গাছ যার তলায় রৌদ্র আসে না, ঘন হিম অন্ধকার, আর অহরহ পত্রপল্লব থেকে বিকীর্ণ হচ্ছে বিচিত্র পুণ্যের বিষবাষ্প। শুধু যেন কয়েকটা দিনের জন্য, যে কারণে মানুষের ব্যাধি হয়, তেমনি একটা কারণে স্নেহের পোকা লেগে একটা ডাল শুকিয়ে ভেঙে গিয়েছিল, তারই মধ্য দিয়ে এসে পড়েছিল খানিকটা সূর্যালোকের দীপ্তি এবং উত্তাপ। আবার সেখানে ডাল গজিয়ে ফাঁকটা সম্পূর্ণরূপে ঢেকে গেছে।

জেঠীমা নীরবে চাবীটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। নীরা অসঙ্কোচে চাবীটা কুড়িয়ে নিয়ে তার মায়ের ঘর খুলে ভিতরে ঢুকে দাঁড়াল। ঘরখানাকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছিল। রঙের টিন—সিমেন্টের বস্তা। লোহা। পুরনো আসবাব। ভ্যাপসা গন্ধ উঠছে। আরসোলা উড়ছে। কিছু খরখর করছে। বোধ হয় ইঁদুর।

সে আন্দাজে গিয়ে পিছনের দিকের পাশাপাশি জানালা দুটো খুলে দিতেই আলোর ঝলক এসে পড়ল।

তারপর সে নিজেই রঙের টিন কয়েকটি বের করে উঠানে নামিয়ে দিলে। চাকরটা সেই মুহূর্তেই ঘুম ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল--সে তাকে বললে—এগুলো বার ক'রে নাও এ ঘর থেকে। বলেই গলা তুলে বললে— জেঠীমা—এগুলো বের করে নিয়ে আমার ঘর পরিষ্কার করে দিতে বলুন।

এইখানেই দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের শেষ।

পাঁচ

এইবার দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য !

এ দৃশ্যে ভাগ্য অদৃষ্ট যদি মানো, তবে ভাগ্য অদৃষ্ট, যদি বিচিত্র কার্যকারণ বল, তবে তাই। তারই বিচিত্র সমাবেশ—এবং তারই মধ্যে পড়ে নীরা করলে নিষ্ঠুর সংগ্রাম। যত আঘাত এল—তত আঘাত করলে সে। মার সে পড়ে পড়ে খায় নি আর। আঘাত করলে সে। হার-জিত ঠিক হয় নি। তবে সে হারে নি, আঘাতে আহত হয়ে শুয়েও পড়ে নি। সিন্দুর-চিহ্নহীন মাথার সিঁথিটাকে সে মনে করে অপরাজয়ের চিহ্ন।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ '৪৫ সালের ডিসেম্বরে আরম্ভ—৪৯ সালের শেষ পর্যন্ত প্রসারিত। চার বৎসরেরও বেশী। তবে মার সে একা খায় নি। জেঠাইমাও খেয়েছেন। থাক; নাটকের নিয়ম পরের পর সাজানো। শুধু নাটকেরই বা কেন, ভগ্নক্রম, এলোমেলো যা কিছু, তাই বিশৃঙ্খল—অনিয়ম।

যবনিকা তোল। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস; নীরা পড়ছে মুখ গুঁজে, সামনে তার পরীক্ষা। অপরাহ্ণবেলা।

দৃশ্যপট—তার মায়ের সেই ঘরখানি। সেই দিনই সন্ধ্যে পর্যন্ত সব বের করিয়ে দিয়ে সেই রাত্রি থেকে বাস করছে।

ঘরখানাকে যথাসাধ্য পরিচ্ছন্ন এবং নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়ে সেই দিন থেকেই আরম্ভ করেছে ছেদপড়া জীবনের নূতন অধ্যায়,

নূতন জীবন। সন্ধ্যায় জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে এসে বলেছিল, আমার কয়েকখানা বই লাগবে।

ভুরু কুঁচকে হারানবাবু প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই বুঝতেই পারেন নি। সকালবেলা যাবার সময়ও দেখে গেছেন স্বেচ্ছায় বন্দিনী মৌন মুক নীরার এক রূপ—যার তুলনা পায়ের তলার মাটি। সেই মাটি কোন প্রচণ্ড শক্তিতে উদ্ধত শিখর শীর্ষ তুলে একটি পাহাড়ের মত দাঁড়াল?

সংশয়পূর্ণকণ্ঠে তিনি প্রশ্নও করলেন—নীরা? নীরা বলেছিল—হ্যাঁ আমি। আমি আর এভাবে থাকব না ঠিক করেছি। আবার আমি পড়াশুনো করব। বই চাই আমার।

—বই? কি বই? কিসের জন্যে?

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেব আমি।

—ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে? যেন এর চেয়ে আশ্চর্য বা অসঙ্গত কিছু হতে পারে না। হয়তো এইবার কিছু বলতেন কঠিন কথা। কিন্তু তার আগেই জেঠীমা ঘরে ঢুকলেন।

জেঠীমা ঘরে ঢুকে হেনার চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, পড়। হেনা লিখেছে। আজকের ডাকে এসেছে। তুমি এ ঘর থেকে এখন যাও নীরা।

নীরা চলে গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পর জ্যাঠামশায় ডেকে বলেছিলেন, ক'খানা বই লাগবে? কত দাম? মুহূর্তের জন্য চুপ করে গেলেন, বোধ করি সঙ্কোচ কাটিয়ে নিলেন এরই মধ্যে, তারপর গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—তবে,—একটা কথা আমি বলে রাখি। তোমার জানা ভাল। তোমার মা

যা রেখে গিয়েছিলেন তার আর খুব বেশী অবশিষ্ট নেই। তুমি বরং সুজিতের বই নিতে পার। অজিতেরও বই আছে—নিতে পার।

নীরা বলেছিল—না আমার নিজের চাই। নইলে দরকার মত পাব না।

মনের মধ্যে আরও কঠিন কথা এসেছিল, টাকাটার হিসেবের কথা। কিন্তু সে তা বলতে পারে নি। একবার কুণ্ডুমশাইয়ের কথাও মনে হয়েছিল। কিন্তু তাও ভাল লাগে নি। বোধহয় এতদিন নীরব সহিষ্ণুতার অভ্যাসে খানিকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল সে। নীরবে দাঁড়িয়ে নখ খুঁটেছিল নীরা। শুধু দাঁতের উপর দাঁতের পাটী দুটো শক্ত হয়ে বসেছিল।

জ্যাঠামশায় বলেছিলেন, যে কটা টাকা আছে, আর তোমার অংশের বাড়ির একটা দাম ধরলে বিয়েটা অবশ্য গৃহস্থঘরে কোন রকমে হতে পারে।

জেঠীমা বলেছিলেন, পরীক্ষাটা দিতে চায়, তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

এবার নীরা বলেছিল, বিয়ে আমি করতে চাইনে। আমাকে বিয়েই বা করবে কে? পরীক্ষাটা দিয়ে পাশ আমি করবই, কোন চাকরী আমি খুঁজে নিয়ে চলে যাব। আমাকে বরং টাকাটাই দিয়ে দেবেন। বলে সে চলে গিয়েছিল। পুরনো বই নিয়েই পড়তে বসেছিল। জাঠতুতো ভাইরা এসে বিস্মিত হয়েছিল। ছোট দুটো। অজিতদা গ্রাহ্যই করে নি। সুজিত এসে শুধু বলেছিল—তুই বেরিয়েছিস, আমি খুশী নীরি!

—কেন?

—কারণ আমি সব জানি। মনাকে একদিন মার দিয়েছিলাম আমি। বুকে চেপে বসেছিলাম। সে সব বলেছে আমায়। কি করব হেনার জন্যে আমাকেও চেপে যেতে হয়েছে। কারণ মাদারকে তো জানিস!

—তিনিও জেনেছেন।

—জেনেছেন? তুই—

—না। হেনা নিজে চিঠি লিখেছে।

—আচ্ছা। পড়। আমার বইগুলো দেব তা হ'লে। তবে একটা কথা বলছি নীরি—মাদার মার খাবেন এবার।

—মানে?

—দেখবি! এখন বলছি না। বলে সে চলে গিয়েছিল। সুজিত পড়া ছেড়েছে তাহলে।

এদৃশ্যে হঠাৎ নাটক এল, ওই জেঠীমার উপর আঘাতের মধ্যে দিয়ে। সেদিন তখন অপরাহ্ণবেলা—সে পড়ছে; ঝি চাকরে কাজ শুরু করেছে; জেঠীমা এক ঘটকীর সঙ্গে বড়ছেলের বিয়ের কথা বলছেন। এবার বড়ছেলের বিয়ের জন্য তিনি ব্যস্ত হয়েছেন; ব্যস্ত কথাটা পর্যাপ্ত নয়, উঠে পড়ে লেগেছেন। বাজারের ফাউয়ের মত তার বিয়ের কথাটাও আছে।

সে অবশ্য একদিন বলে দিয়েছে, আমার বিয়ের কথা কইবেন না, জেঠীমা।

জেঠীমা বলেছেন, আচ্ছা। কিন্তু তবুও বলছেন। সে নিয়ে বাদ-প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করবার তার এই মুহূর্তে সময় নেই বলেই সে আর কিছু করে নি!

হঠাৎ সুজিত বাইরে থেকে বিচিত্র উল্লাসে ডাকতে ডাকতে ঘরে ঢুকল—মা। মা! কই? মা!

উল্লাসের বৈচিত্র্যের মধ্যে কৌতুক যেন উছলে পড়ছিল।

জেঠীমা বিরক্তি ভরেই বললেন, কি? এইতো রয়েছি। বাইরে থেকে এমন করে চেঁচাচ্ছ কেন?

সে উঠোনে ঢুকেই বললে, তোমার বড়ছেলের বিয়ে হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা উপরে তুলে উল্টে দিল।

—বিয়ে হয়ে গেল? মানে? তোর বাবা বুঝি সেই পাটের দালাল হঠাৎ-বড়লোককে কথা দিয়ে দিলে? আচ্ছা আমিও দেখব সে বিয়ে কি করে হয়।

সুজিত হেসেই খুন।

—হাসছিস কেন?

—হাসছি কেন? বললাম, বিয়ে হয়ে গেল, না তুমি বলছ—তোর বাবা বুঝি পাকা করলে বিয়ে? না—না। সব পর্ব খতম। বিয়ে শেষ।

—তুই কি নেশা করেছিস? বিয়ে হল কখন?

—আজ। দিনের বেলা। রেজেষ্ট্রি করে বিয়ে। আমি তার একজন সাক্ষী। পাটের দালালের মেয়ে নয়। সিনেমা স্টার—এণাক্ষী বোস! ওরফে এনা বোস। ওরা আজ হোটেলে উঠেছে। সেইখানেই রাত্রে খাওয়াদাওয়া এবং বাসর!

নীরার পড়া সহজে বন্ধ হত না, সংসারের নানান আকস্মিকতার

মধ্যেও পড়ে যেত। ঝনঝন করে কিছু পড়লে না, দুমদাম শব্দে বড়ভাই অজিত চাকর বা ঠাকুরকে মারলে না, ড্রইং রুমে বসে হঠাৎ সমবেত অট্টহাস্য হাসলে না, জ্যাঠামশায় পার্টি থেকে ফিরে চিৎকার করলেও না। আজ কিন্তু তার পড়া বন্ধ হয়ে গেল। মনে হল, হয়তো এমন একটা কিছু ঘটবে—যা সে কল্পনা করতে পারে না, কল্পনাতীত, মর্মান্তিক। কিছু কৌতুকে কিছু আশঙ্কায়, তার পড়া বন্ধ হয়েছিল।

জেঠীমা, জেঠীমা এবার কি করবেন? ভীষণ একটা কিছু। ভয়ঙ্কর একটা কিছু। হয় তো অজ্ঞান হয়ে যাবেন! সে পড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আশ্চর্য, জেঠীমা তার কিছুই করেন নি। চিৎকার করেন নি, মাথা ঠোকেন নি, অজ্ঞান হন নি, কিছুই করেন নি, শুধু নিঃশব্দে উঠে ঘরের মধ্যে চলে গিয়েছিলেন।

রাত্রি আটটা পর্যন্ত বাড়িটা স্তব্ধ নিঃঝুম। যেন একটা পক্ষাঘাত হয়ে গেছে বাড়িটার। ছোট ছেলে দুটি পর্যন্ত বাড়ি ফেরে নি। সুজিত তাদের ইস্কুল থেকেই নিয়ে গেছে নতুন বউ-দি দেখাতে। শুধু ঝি চাকর ঠাকুর ফিসফাস করছে। এমন সময় মদ খেয়ে প্রমত্ত হয়ে ফিরলেন জ্যাঠামশাই। তিনি খবর পেয়েছেন। আপিসে টেলিফোন করে জানিয়ে দিয়েছে অজিত নিজে। অবশ্য বিয়ের পর। এইচ সি মুকুরজী মনের দুঃখে প্রচুর মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ি ঢুকলেন চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে।

—ত্যাজ্যপুত্র করব আমি। বাড়ি ঢুকতে দেব না। সে বহুবিধ শপথ এবং আস্ফালন।

জেঠীমা স্তব্ধ নীরব!

হঠাৎ মোটর এসে দাঁড়াল বাইরে। নীরা ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। অজিতদা বউ নিয়ে এল!

জ্যাঠামশাই স্খলিত বসন হয়ে বেরিয়ে এলেন।—গেট আউট। গেট—আউট আই সে। বেরিয়ে যাও!

কিন্তু অজিত নয়, সুজিত ফিরে এল ভাইদের নিয়ে দাদার বিয়ের বৌ-ভাতের ডিনার খেয়ে।

জ্যাঠামশায় তখনও বলছেন—ত্যজ্যপুত্র করব। ত্যজ্যপুত্র। মুখদর্শন করব না। বলতে বলতেই আবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুজিত খুকখুক করে হেসে উঠল। অপরিসীম কৌতুক বোধ করছে সে বাপের ক্রোধে।

ভাল লাগে নি নীরার এটা। অন্যের জন্য না হোক জেঠীমার জন্যে একটা বেদনা সে অনুভব করছিল। আশ্চর্য সহ্য শক্তি, আর তেমনি কি প্রহার!

সে সুজিতকে বলেছিল, তুমি হাসছ কেন সুজিত?

সুজিত ডিনার খেয়ে এসেছে, চোখ তার ঈষৎ রাঙা এবং ঘোরালো, কথায়-বার্তায় তার অপরিসীম কৌতুকবোধ; সে বলেছিল—ত্যজ্যপুত্র করবে বাবা—তাই হাসছি। অজিত মুখার্জী এক্সপার্ট ছেলে—সে আটঘাট বেঁধে কাজ করে। আজই বাবার সই করা ব্ল্যাঙ্ক চেকে—সেল্ফ নাম দিয়ে তিরিশ হাজার টাকা ক্যাশ বের করে পকেটে পুরে রেজিষ্টারের কাছে গেছে। টাকাটা সে এনা বোসকেও দেয় নি। তারপর তার নামে যা শেয়ার কেনা আছে, সেসব তার পোর্ট ফোলিওতে। টুডে—দি ওল্ডম্যান—রাগের মাথায় জাম্পিং এ্যাণ্ড

বাম্পিং, কাল আপিসে গিয়ে শিভারিং এ্যাণ্ড ষ্ট্যাগারিং। হাসছি সেই জন্যেই।

জেঠীমা নীরবে মুখ গুঁজে সেই পড়েই ছিলেন। খান নি কিছু একবিন্দু জলও মুখে দেন নি। জ্যাঠামশায়ের ক্রুদ্ধ শপথ এবং চিৎকার সত্ত্বেও না। শেষ পর্যন্ত তিনি—যা খুশী তাই করগে, আই ডোণ্ট কেয়ার, স্ত্রী পুত্র কারুর জন্যেই আমার কোন মাথা-ব্যথা নেই—বলে—বেশখানিকটা মদ্যপান করে গাল দিয়েছিলেন জেঠীমাকে।

অনেকটা রাত্রে সে থাকতে পারে নি, গিয়ে ডেকেছিল, জেঠীমা—ঠাকুরটা খাবার নিয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

তিনি পাশ ফিরে শুয়েছিলেন। সে আশ্চর্য রকমের একটা আঘাত অনুভব করেছিল। চলেই আসছিল। হঠাৎ জেঠীমা ডেকেছিলেন, শোন।

ঘুরে দাঁড়িয়েছিল সে।

—তুমি আমার ঘরে ঢুকলে কেন? এঘরে আমার ঠাকুর আছে।

দপ করে জ্বলে উঠেছিল নীরা। নিষ্ঠুর উত্তর দিতে গিয়ে কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল। জেঠীমা বলেছিলেন, তুমি, তোমার জন্যেই আমি ছেলের বিয়ে দিই নি। না-হলে এই কাণ্ড আজ ঘটত না।

নীরা আর থাকতে পারে নি, বলেছিল—তবু ঘটত জেঠীমা। এ আপনার ঘটতই। আমি থাকলেও ঘটত না-থাকলেও ঘটত। আমার জন্যে জ্যাঠামশায় এমন করে মদ খাচ্ছেন না। খাচ্ছেন ব্ল্যাক মার্কেটের টাকার জন্যে। অজিতের এ কাণ্ড আমার জন্যে ঘটে নি ঘটেছে ওই টাকার জন্যে। কিম্বা হয় তো টাকার জন্যে নয়। আপনি ভাগ্য-ভাগ্য করেন—আপনার ভাগ্যের জন্যে। নইলে হেনা। সে

এমন হয়েছিল কেন বলুন? সেই দিনই এর চেয়েও জঘন্য কিছু ঘটত। আমি বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। যাকগে, আমার জন্যে ভাববেন না। আমি চলে যাব এবার আপনার বাড়ি থেকে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক ফল বের হোক, আমার কি আছে বুঝিয়ে দেবেন—আমি চলে যাব। না হয় কালই দিন না উঠোনে পাঁচিল গেঁথে—আর টাকাগুলো ফেলে। আমার সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে।

*　　　　*　　　　*

মাস কয়েক অজাযুদ্ধ বা ঋষিশ্রাদ্ধ যাই বল—বহু তর্জন-গর্জন-রোদন অনুতাপের পর ব্যাপারটা মিটল। তার পরীক্ষাও শেষ হল সেদিন। বাড়িতে বউ এল সেদিন। এনা বোস—এখন এনা মুখার্জী এল। অজিতকে না ফিরিয়ে—এইচ পি সি মুখার্জী অর্থাৎ জ্যাঠামশায়ের গত্যন্তর ছিল না। ব্যবসা অচল হয়ে গিয়েছিল। অনেক জমি তার নামে; মোটা টাকার শেয়ারের অধিকারী সে। সুতরাং একটা মিটমাট হতেই হল। টাকা-শেয়ার-জমি অংশমত নিয়ে বাকীটা অজিত বাপকে ফিরিয়ে দিলে; বাপ বাড়ির অংশ তাকে লিখে দিলেন। তেতলায় ইতিমধ্যেই দুখানা ঘর উঠল। সেখানে হল তাদের সুখনীড়। এনা মুখার্জী শপথ করে বলল, সে আর সিনেমায় নামবে না। ব্যস মিটে গেল।

কিন্তু জেঠীমা স্বতন্ত্র হবেন! তাঁর সংগ্রাম আপোষহীন। তাঁর সব আলাদা হবে—রান্নাবান্না সব। এরই মধ্যে তার পরীক্ষাটা হয়ে গেল। ব্যবস্থা বন্দোবস্তের সব খবর রাখবার সময় তার ছিল না কিন্তু খবরগুলো কানে ঢুকিয়ে দিত রণজিত। সেও পরীক্ষা দিচ্ছে। ভাগ্যক্রমে কাছাকাছি জায়গায় সিট পড়েছিল। এক সঙ্গে যাবার

সময় সে গল্প করত। পরীক্ষা সম্পর্কে খুব উদ্বেগ তার ছিল না। তবে এই পরীক্ষা দিতে গিয়ে রণজিতের সঙ্গে যেন একটা প্রীতির সূত্র গড়ে উঠছিল। পরীক্ষা শেষে সে তার জন্যে অপেক্ষা করত। সঙ্গে নিয়ে আসত। সেদিন তার পরীক্ষার শেষ দিন। রণজিতের পরীক্ষা আগের দিন শেষ হয়েছে। তবু রণজিত তার সঙ্গে গিয়েছিল। আসবার সময় ছিল না। কারণ সেই দিন বউ আসবে। অজিতদা এবং এনাক্ষী বউ। ফিরেছিল সে পাড়ার কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে।

বেলা তখন সাড়ে পাঁচটা। মন তার ভাল ছিল না। তার চেষ্টা উদ্যম সব বোধ হয় ব্যর্থ হয়েছে। পরীক্ষা তার ভাল হয় নি। অঙ্ক ভুল হয়ে গেছে। একটা সে কষতে পারে নি—তিনটের উত্তর ভুল হয়েছে সেই যে তার মাথার মধ্যে ব্যর্থতার ক্ষোভ জন্মাল তার ফলে সারারাতটা সে ঘুমোয় নি। পরের দিন সংস্কৃতের পেপারে সে যা করেছে তা একটা ছোট ছেলেতেও করে না। একটা কোশ্চেনেরই ডবল উত্তর লিখেছে। 'অর' লেখাটা তার এই বিভ্রান্তিতেই চোখ এড়িয়ে গেছে। তারপর তার স্নায়ু ধৈর্য এমনই ভেঙে গেল যে, শেষের দিকে কত ভুল হয়েছে সে তা জানে না। মনে পড়ছে মধ্যে মধ্যে বানান নিয়ে ধাঁধা লেগেছে। ইতিহাসের পেপারে খ্রীষ্টাব্দ ভুল হয়েছে। রচনায় বোধ হয় শব্দ পড়ে গেছে; অ্যাডিশনাল পেপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেও কিছু হয় নি; হাত কেঁপেছে; সে ঘেমেছে, কাঁদতে তার এই দিনটিতে ইচ্ছে হয়েছিল, বুক থেকে ঠেলে উঠেছিল কান্না; লজ্জাটায় কাঁদতে পারে নি। কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করে ফিরেছে; মনে পড়ল ক্লাস নাইনে উঠে অধিকাংশ মেয়ে যখন অঙ্ক ছেড়ে দিয়ে ডোমেষ্টিক সায়েন্স নিয়েছিল—তখন অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো

পাওয়া আদৌ অসম্ভব নয় বলে সে অঙ্কই নিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে বসে সব পড়াই বোঝা সম্ভবপর হয়েছে অঙ্ক বোঝা সম্ভবপর হয় নি। তবুও এতগুলো ভুল হবে এ আশঙ্কা সে করে নি। রণজিৎ এবং ক'টি পাড়ার মেয়ে তারা খুব খুশী, পরীক্ষা দিয়ে থার্ড ডিভিসন কেউ কাড়তে পারবে না। সুখী ওরা। কিন্তু তার যে শুধু ফাষ্ট ডিভিসনেও ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

বাড়িতে যখন এল, তখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত, হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছে। ইচ্ছে ছিল বাড়ি এসেই শুয়ে পড়বে। কিন্তু বাড়িতে তার অবকাশ ছিল না।

বাড়িতে তখন সমারোহের কোলাহল উঠছে। সিনেমা স্টার বউদিকে নিয়ে। দেবরেরা কলকল্লোল তুলেছে। চারিদিকে, আছাড় খেয়ে পড়ছে তার ঢেউ। বিয়াল্লিশ সালের সাইক্লোনের মধ্যেও সে বিঘ্ন বোধ করে নি। কিন্তু এর মধ্যে বিশ্রাম, ঘুম, অসম্ভব। তেতলায় নতুন ফার্নিচার উঠছে। স্যুটকেস ট্রাঙ্ক উঠছে। বাড়ির দোরে দুখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একখানা অজিতদার। স্ট্যাণ্ডার্ড টুয়েল্ভ। পুরনো হলেও নতুনের মত ঝকঝকে, তার পেছনে হেনার স্বামীর গাড়ি। আসন্নপ্রসবা হেনাও এসেছে। তার আসবার কথাটা সে শুনে গিয়েছিল। হেনা সেই গিয়ে আর আসে নি। জেঠীমা তাকে আনেন নি। আজ এনেছে অজিত। বউয়ের আজ আসবার কথা, সে পরীক্ষা দিতে যাবার সময় শুনে গিয়েছিল, কিন্তু এমন সমারোহ উচ্ছ্বাস সে কল্পনা করতে পারে নি, জেঠীমা বিদ্যমানে। জেঠীমার ঘরখানি বন্ধ। স্তব্ধ হয়ে তিনি ঘরে বসে আছেন। চাকর ঝি ঠাকুর সব ব্যস্ত। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তার ঘরের সামনের বারান্দায়।

ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু দেবে কে? এক কাপ চা পাওয়ারও কোন আশা নেই।

নিচের তলাটা খাঁ খাঁ করছে। কলরব উঠছে দোতলার উপরে—তেতলায়।

এরই মধ্যে ওর নামটা ধ্বনিত হয়ে উঠল প্রায় কোরাসে। উর্ধ্বলোক ওই ছাদ থেকেই—নীরা! নীরা! নীরাদি! নীরু! নিরুনি। চিরুনি।

প্রথম ডাকটা অজিতদার। শেষেরটা হেনার।

তাকালো সে ছাদের দিকে। আলসের উপর ভর দিয়ে সারি সারি মুখ। তার মধ্যে একখানি আশ্চর্য ঝকমকে মুখ সোনা-রূপার গহনার মধ্যে একখানি মীনা করা আভরণের মত নানা বর্ণে ঝলমল করছে।

—উপরে আয়। নীরা। চা তৈরি। বউদির সঙ্গে আলাপ করে যা।

এণাক্ষী মৃত্থ মৃত্থ হাসছে। বিজয়িনী গরবিনীর প্রসাদ-ঝরা হাসি। প্রকাশ্যে, সে আকারে আয়তনে মৃত্থ অর্থাৎ ঈষৎ কিন্তু ওজনে সে সোনার চেয়েও গুরুভার তার আলোর প্রতিচ্ছটায় ঝিকিমিকির মধ্যে চোখ-ধাঁধানো কৌতুক; সর্বোপরি তুমি ধন্য হয়েছ, এইটে নাটকের স্বগতোক্তির মত অভিব্যক্ত।

তবু সে গেল।

তেতলার সিঁড়ির মুখে জেঠীমার ঘর। এ ঘরটা তিনি পাল্টাবেন। নইলে বউকে দেখতে হবে ওঠানামার সময়। সেটা পার হয়ে সে উঠে গেল। অজিতদা বললে, ইনিই শ্রীমতী নীরা, যার সম্পর্কে অনেক গল্প করেছি। আর এই তোর বউদি, ফেমাস এণাক্ষী।

অকস্মাৎ এণাক্ষী সকলকে সচকিত করে দিয়ে বলে উঠল, আরে, একেই তুমি বলতে কালো কুশ্রী! কি চমৎকার ফিগার! আর রূপ তো এই সবে ফুটছে, উঁকি মারছে।

কথাটা অন্যে বললে হেসে উঠত। কিন্তু এ এণাক্ষী বোস। এ ওর মুখ চাইলে। শুধু হেসে উঠল হেনার পরের ভাইটি। বললে কি ইণ্টেলিজেণ্ট স্ট্যাটায়ার বউদি। ইউ আর ওয়াণ্ডারফুল। হেনার এ ভাই সাহিত্যিক হচ্ছে।

কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল নীরার। সে নীরা। সে বলে উঠল, ঠাট্টা করছেন? তা অবশ্য—

বাধা দিয়ে এণাক্ষী বললে, না। তোমার দাদার দিব্যি করে বলতে পারি, না। দেখ, তোমার দাদার চেয়ে আমি বয়সে কিছু বড়। ফিল্মে কাজ করেছি, রূপ আমি চিনি, গায়ের রঙে রূপ নয়, রূপ সব কিছু নিয়ে। গায়ের রঙ তো ফেরানো যায়। মুখে সফট্‌নেসের শ্রী তো আনা যায়। আমি নিজে করেছি। কিন্তু তোমার গড়নে পেটনে রূপ ছড়িয়ে ঘুমিয়ে আছে। জাগে নি। জাগছে। কিছু মনে করো না তুমি এত দিন ফোট নি গো সুন্দরী, এইবার ফুটছ, কিছুদিনেই বুঝতে পারবে।—একটা মনা ঘোষ নয়—ঝাঁকবন্দী মনা ঘোষ ভন ভন করবে চারদিকে। তখন চড় মারতে হলে দশভুজা হতে হবে। অদ্ভুত ফিগার তোমার। টল গ্রেসফুল। অদ্ভুত! সে তাকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখেছিল।

লজ্জায় বিস্ময়ে নীরা কেমন হয়ে গেল। এণাক্ষী তাকে মনে মনে প্রশ্ন করবার অবকাশ দিল না, এ কি সত্যি? কিন্তু চোখের দৃষ্টি? সেও কি অভিনয়? কিন্তু ভাববার অবকাশ সে পেলো না,

এণাক্ষী তার হাত ধরে টেনে ঘরে নিয়ে গেল, এস তো, দেখাই। ঘরে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে তাকে বসিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার মাথার সেই সুপ্রচুর চুলগুলি নিয়ে কি করতে শুরু করলে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যেন জাদু শুরু হল। শিউরে উঠল নীরা। এ কি? এ কি হচ্ছে? ও কে? ও কে? সে একটা আশ্চর্য চিত্ত-উদ্বেলতা! ভুলে গেল সে তার পরীক্ষার কথা। বিস্ময়, এক অনির্বচনীয় গোপন আনন্দ, ভয়—সব একসঙ্গে। পরমুহূর্তেই সে উঠে দাঁড়াল।—না। না।

—বস, বস!

—না। ছাড়ুন।

—বস না।

—না। তার কণ্ঠে সে রূঢ়তা ফিরে পেয়েছে তখন।

ছেড়ে দিল এণাক্ষী তাকে। হাসতে লাগল। বললে, এত ভয়?

—গরিবের অনাথার ভয়ই তো আত্মরক্ষার আশ্রয়।

—গরিব অনাথ অবস্থা তোমার ঘুচতে কতক্ষণ? টাকা অনেক পাবে, নাথ—? হাসতে হাসতে বললে, নাথ চাইলে অনেক জুটবে। না চাও, অনাথের নাথ একটা ভক্তিমান দারোয়ান রেখো, কিংবা একটা অ্যালসেশিয়ান পুষো। বলো, নামিয়ে দি ফিল্মে? এমন ফিগার, এমন উচ্চারণ তোমার! ক্যামেরা মাইকের টেস্ট তুমি উৎরবে এ আমি বিনা পরখেই বলতে পারি। নামবে?—আমি ছেলেবয়েস থেকে ফিল্মের দরজায় ঘুরেছি। কাজও অনেক করেছি।

তার সেই বিচিত্র নিষ্পলক দৃষ্টিতে নীরা এণাক্ষীর দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ।

এনা সকৌতুকে বললে, কি?

নীরা বললে, না।

—না নয়। ভেবে দেখো।

—না। ও আমি পারব না। আমাকে লোভ দেখাবেন না।

—অভিনয় তুমি খুব পারবে। অদ্ভুত পারবে। দু দিনে ভয় ভেঙ্গে যাবে।

—অভিনয় আমার ভাল লাগে না। এবং চাই না করতে। মাফ করবেন আমাকে।

বলেই সে ফিরল এবং বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছুটে সে পালায় না, ধীরপদক্ষেপেই নেমে এল। হেনা তার পথ আটকেছিল—দেখি দেখি। তাই তো চুলটা ফেরানোতে—।

—পথ ছাড়। বলে তাকেও সরিয়ে নেমে এসেছিল।

নিজে ঘরে এসে ঘর বন্ধ করে স্তব্ধ হয়ে তার মায়ের পুরানো আয়নায় নিজের ছবির দিকে বসে রইল। সত্যই তো তার এই কুশ্রীতা-তো সহজাত নয়—শ্রীর পরিচর্যার অভাব।

না। তাও নয়। তার পুরাতন জীবনের দেহের মধ্যে থেকে আর একজন অথবা নূতনের আবির্ভাব হচ্ছে। বাথরুমে স্নান করবার সময় নিজেকে ভাল ক'রে দেখে সে তাকে আবিষ্কার করলে। কে এক অজ্ঞাত রূপসী তার ভিতর থেকে স্মিতহাস্যে উঁকি মারছে।

* * *

এই অজ্ঞাত রূপসীকে সে দর্পণে আবিষ্কার করলে পূর্ণ গৌরবে—তার বিবাহবাসরে, বিবাহসজ্জায়। আরও চার বৎসর ১৯৪৯ সাল—অগ্রহায়ণ মাস। এর মধ্যে সে অর্থাৎ ওই অজ্ঞাত রূপসী তার মধ্যে

আত্মপ্রকাশ করছে, এ-কথা গোপন বা অজ্ঞাত ছিল না। তার নিজের কাছেও ছিল না, আর সকলের কাছেও না। তাকে সে অসম্মান করেনি, তবে তাকে আসন পেতে বসিয়ে ধূপ দীপ গন্ধে পুষ্পে অর্চনাও করে নি। ইতিমধ্যে তার সব কল্পনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। শুধু তার দুর্ভাগ্য নয়, গোটা দেশের দুর্ভাগ্য, দুর্যোগের রূপ নিয়ে সব আচ্ছন্ন করে দিয়ে তার জীবনদুর্যোগকে—আরও ঘনীভূত আরও অলঙ্ঘনীয় করে দিলে।

১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে ফার্স্ট ডিভিসনেও পাশ করে নি, করেছিল থার্ড ডিভিসনে। সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছিল বললেই বলা হল না, লজ্জাতেও সে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে টিট্‌কিরির সীমা ছিল না। পাশের বাড়ির সেই মেয়েরাও থার্ড ডিভিসনে পাস করেছে। তাদের কলরব শোনা যাচ্ছে। ঘরের মধ্য থেকে নির্বাক জেঠিমার কথাও শোনা গিয়েছিল, অতি দর্পে হত লঙ্কা অতিমানে দুর্য্যোধন। এত অহঙ্কার কি সয়! থাক সে-সব কথা। এণাক্ষী নিজে নেমে এসে বলেছিল, নামবে ছবিতে? দেখ?

ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল, না।

তারপর সটান গিয়েছিল জ্যাঠামশায়ের ঘরে। জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, আমার বাড়ির অংশের দাম, আর যদি কিছু আমার মায়ের রেখে যাওয়া টাকার দরুণ পাওনা থাকে তো আমাকে দিন। আমাকে তো পথ খুঁজতে হবে।

—পথ? মেয়েদের জন্য পথ নয়, মেয়েদের জন্যে ঘর।

—ঘর ভেঙে যাদের ভগবান পথে দাঁড় করান, আমি তো তাদের একজন।

—কোন পথে হাঁটবে? আমাদের বংশের সম্মান, সেটা তো আমাকে দেখতে হবে।

কোন ব্যঙ্গ সে করে নি। সে বলেছিল, আমার ইচ্ছে আমি কোন ইস্কুলে চাকরি করি। সেখান থেকে আই-এ দেব। তারপর পারি তো—

—হুঁ ভাল। তাতে অবশ্যই আপত্তি করব না। কিন্তু ভেবে দেখতে বলব। পরাণের পিণ্ডটা লোপ হবে। তা আগে চাকরী পাও। দেব যা পাবে তুমি। কেন দেব না?

কিন্তু হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত—অথবা আকস্মিক একটা আঁধির মত নেমে এল এক ভীষণ দুর্যোগ। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে। ১৬ই আগষ্ট শুরু হল কলকাতায় হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। তার কিছুদিন আগেই গেছে আজাদ হিন্দ দিবস। কলকাতা তখন বারুদ-স্তূপ।—এ দুর্যোগের ভীষণতায় প্রচণ্ডতায় তার মত মেয়েও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। মনা ঘোষকে সে দেখেছে। কিন্তু মানুষের এই উলঙ্গ উন্মত্ত চেহারা সে দেখেনি এই দীর্ঘ দেড় বছরের বন্দী জীবনেও। কোন দিন ভাবতে পারে নি। তার অভিজ্ঞতায় সে জানে—মানুষ এমনি নির্জনে বন্দী জীবনে যত কুৎসিতভাবে মানুষ সম্বন্ধে জীবন সম্বন্ধে ভাবতে পারে—তেমন আর কখনও পারে না। এই বন্দীজীবনে এমন ভীষণ মানুষকে সে ভাবে নি। ১৬।১৭।১৮ই আগস্টের সে কি রাত্রি! মনে আছে ওই অঞ্চলটা তখন ওদিকে বসিরহাট বারাসত এবং এদিকে কলকাতার মধ্যে পড়ে নিদারুণ আতঙ্কের মধ্যে কাটিয়েছিল। ছাদে ইঁটপাটকেল জড়ো করে ওরা চার ভাই সেদিন এমনি একটা

চেহারার আভাস দেখিয়েছিল বটে। সুজিত মেজ ভাইয়ের সে চেহারা সব থেকে স্পষ্ট। অজিতদার তখন দুটো বন্দুক একটা রিভলবার, একটা রাইফেল, একটা কার্টিজ ছাড়া ব্রিচ্ লোডিং ডবল ব্যারেল। সারারাত সে বন্দুক ছুঁড়ে বিদ্যাটা আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। অজিত শুধু মাথায় হাত দিয়ে চুপ করে বসেছিল একখানা চেয়ারে। জেঠীমা তাঁর ঠাকুরের সামনে জপ করেছিলেন। জ্যাঠামশায় হয়ে গিয়েছিলেন একতাল মাংস-স্তূপ। আর চেহারা দেখেছিল এনার। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রিভলবারটা হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাববশে খানিকটা আড়ম্বর দেখিয়েছিল, কার্টিজ বেল্টটা গলায় পরে নিয়েছিল, কিন্তু সত্যই তার সাহসের অভাব ছিল না। সে স্তম্ভিত হয়ে ছাদের আলসেতে কনুই রেখে, শূন্য-দৃষ্টিতে রাত্রির আকাশের দিকে চেয়ে থাকত। আর একজনকে সেদিন কেউ বুঝতে পারে নি। সে রণজিত। সারারাত্রি সে দা হাতে যেন নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সারারাত কথা বলে নি। পরের দিন থেকে—সে আর এক রণজিত হয়ে গেল।

মাস তিন গেল। পূজার পর সে জ্যাঠামশাইকে বলেছিল, যা হয় করে দিন জ্যাঠামশায়, আমার পথ তো আমাকে করতে হবে!

—এই দুঃসময়ে?

—দুঃসময় যদি না কাটে!

—না কাটে, আমাদের ভাগ্যে যা হবে তোমার ভাগ্যেও তাই হবে। আমি তো এ সময়ে তুমি যেতে চাইলেও যেতে দেব না মা।

এই একবার, এই একটি কথা জ্যাঠামশায়ের মেঘাচ্ছন্ন রাত্রির একটি

ফাঁকে একটি নীলাভ তারার মত জেগে আছে তার স্মৃতিতে। নইলে তার জীবনে এতবড় দুষ্ট গ্রহ আর কেউ হয় নি।

জেঠীমা কথাটা শুনে বলেছিলেন, ওর তো লাঞ্ছনার ভয়ও নেই, পাপের ভয়ও নেই। আর মায়া? ও পাথর।—দিয়ে দাও টাকা—ও যাক। মরুক!

আরও কঠিন হয়ে উঠেছিল নীরা। তারও অবশ্য কল্পনা করতে গিয়ে মনে হত—শিউরে উঠত—মনে হলে;—মনে হত সে পথে বেরিয়ে হঠাৎ পড়ল ওই দাঙ্গাবাজ—নারীহরণকারীদের মধ্যে—তারা ছুটে এল হা-হা ক'রে। এ কথার কদর্য ব্যাখ্যা একটা হয়। তখন জানত না। আরও পড়ে জেনেছে। কিন্তু তাদের একটা কথা জানিয়ে দেবে সে। একখানা ছোরা সেও জোগাড় করেছিল। ওই কল্পনায় শিউরে উঠেও সে আত্মসম্বরণ করে কল্পনা করত ওই ছুরিটা সে উচিয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও কল্পনা করে নিজের বুকে বসিয়েছে।

কুৎসিত। অতি কুৎসিত—জীবনের এই ব্যাখ্যা। দেহধারণ করে দেহকে অস্বীকার করার উপায় নেই। তার প্রভাব মনের উপর পড়ে। কিন্তু মানুষের মন দেহের বাহন নয়। দেহই তার বাহন। নিষ্ঠুর চাবুক মেরে মন তাকে মনের পথে চালায়। এই দাঙ্গাতেই তেমন অনেক মানুষ আপন পরিচয় রেখে গেল। আশ্চর্যভাবে এই বাড়ীতে ওই জ্যাঠামশায়ের ছেলেদের মধ্যে থেকে হঠাৎ এই পরিচয় দিয়ে সামনে দাঁড়াল রণজিত। হেনার ছোট ভাই। এবার উঠেছে ক্লাস টেনে। তার আর হেনার চেয়ে দু বছরের ছোট। আঠারো

বছর বয়স। সুজিতের মত খেলা পাগল। পাড়ায় মারপিটে সিদ্ধহস্ত বলে খ্যাত।

ওই রণজিতই তাকে ছোরাখানা দিয়েছিল—১৭ই রাত্রে।—দিদি তুই রাখ। তুই রাখবার যোগ্যও বটিস আর দরকারও তোর হতে পারে। এ বাড়ীতে বিপদ ঘটলে সে বিপদের মুখে তোরই পড়বার ভয় আগে। রাখ এটা।

বেশ সুন্দর ধারালো একখানা ছোরা। নীরাও নিয়েছিল।

থাক—রণজিতের কথা। থাক—পণ্ডিত মনস্তাত্ত্বিকদের ব্যাখ্যা।

নাটক—তার জীবন নাটকের কথায় ফিরে এস।

জেঠীমার কথার উত্তরে সে আরও কঠিন হয়ে উঠে বলেছিল—আপনার বংশের সম্মান যদি সহজভাবে সম্ভ্রমের সঙ্গে আমার নিজের জোরে বাঁচে—তবেই সেটা বাঁচা। নইলে আমাকে কুলুপ দিয়ে ঘরে পুরে সম্মান বাঁচানোর কি দাম? গেলে আমারই ইজ্জৎ যাবে। আমারই নরক হবে। আপনাদের লজ্জা হয়তো হবে। কিন্তু বললেই পারবেন—আমাদের মেয়ে তো নয়। ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী। ভাইঝি বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে আমার সঙ্গে সম্পর্ক কি?

জ্যাঠামশায় সেদিন সত্য আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন—ওর কথা তুমি ধরো না মা। ও এক ব্যাধিগ্রস্ত জীব!

জেঠীমা বলেছিলেন ওঘর থেকে—যে যা' পার বল আমাকে। ব্যাধিগ্রস্ত আমি নই। ওই মেয়ে কালাপাহাড়টাই ব্যাধিগ্রস্ত। নইলে আজ এই মন্বন্তর মাথায় করে কেউ পথে বের হতে পারে?

জ্যাঠামশাই আবার বলেছিলেন—আমার কথা শোন মা। শুনতে হয়। এ কথা সে শুনেছিল। মেনেছিল।

ঘরে এসে চুপ করে বসেছিল। ভাবছিল কি করলে? ঠিক না ভুল। এণাক্ষীও এসে তাকে বারণ করেছিল। অজিত স্নুজিত এরাও। ঝড়ের নদীতে বিপন্ন নৌকার সহযাত্রীর মতই তাদের সে মমতা; আঁকড়ে ধ'রেছিল। সে যেন ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে যাবার দুঃসাহস জেদ ধরে উঠে দাঁড়িয়েছে আর তারা ব্যাকুল সহযাত্রীর মত ধরে বলছে —না-না নীরা একাজ করিসনে। ঠিক হবে না। হঠাৎ নাটক ঘটল—রাত্রি তখন দশটা। হঠাৎ রণজিত তাকে ডাকলে –নীরাদি শোন্। দোর খোল্। নীরাদি!

রণজিত রহস্যময় হয়ে উঠেছে। কোথায় যায় কোথায় থাকে! প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না। তার কথায় দৃষ্টিতে ভয় পায় বাড়ির সকলে। দাঙ্গার সব বিচিত্র খবর সেই আনে। তার কণ্ঠস্বরে আদেশ ছিল

নীরা দরজা খুলে দিয়েছিল।

রণজিত এসে বলেছিল –বাড়ি থেকে চলে যাবি মতলব করেছিস? প্রশ্ন করে উত্তরের অপেক্ষা করে নি। বলেছিল- খবরদার! আমি তোকে পথের ওপরেই বোমা মেরে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেব। খবরদার! চোখ দুটো তার জ্বলছিল।

অবাক হয়ে গিয়েছিল নীরা। ছেলেটা –!

—তোর ঘরের ওই কোণে একটা থলে রেখেছি বিকেলবেলা, তুই বাথরুমে ছিলি বলা হয় নি। ওটা যেন নাড়িস নে। ওতে বোমা আছে।

—বোমা?

–হ্যাঁ। নাড়বিনে।

—বোমা কেন?

—লড়াইয়ের জন্যে। তোর বিয়েতে ফোটাবার জন্যে নয়।

—রণজিত।

—বলিসনে কাউকে। আর শোন, তোর পড়বার বইয়ের আমি ব্যবস্থা করব কাল। আমি সেই কলেজে ভর্তি হয়েছি। পড়ি নে। ওগুলোর যা লাগবে তোর, নে—আর বাকী বই ওদের ঘাড়ে ধরে কিনিয়ে দেব। দেবেনা, চালাকী! বাড়ীতেই পড়। কিন্তু বাড়ী ছাড়বার নাম এখন করবি নে। পাঁচটা পুরুষ মরে মরুক;—লড়াইয়ে মরে। কিন্তু একটা মেয়ের কিছু হলে—জাত চলে যাবে। খবরদার!

রণজিত চলে গিয়েছিল আর দাঁড়ায় নি। নীরার আর ঘুম আসে নি। রণজিত সম্পর্কেও কোনকথা ভাবে নি। মনেও উঠে নি বারবার উঠে গিয়ে শুধু বোমার থলেটার অদূরে সেটার দিকে তাকিয়ে দাড়িয়েছিল। বল তো নাটক নয়?

রণজিত কথা রেখেছিল। তার নিজের বইগুলো সব এনে তাকে দিয়ে বলেছিল এই নে। আর বাকী কি লাগবে বল—আজি বড়দাকে গিয়ে বলছি। কিনে দিতে হবে। কি নিবি তুই?

—হিষ্ট্রি, সিভিক্স, সংস্কৃত।

শুনেই সে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরই দোতলা থেকে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে, আলবৎ দিতে হবে। ওর বাপের টাকা থেকে দেবে তুমি। তোমার বাপের নয়।

অজিতদা চীৎকার করে উঠল—রণজিত!

উত্তরে রণজিত বললে লাল চোখ দেখিয়ো না। রণজিত ওতে ভয় করে না। দুড়দুড় করে নেমে গেল সে।

ভুরু দুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল নীরার! এবার বোধহয় এণাক্ষী এবং অজিতের সঙ্গে লাগবে তার!

কিন্তু তা লাগে নি। কিছুক্ষণ পর এণাক্ষী এসে দাঁড়িয়েছিল—হেসে বলেছিল—পড়বার ভূত কিছুতেই নামছে না ঘাড় থেকে? বললাম এত ক'রে? মনে ধরল না! হায় হায় হায়! কোনও মাস্টার টাস্টারকে মনে মনে ভালবাস বুঝি?

তার কথায় একটি মিষ্টি সুর ছিল যার জন্যে তার কপালে রূঢ়তার রেখার সারিগুলো জাগে নি, যা ছিল নীরার বৈশিষ্ট। বরং একটি ক্ষীণ হাস্যরেখাতেই ওই তার পুরু ঠোঁট দুটি ঈষৎ বিচলিত হয়ে উঠেছিল। হেসে বলেছিল—প্রেম ছাড়া জীবন বুঝি ভাবতে পারেন না বউদি?

বেশ ভঙ্গি ক'রেই ঘাড় দুলিয়ে এণাক্ষী বলেছিল—না!

—তা হলে আমাকে দেখুন। প্রেম আমার নেই। এবং অভিনয় ক'রেও, ভালবাসি এ কথা বলতে আমার লজ্জা হয় ঘেন্না হয়।

—তা'হলে যখন প্রেমে পড়বে তখন ঘাড়মুড় ভেঙে পড়বে।

সে ভঙ্গিও এমন সরল এবং সহজ যে নীরা এবার অনেকটা হেসে ফেললে। এণাক্ষী মুহূর্তে চিবুক ধ'রে তুলে বললে—দেখ তো! কি সুন্দর হাসি। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। মাইরি বলছি। দেখ আয়নায়।

আয়নার দিকে সেও তাকিয়ে দেখেছিল। এবং লজ্জা পেয়েছিল। এণাক্ষীর কথা তো সত্য।

এণাক্ষী বলেছিল—আর ছ মাস নয় বছরখানেক। দেখবে—মৌমাছির ঝাঁক উড়বে।

এবার সে বিরক্ত হতে চেষ্টা করেছিল। হ্যাঁ চেষ্টা করে বিরক্ত হ'তে হয়েছিল--বলেছিল -এ সব কথা বউদি আমার বেশ ভাল লাগে না। আপনি এসব আমাকে বলবেন না। মানুষের মন তো এক নয়, রুচিও নয়। ছেলেবেলা থেকে আমি ভেবে এসেছি একরকম। আমি পড়ব -অনেক পড়ব ।

কথার মাঝখানেই উপর থেকে অজিতদা'র ডাক এসেছিল এনা। এনা! কি মুস্কিল—আপিস বেরুব—আর ।

--যাই যাই।

চলে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বললে--বই তোমার আসবে। আমি বলেছি। যখন যা দরকার হবে আমাকে ব'লো, রণজিতকে বলো না। ওটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে।

চলে গিয়েছিল এণাক্ষী।

সে বসেছিল আয়নার দিকে তাকিয়ে।

এণাক্ষী খুব মিথ্যে বলেনি। আয়নায় তার প্রতিবিম্বকে ভুরু নাচিয়ে হেসে প্রশ্ন করেছিল তাই তো, লোকে তোমাকে মিথ্যে কুৎসিত বলে, তুমি তো মন্দ নও দেখতে গো।

একসময়ে আয়নার খুব কাছে গিয়ে বলেছিল- You are a darling! very sweet!

কয়েক দিনের মধ্যেই বইগুলি সে সত্যই পেয়েছিল। রণজিতের বই এবং এই গুলি নিয়ে সে আই-এর জন্য পড়তে সুরু করেছিল। জীবনের আশাকে সে সফল করবেই। অনেক পড়বে। ভাল ক'রে পাশ করবে। স্কলারশিপ নিয়ে। তারপর প্রফেসারি করবে।

সে জানে—এ তার ছেলে বয়সের মনে তার মায়ের বুনে দেওয়া বীজের চারার আকাশ অভিযান। ফল তার তেতো কি মিষ্ট জানে না। কিন্তু সে ফল ফলবেই। তারপর- -!

পড়তে পড়তে আয়নার দিকে চেয়ে পড়া বন্ধ করত। হাসত মুচকে মুচকে। নীরবে ইসারায় তার সঙ্গে কথা বলত।

দেখতে পেত -ওই চারা গাছটির পাশেই তার মধ্যে ওই নব অপরূপার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি লতা বের হয়েছে। সতেজ একটি লতা। তার বীজ বোধ করি এনে বুনে দিয়েছে ওই এনাক্ষী। লতাটা গাছটাকে জড়িয়ে নিয়েছে। ফুলও বোধ করি ধরেছে চোখে দেখা যায় না কিন্তু অতি মৃদু গন্ধ পাচ্ছে।

তার সন্ধানে সে বাথরুমে স্নান করতে গিয়ে নিজের অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গের দিকে চেয়ে দেখত। কৈশোরে এতদিন যা কুঁড়ির মত ছিল তা স্থলপদ্মের মত ফুটছে। আশ্চর্য। জীবন যেন অকস্মাৎ মহাসমারোহের আয়োজন করছে তার দেহ জুড়ে। দেহ পুষ্ট হয়ে ভরছে। যেমন তিন বছর আগে হেনার হয়েছিল। মুখের যেন চেহারা পাল্টাচ্ছে। তার বর্ণ পাল্টাচ্ছে। আশ্চর্য! মগের পর মগ জল ঢালত মাথায়। অঙ্গ বেয়ে পড়ত, সে দেখত। হাসত। চুলের রাশি মুখে বুকে পিঠে সেঁটে লেগে যেত। সাবান মাখার নেশা লেগেছিল। এবার সে ঘর বন্ধ করে চুল আচড়ে নানা ভঙ্গীতে সাজিয়ে নিজেকে তুলনা করে দেখত। তারপর দু হাত নিয়ে এলোমেলো করে দিয়ে বাইরে বেরুতো। রূপ তার নিজের জন্য। সে যেন বাইরে কাউকে দেখা না দেয়।

মাস ছয়েক পর। ১৯৪৭ সালের জুন মাস তখন। সব চিন্তা সব কল্পনা সব ভাব ভাবনা ওলোট-পালোট হয়ে গেল যেমন গিয়েছিল ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট। স্বাধীন হচ্ছে দেশ। স্বাধীনতা। স্বাধীনতা! দেশ ভাগ করে কেটে স্বাধীনতা আসছে। ইংরেজ, দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজ, অপরাজেয় ইংরেজ যারা দু দুবার জার্মানীর কাছে হারতে হারতেও না হেরে জিতল তারা চলে যাচ্ছে।

নীরা সে দিন বাথরুমে—নিজের অঙ্গের দিকে চায় নি—উল্লাসে ছোট্ট বালিকাটির মত নেচেছিল আর গান গেয়েছিল—আপন মনে "জয় হে! জয় হে! জয় হে! জয় জয় জয় জয় হে।" ভারতভাগ্য বিধাতা শব্দটিও মনে পড়ে নি।

সারা দিন আয়নার দিকে চায় নি। উপরে এণাক্ষীর ঘরে গিয়েও নেচেছিল। এনাক্ষীও নেচেছিল। সে যেন আবোল তাবোল ছেলেবেলায় শোনা শেখা একটা ছড়াও আবৃত্তি করেছিল। "এ হল কিরে হ'ল কি—সিগারেট খাচ্ছে ভটচাজ্যি। হল কি।"

তার উচ্ছ্বাসটা গেল কিন্তু সে উচ্ছ্বাস ভাসিয়ে এমন একটা উঁচু মাটিতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেল যে—ওসব কথা আর গুঞ্জরিত হয়ে উঠল না। মনে জাগল—গোটা জাতের বিরাট আশা আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রেখে—জীবন প্রত্যাশা।

মনে আছে সে দিন শ্যাডো মিনিস্ট্রি তৈরী হল। পনেরই জুলাই। একমাস পর পনেরই আগস্ট দেশ স্বাধীন হবে। সে দিন সে আয়নার দিকে তাকিয়েই তার ছবিকে বললে—বাস্। এইবার তুমিও স্বাধীন হও। কি বল? পারবে না? তার ছবির চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছিল। ছবি বলেছিল, কি সে বলেছিল তার হিসেব সে আজও

করে না। মনে হয়েছিল সেদিন, আজও হচ্ছে যে সে নয় তার ছবিই বলেছিল—নিশ্চয় পারব। কেন পারব না?—তা হ'লে—; সে বলেছিল—ওই পনেরই আগস্ট চল, স্বাধীন দেশে, স্বাধীন মেয়ে হয়ে বেরিয়ে পড়ি! নিশ্চয়। পাকা কথা!

বলেওছিল সে রণজিতকে। সে বলেছিল—তুই বল বাবাকে দাদাকে। আমি নিশ্চয় সাপোর্ট করব!

জ্যাঠামশায়কেও সে তাই গিয়ে বলেছিল।

জ্যাঠামাশায় তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলেছিলেন—বেশ! বলবার তা কিছুই নেই আমার। নাবালিকাও তুমি নও। তা হলে বাড়িটার দাম ঠিক করে একটা দলিল লেখাই—আর হিসেব করি—কত মজুত আছে তোমার খরচের পাই পয়সার হিসেব আমার আছে।

সে খুশী হয়েই ফিরে এসেছিল। রণজিতকে বলতে গিয়ে খুঁজে পায় নি। পাওয়ার কথাও নয়। সে পাগলা ঘোড়ার মত ছোটে আজকাল, ছুটো তিনটেয় ফেরে। শোনা যায়—সে দাঙ্গায় আজকাল নেতা হয়ে উঠেছে। এবং প্রচণ্ডরূপ উগ্র। বাড়ির সকলেও কথা বলতে ভয় করে। রণজিতকে না-পেয়ে সে কথাটা বলেছিল—এনাক্ষীকে। এণাক্ষী বলেছিল—তা বাড়ি ছেড়ে যাবে কেন?

একটু ভেবে সে বলেছিল—দেখুন বউদি—এ বাড়িতে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি। ভাল লাগে না। মানে এদের সঙ্গে—।

এণাক্ষী বলেছিল বুঝলাম। তা বেশ। কি বলতে পারি আর? যাত্রা শুভ হোক তোমার!

যাত্রার আয়োজনই সে সম্পূর্ণ করছিল। কি আর আয়োজন! একটা ট্রাঙ্ক। তাতে যা ধরে। সেই ট্রাঙ্কটাই একবার আজ সাজিয়ে, বন্ধ ক'রে কাল খুলে আর দুটো জিনিস পূরে—দুটো জিনিস বের করে দেওয়া। এই আর কি!

হঠাৎ ঘটল নাটক!

সে দিন ভোর বেলা বাড়ীতে গোলমাল! চমকে উঠে বসল। কি? ছোরা খানা নিয়ে সে জানলায় দাঁড়াল।

জ্যাঠাইমা চীৎকার করে উঠলেন—রঞ্জিত রে!—ওরে রঞ্জিত! সে ছুটে দরজা খুলে বেরিয়ে এল। কাছে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই জ্যাঠামশাই একটা আর্ত্তনাদ করে ধড়াস করে আছাড় খেয়ে পড়লেন। সকলে ছুটে গেল জ্যাঠামশাইকে ধরতে তুলতে। সামনেটার আড়াল সরে গেছে। সেখানে রক্তমাখা কাপড় জামা ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহ, রণজিত পড়ে আছে। মুখখানা অক্ষত।

বোমায় রণজিত মারা গেছে।

* * *

রণজিত মেতেছিল দাঙ্গার মহামারণে। কালরাত্রে কোথায় বোমা মারতে গিয়ে বোমা মেরে পালাবার সময় পা পিছলে পড়ে সঙ্গের অন্য বোমাটা ফেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। জ্যাঠামশাই অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ডাক্তার এসে দেখে বললেন—সেরিব্রেল থ্রম্বসিস। পঙ্গু হয়ে বাঁচলেও বাঁচতে পারেন। বিচিত্র জেঠীমা, তিনি এসে বসলেন স্বামীর পাশে। আশ্চর্য বসা। বেলা দুপুর হল উঠবেন না। তারপর এসে দাঁড়াল এণাক্ষী, বললে, আমি বসছি আপনি—একবার—। জেঠীমা বললেন—না। তুমি ওপরে যাও।

তারপর নীরার দিকে চেয়ে বলেছিলেন, তুই একটু বসবি ? আমি স্নান পূজোটা সেরে আসি !

সে বসেছিল।

পনেরই আগস্ট তারিখেও নীরা সারাটা দিন বসেছিল জ্যাঠা-মশাইয়ের শিয়রে। জেঠীমার সে দিন জ্বর। প্রবল জ্বর। কে বসবে ? সেই বসে রইল।

ওদিকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে গেল।

ছয়

দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য ওইখানেই শেষ করো। এ অঙ্কের শেষ হোক চতুর্থ দৃশ্যে। না হলে কাল তো নিরবধি। তার তো ছেদ নেই। জীবনের ঘটনার চলারও ছেদ নেই। ছেদগুলি গ'ড়ে নিতে হয়। এ অঙ্ক আর একটা দৃশ্যে টেনে দাও। কারণ এমন নাটকীয় ঘটনায় তার যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দেড় বৎসরের মধ্যে একটা বছর ওই জ্যাঠামশাইয়ের শিয়রে বসে থাকা। অথবা অসহায়ভাবে জেঠাইমাকে তাঁর শিয়রে বসে থাকতে দেখা!

এরই মধ্যে কেটে গেল সাতচল্লিশ সাল। অজিত ব্যবসার মালিক হয়ে ব্যবসাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। নতুন বিভাগ খুলেছে। শক্তিগড়ের কাছাকাছি রাইস মিল কিনেছে। শুধু তাই নয়, রেফিউজিদের সেবা করে, দান করে নামও কিনেছে। আগামী ইলেক্‌সনে সে দাঁড়াবে। টিকিট চাই তার। মধ্যে মধ্যে দিল্লী যায়, সঙ্গে এণাক্ষী। নতুন ব্যবসায়ে বড় ব্যবসাদার শরিক জুটেছে। প্রবীণ হুঁশিয়ার মানুষ। দ্রুত ধাবমান রথ থেকে নেমে অজিতের বৃদ্ধ অসহায় পরাণবাবুর শয্যার পাশে দাঁড়াবার অবকাশ কোথায়। অন্য ছেলেরা সুজিত অভিজিত তাদেরও সময় নেই। এর মধ্যে ওই জেঠীমাকে ওই রোগীর পাশে একা রেখে আসতে সে পারে নি। কিন্তু তার যে দিন চলে যায়। দরখাস্ত কয়েকটা করেছিল, কিন্তু কোনটাতেই সাড়া মেলেনি। একে শুধু ম্যাট্রিক, তার উপর সর্বত্র

সরকারী নির্দেশে রেফিউজি অগ্রাধিকার জীবনের মুক্তি পথকে সঙ্কীর্ণ থেকে সঙ্কীর্ণতর করে দিয়েছিল। এরই মধ্যে সে হঠাৎ মনস্থির করলে সে আই-এ পরীক্ষা দেবে। পাস সে করবে। যে ডিভিসনে হোক। বইগুলি পড়েই ছিল ; আবার সেই বই নিয়ে বসল এবং একদিন অজিতকে গিয়ে বললে, সে পরীক্ষা দেবে। ফিয়ের টাকা চাই। কিছু বই চাই। অজিত বললে, পরীক্ষা? পড়লে কোথায়?

—পড়েছি।

অনেক দিন পর এণাক্ষীর সঙ্গে দেখা। তেতলা ইন্দ্রলোক। সে মর্তভূমের বাসিন্দা, দেখা বরাবর কদাচিৎই বটে কিন্তু জ্যাঠা-মশায়ের এই অসুখের পর থেকে রকম সকম যেন অন্য ধরণের হয়ে গেছে। আজকালও—দেখা হয় না এমন নয়, কিন্তু সে দেখায় শুধুই তাকানো, দেখা ঠিক হয় না। বোধ করি সে দিন যে জেঠীমা তাকে ফিরিয়ে দিয়ে নীরাকে জ্যাঠামশায়ের শিয়রে বসতে দিয়েছিলেন এবং এখনও সেই বসে থাকে, তারই প্রতিক্রিয়ায় এণাক্ষী এমন হয়েছে। আজ হঠাৎ এণাক্ষী হেসে আক্ষেপ প্রকাশ করে ঘাড় নেড়ে বলেছিল—তোমার কপালে শনির দৃষ্টি। না হলে তোমার অন্ন খায় কে? পরীক্ষা দেবে, দিয়ে হবে কি?

অজিত বলেছিল, থাক না ও কথা।

—থাক। তবে তুমি নামছ ওই বিজনেসে, খুব ভাল হিরোইন হত।

সে কঠিনভাবে বলেছিল, সকল অন্ন সকলের জন্য নয় বউদি। কারও জন্যে গোবিন্দভোগ, কারুর জন্যে খুদ। আমার খুদের ভাগ্য। আমাকে আপনি আর এই কথাটা বলবেন না।

এণাক্ষী রাগ করে নি। হেসে বলেছিল চমৎকার কথা বল তুমি। আচ্ছা আর বলব না। ওগো টাকাটা দিয়ে দাও বাপু।

ওই পরীক্ষা দেওয়া তার ভুল হল। অথবা ভুল নয়, ওইটেই তার মুক্তির পথ করে দিয়েছে।

সে ফেল হয়ে গেল। পড়তে সে ঠিক পায় নি। জ্যাঠামশাই মরতে মরতে মরছিলেন না। নিদারুণ কষ্টের মধ্যেও প্রাণ বেরুচ্ছিল না। ডান হাত ডান অঙ্গ অবশ। কথা বলতে পারেন না। গোঙান, প্রলাপের রোগীর মত চিৎকার করেন। আর বাঁ হাতে ডান হাতের চেয়েও জোরে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে জেঠীমাকে মারেন, তাঁর চুল ধরে টানেন। ছুটে গিয়ে ছাড়াতে হত তাঁকে। মলমূত্র বিছানায়; গায়ে লাগে; মুক্ত করেন জেঠীমা; সে অবশ্য দু চারদিন। তাঁর অগোচর ছাড়া তিনি তাঁকে নড়তে দেন নি। শেষে বলেছিলেন ও তুমি করতে যেয়ো না, ও আমি কাউকে করতে দেব না। আমি পূজোয় বসি, বাথরুমে যাই, থাকবেন কিছুক্ষণ ওই অবস্থায়। ওঁর অদৃষ্টে ওই রয়েছে। আমি বারণ করলাম।

হেনা আসত মধ্যে মধ্যে, নাকে কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকত। কিছুক্ষণ থাকত, তারপর ছেলের অজুহাত তুলে চলে যেত। একদিন তাকে বলেছিল তুই ওখানে মরিস কেন? দাদারা তো নাস রাখলেই পারে! মরণ তোর। পরের জন্যেই গেলি! সে হাসত।

পরীক্ষার ফল বেরুল সে ফেল হয়েছে।

এরই দিন দশেক পর প্রায় এক বছর ভুগে জ্যাঠামশায় মারা গেলেন। জেঠীমা আবার ঘরে ঢুকলেন। সে তাঁর কাছে গিয়েছিল।

জেঠীমা বলেছিলেন এবার আমার বিধবার জীবন নীরা। সেবা আমি কারুরই চাইনে। তুমি আমার কিচ্ছু ছুঁয়ো না। এরপরই চলে গেলেন কাশী।

সেই দিনই সেও চলে যেত। কিন্তু অজিত-দা ছিল না বাড়ি। গিয়েছিল বম্বে। তার টাকায় ছবি হচ্ছে। তার কি সব করবার জন্যে বম্বে গেছে এণাক্ষীকে নিয়ে।

ফিরে এলে সে বলতেই বললে, আমার ছবিটা রিলিজ হোক। টাকা আটকে গেছে। তার আগে তো পারছিনে। জোর করলেও উপায় নেই, পারব না। জ্যাঠামশায়ের আমল থেকেই দলিল পত্র হয়ে আছে। তারপর এ বছরের হিসেব সে নিজেই রেখেছে।

ছবি রিলিজ হল কিন্তু দু সপ্তাহেই ছবি শেষ। মাথায় হাত দিয়ে বসল অজিতদা। একদিন পর এণাক্ষীকে নিয়ে গাড়িতে কোথায় চলে গেল। সুজিত বাড়িতে বসে রইল, আপিস গেল না।

দিন কয়েক পর একখানা বড় গাড়ি এসে দাঁড়াল। সুজিত চাকরকে বললে, বল গিয়ে বাবুরা সব বাইরে গেছেন। কিন্তু চাকরকে ঠেলে তিনি বাড়ি ঢুকলেন। অবশ্য তার আগেই সুজিত খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

অজিতবাবু! অজিতবাবু! সুজিত। কে রয়েছে বাড়িতে?

এবার বাধ্য হয়ে বেরিয়ে এল নীরা। এ'রা তো কেউ বাড়ি নেই।

এক বৃদ্ধ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিশ্চয়। তিনি বললেন, কোথায় গেছেন?

নীরা বললে, তার আগে আমার কথার জবাব দিন। আপনি

এভাবে বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন কেন? আপনি 'কোন একজন সম্ভ্রান্ত লোক।

বৃদ্ধ নীরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, চাকর বললে, বাবুরা কেউ বাড়ি নেই। অজিত স্ত্রী ছাড়া কোথাও যায় না. ওর মা কাশীতে।

বাধা দিয়ে নিজের ব্যক্তিত্বকে আরোপ করে। নীরা হেসেই বললে, আরও কেউ থাকতে পারেন; দেখতেই পাচ্ছেন আমি রয়েছি।

বৃদ্ধ বললেন, আমার ভুল হয়েছে স্বীকার করছি। অজিতের কারবারে আমি অংশীদার। আমার প্রয়োজন জরুরী। আমার মনে হচ্ছে, এরা ইচ্ছে করে আমার সঙ্গে দেখা করছে না। তাই ঠিক হিসেবটা হয় নি। তোমার কথা মনে হয় নি আমার। তুমি তো অজিতের খুড়তুতো বোন। কিন্তু · ·। কথাটা কিন্তুতেই চাপা রেখে বললেন, চমৎকার মেয়ে তো তুমি!

চুপ করে ছিল নীরা।

বৃদ্ধ বলেছিলেন আচ্ছা আসি মা। আমি বৃদ্ধ, কোন অপরাধ নিয়ো না আমার।

পরদিন আপিসের একজন কর্মচারী এসে সুজিতের সঙ্গে দেখা করলে। সুজিত বেরিয়ে গেল তার সঙ্গে। ফিরে এল হাসিমুখে। পরদিন যথাসময়ে আপিস গেল। পরদিন সেই বৃদ্ধ এলেন। এবার সুজিত সমাদর করে তাঁকে ড্রইংরুমে বসাল। তারপর তাকে ডাকলে, উনি একবার ডাকছেন। কি হয়েছে সে দিন! হাসতে লাগল। আসতেই হবে, নইলে উনি আসবেন। বলছেন, আমার ঠিক ক্ষমা

চাওয়া হয়নি। এসেছেন ওই জন্মে। ভারী ভাল লেগেছিল নীরার সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধের এই বিনয়। আভিজাত্যের প্রতি মোহ তার নেই বরং একটু বিরূপতাই আছে কিন্তু সেদিন সম্ভ্রম অনুভব না করে পারে নি। এবং লজ্জাও পেয়েছিল। কি মুস্কিল দেখতো, না বুঝে কোন মানুষকে কি বলে ফেলেছে সে। কুণ্ঠিতভাবেই সে ড্রইংরুমে গিয়েছিল। ভাবতে ভাবতেই গিয়েছিল কি কোন্ কোন্ কথাগুলি সত্যাই রূঢ় হয়েছিল। ঘরে ঢুকেই কিন্তু আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেল। একটি যুবকও বসে আছে। সম্ভ্রান্ত ও রূপবান ছেলে।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, এটি আমার ছেলে মা। ভাল ছেলে, এম-এ পড়ে, আবার দুষ্টু ছেলে। ওকে নিয়ে এই পথে যাচ্ছিলাম, তা মনে হল সেদিনের ত্রুটি স্বীকার যেন ঠিক হয় নি। তাই নেমে পড়লাম। সেরে নিতে চাই সেটা।

নীরা দুজনকেই নমস্কার করেছিল, তারপর বলেছিল, না। ত্রুটি আমারও হয়েছিল। আপনি যেন কিছু মনে করবেন না। আপনার মত প্রবীণ সম্মানী লোককে আমার---।

কথার মাঝখানেই হা-হা করে হেসে উঠেছিলেন বৃদ্ধ, বলেছিলেন অসামান্যা মা। শুধু ব্যবহারে নয়। রূপেও। তাইতো ভুল হয়ে গেল আমার। কারণ অজিত বলত আমার খুড়তুতো বোন একটু কালো, বেশী ঢ্যাঙা। আমি চিনতে পারলাম না, তুমি তো কালো নও। তুমি শ্যামা। আর ঢ্যাঙাও নও---তুমি মহিমাময়ী, তাই মাথায় একটু সাধারণ থেকে উঁচু। যা মিষ্টি করে আমাকে সচেতন করেছিলে। জান, এই আমার এম-এ পড়া ছেলে আমার সামনে কথাটি বলতে পারে না।

ছেলেটি সত্যই স্তব্ধ মৌন হয়ে বসেছিল।

তারপর ঘটনাগুলো ঘটল অত্যন্ত দ্রুত। যেন বাঁকের মোড় ফিরে সমতলে পড়ে ছুটল ঘটনার বন্যা। অজিত এণাক্ষী ফিরে এল। পূজোর পর তখন। এসেই তাকে ডেকে বললে নীরা, একটা কথা আছে। আমাদের তো মনে হয় আশ্চর্য্য সুসংবাদ। সোমেশবাবু তোকে পুত্রবধূ করতে চান। তিনি তোকে দেখে গেছেন। ছেলেও দেখেছে, তুইও দেখেছিস তোর ভাগ্য ভালরে—আশ্চর্য্য ভাল।

এণাক্ষী বলেছিল, বহু লক্ষের মালিক।

তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। তবু সে বলেছিল, ভেবে বলব। সারাটা রাত্রি—সে তার নিদ্রাহীন রাত্রি। ঘরে আলো জ্বলছিল। সেই আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার প্রশ্ন করেছিল, তুমি এত রূপসী? তুমি এত ভাগ্যবতী? আকস্মিকতায় তার অতীতের সব দুঃখ, ভাদ্রের শেষ সপ্তাহে এক রহস্যময়ী যাদুকরীর সোনার কাঠির ছোঁয়ায় বর্ষার কালো মেঘের মত কোথায় যেন মিলিয়ে গিয়ে শরৎ-প্রভাত জেগে উঠেছিল। সেখানে যাদুকরী প্রকৃতি—আর এখানে সে যাদুকরী ভাগ্য যাকে সে এতদিন শুধু জেঠীমার সঙ্গে তুলনা করে এসেছে। যাকে সে মানতে চায় নি। সেদিন তার প্রতি শ্রদ্ধা হয়েছিল তার। জীবনে মোহ বোধ করি ওই একবার।

বৃদ্ধ কিন্তু সত্যই সম্ভ্রান্ত, সত্যই অভিজাত। রূপবান যুবকটির স্তব্ধ মৌনতার মধ্যেও একটি সংযত সম্ভ্রম দেখেছিল।

সকালবেলা অজিতই এসে ডেকেছিল—নীরা! নীরা!

নীরা তখনও ঘুমচ্ছিল। সারা রাত্রি সে ঘুমোয় নি; ভেবে নিজের ভাগ্যকে লক্ষ্মীর মত বন্দনা করে—এই শেষ রাত্রে তার পায়ে আত্ম-সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল। সে ঘুম ভেঙেছিল অজিতদার ডাকে। সে জেগে উঠে বলেছিল, হ্যাঁ বলো আমার মত আছে। তবে আমার বাবার যে টাকা কটি আছে তাই সব। তার বেশী দাবী করলে চলবে না এবং তা না নিলেও হবে না। তোমরাও কিছু দিতে পারবে না।

তাই হয়েছিল। সোমেশবাবু নিজে এসে আশীর্বাদ করে গিয়েছিলেন, গলায় জড়োয়া নেকলেস পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, তুমি রাজ্য চালাতে পার মা। সঙ্গে সঙ্গে দিনস্থিরও হয়েছিল অগ্রহায়ণে। জেঠিমা এসেছিলেন কাশী থেকে। সে নিজেই তাকে লিখেছিল, এবং অজিতকে বলেছিল তাঁকে আনতে হবে। তিনি না হলে হবে না। তিনিই আমাকে সম্প্রদান করবেন। জেঠীমাও এসেছিলেন।

এল বিয়ের দিন।

সেদিন তাকে সাজিয়েছিল এণাক্ষী। নিজের মধ্যের রূপসীকে পূর্ণ গৌরবে রানীর মত মহিমায় প্রকাশিত দেখে নিজেই সে নিজের প্রেমে পড়েছিল। দীর্ঘাঙ্গী, পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল, মধ্য-ফাল্গুনের শ্যামলতার মত উজ্জ্বল-শ্যামা, আয়ত-নয়না, ঘন কালো একরাশি চুলের পৃষ্ঠপটে সে যেন কোন কাব্যের নায়িকা। নায়কের জন্য প্রতীক্ষমানা।

অবনতমুখী। জেঠীমা সম্প্রদান করবেন। অভিভূতের মত বসেছিল নীরা। সারাদিন উপবাস করে আছে। দেহ মন যেন দীর্ঘকালের রোগমুক্তির পর লঘু স্নিগ্ধ শান্ত। মনে হচ্ছে ঘুম আসছে। সে ঘুমের দুহাতের অঞ্জলিতে ধরেনা এমনি বড় একটি সুখ-স্বপ্নের শতদল। মধ্যে মধ্যে এণাক্ষী এসে প্রশ্ন করছিল—ছেঁড়া কখানা বই ছেলেদের বই ও কি হবে?

একটু হেসে নীরা বলেছিল—ও কখানা আমার ছেলেবেলার প্রাইজের বই।

—আচ্ছা! এণাক্ষীও হেসে চলে গিয়েছিল।

আবার আসছিল আর এক কথা জিজ্ঞাসা করতে। কারণ স্থির হয়েছে কাল কুশণ্ডিকা সেরেই ওরা রাত্রে ট্রেনে উঠবে। যাবে ভারত ভ্রমণে। ট্রেনেই হবে ফুলশয্যা। বরের বাড়িতে প্রীতিভোজন কালই সারা হয়ে যাবে। এণাক্ষী তাই ওর জিনিসগুলি গুছিয়ে দিচ্ছে।

নীরা অত্যন্ত ক্লান্তভাবে শান্ত। তার আর কিছু মনে করবারও শক্তি নেই। ভাগ্যের ঐশ্বর্যময় ইন্দ্রপুরীর যবনিকা উঠছে তা দেখে বিস্মিত হবার মত শক্তি নেই তার।

প্রথম সন্ধ্যাতেই লগ্ন।

পাত্র এসেছে। সানাই বাজছে। চারিদিকে ব্যস্ততার কোলাহল। ফুলের মালার, ফুলের সজ্জার, পুষ্পসারের সৌরভে চারিদিক ভরে গেছে। এদিক দিয়ে অজিতদা আয়োজনের ত্রুটি রাখে নি। সে এক্ষেত্রে নীরার কথা শোনে নি। সে বাড়িটাকে খুব ভাল ক'রে সাজিয়েছে। খাওয়া দাওয়ারও আয়োজন করেছে সরকারী গেষ্ট কন্ট্রোল অর্ডারকে সুকৌশলে ফাঁকি দিয়ে। রৌশন চৌকী

বাজছে। মেয়েরা সব বাইরের প্যাণ্ডেলের দিকে গিয়ে বসেছে। বর দেখছে। নীরা বসে শূণ্যমনে যেন ডুবে যাচ্ছিল সুখস্বপ্নের মত একটি অনুভূতির মধ্যে।

অকস্মাৎ কি একটা চীৎকার উঠল।

কি? কি? কে? কে? এই! এই! নিকালো নিকালো। এই! সব ছাপিয়ে একটি নারী কণ্ঠের উচ্চ আর্ত কান্না বেজে উঠল—না—না—আমি যাব না। না—।

উনি আমার স্বামী। আমার—আমার—।

চমকে উঠল নীরা। ঘুমন্ত, সুখ-স্বপ্নে ভোর মানুষের গায়ে অস্ফুট-স্বরে জ্বলন্ত আঙরা পড়লে যেমনভাবে চমকে ওঠে।

পাশের ঘরে কার হাত থেকে যেন একরাশ বাসন পড়ে গেল ঝনঝন শব্দে। বোধ করি সেই বললে—ওমা, মেয়েটার যে সন্তান হবে গো। ও যে বলছে—বর ওর স্বামী। ওকে বিয়ে করেছে! ওমা কোথায় যাব গো! সানাই থেমে গেছে।

কে চীৎকার করে উঠল ভারী গলায়, পুলিশে খবর দাও অজিত। এরা ব্ল্যাকমেলার। কোথায় টেলিফোন? চল নিজেই বলছি আমি। ডেপুটি কমিশনার আমার বন্ধু। চল। তোমরা এদের বসিয়ে রাখ ধরে রাখ।

নীরা উঠে দাঁড়িয়েছিল।

আসরটা আশ্চর্য রকমে প্রশ্নের গুরুত্বে নির্বাক হয়ে গেছে!

মেয়েটিই শুধু থামে নি। সে বলছে ওগো তুমি বল! তার সঙ্গে কান্নার স্পষ্ট প্রকাশ।

ওঃ, সে কি নির্মম বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রকাশ। মহাকাব্যের বর্ণনার মত আলো নেভেনি, পুষ্পসজ্জা নিষ্প্রভ হয় নি; সৌরভের হানি ঘটেনি; তবে হ্যাঁ, সানাই থেমে গিয়েছিল। ও যে মানুষে বাজায়। মেয়েরা ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল রেলিংয়ে ভর দিয়ে। কি হল? তাদের সঙ্গে সেও। থর থর করে কাঁপছিল সর্বাঙ্গ। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড ভয়ে উদ্বেগে যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। মিনিটে যদি হৃৎ-স্পন্দনের সংখ্যা সীমায় বাঁধা থাকে তবে সে তখন এক মিনিটে বহু মিনিট অতিক্রম করছিল। হয়তো সমস্ত পরমায়ুর স্পন্দনসংখ্যা শেষ করে লুটিয়ে পড়তে চেয়েছিল। অথবা এই ঘটনার সময়টা সংক্ষিপ্ত করে দিতে চেয়েছিল।

একটি সুন্দরী মেয়ে। মা হবে অল্প দিনে। দু চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। সে কাঁদছে আর বলছে—ওগো তুমি বল! বর পাথর, নতশির। যার মধ্যে তার স্বীকৃতি সুস্পষ্ট। সঙ্গে এক বৃদ্ধ, আর কয়েকজন অল্পবয়সী ছেলে।

বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সোমেশবাবুর আজ এই মুহূর্তে এ কি মূর্তি? হাতের রূপোবাঁধানো ছড়িটা ঠুকছেন আর বলছেন, তুমি মিথ্যাবাদী। তুমি জোচ্চোর। ঠগ তোমরা। বেরিয়ে যাও! আমি এক্ষুণি ডি-সিকে টেলিফোন করতে চাই। অজিত! কিন্তু নড়ছেন না। যেন দণ্ডমুণ্ডের কোন শাসনকর্তা—যিনি মুহূর্তে দণ্ড হিসাবে মুণ্ডটা অনায়াসে গ্রহণ করতে পারেন। তাঁর অন্যের সাহায্য নিতে সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে।

অজিতদা তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছে, ব্ল্যাকমেলারস!

মেয়েটির সঙ্গের বৃদ্ধ হাত জোড় করে বলছে, না—না—ঈশ্বরের

শপথ করে বলছি এ সত্য। আপনার ছেলে আমার মৃতপুত্রের সহপাঠী ছিল। আমি গরিব, আমি সাধারণ, কিন্তু সে লেখাপড়ায় অসাধারণ ছিল। সেই সূত্রে আপনার ছেলে আমার বাড়ি আসত। আমার ওই মেয়ে হতভাগিনী, বিবেচনা করেনি, বিচার করেনি সম্ভব অসম্ভব, হাত বাড়িয়েছিল আপনার পুত্রের দিকে। আমার ছেলের মৃত্যুর পর স্নেহের মধ্য দিয়ে ঘটেছে এটা। দোষ আপনার ছেলেকে আমি দেব না। জেনে, অভিসম্পাত দিয়েছি মেয়েকে। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না। সর্বনাশ তখন ঘটে গেছে : দয়া করুন—

—প্রমাণ কি ? আপনাকে আমি পুলিশে দেব।

—এই দেখুন ওদের বিবাহের পরদিনের ছবি, জিজ্ঞাসা করুন আপনার ছেলেকে।

—কিসের বিবাহ ? কই সার্টিফিকেট কই ?

—রেজেস্ট্রি করে বিবাহ হয়নি। কথা ছিল, কিন্তু হয়ে ওঠে নি। হিন্দুমতে ভগবান সাক্ষী রেখে।

—ভগবান সাক্ষী ? আমরা ব্রাহ্মণ, আপনি কায়স্থ, হিন্দু মতে ভগবান এ বিবাহ স্বীকার করেন ? করেন না। চলে যান। আপনি চলে যান।

ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকে নীরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ! এ কি হল ? কি করবে সে ? পৃথিবী শূন্য হয়ে গেছে তার কাছে। বুকের মধ্যে একটা ঝড় বইছে শুধু। হাহাকার ক্রোধ মিলে প্রচণ্ড একটা কিছু। কানে এল পাশের ঘরে এণাক্ষী বলছে, ওরা খবর পেলে কি করে ? ছি-ছি-ছি !

অজিতদা বললে, কি করে জানব ? আমি কি করে বলব। আমি

বারবার সোমেশবাবুকে এ সব উৎসবটুৎসব করতে বারণ করেছিলাম। উনি যে নিজেকে বড় পয়গম্বর মনে করেন। হ্যাঃ—ওরা আবার কিছু করতে পারে!

এণাক্ষী বলেছিল, তারপর? বিয়ে যদি ভেঙে যায়? টাকা তো সোমেশবাবু ছাড়বেন না! আমি কি করব বলার মানেটা ভেবেছ? টাকাটা ছাড়ছিলেন তিনি এই জন্যেই—।

সকল আবরণ ছিঁড়ে গেল। অনেকক্ষণ অর্থাৎ সেই মুহূর্ত থেকেই ছিঁড়তে সুরু করেছে। তার অন্তরের সুখ-কল্পনার মোহ চেপে ধরেছিল, ছিঁড়তে দেবে না, কিন্তু সমস্ত ঘটনাগুলি এমনই নিষ্ঠুরভাবে সত্যের শক্তিতে প্রচণ্ড যে টেনে ছিঁড়ে খুঁড়ে ছড়িয়ে দিয়ে নগ্ন করে দিলে, শেষটান দিলে এণাক্ষীর কথা। নগ্ন সত্য তার সামনে এসে ব্যঙ্গ হেসে দাঁড়াল। না, সত্য ব্যঙ্গ হাসি হাসে না; সে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে, বল, এবার কি করবে? স্থির কর তোমার পথ।

সেই তার পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিয়েছিল, ওই পথ।

এ বাড়ির সদর দরজা পার হয়ে বিশাল পৃথিবীর দিকে দিকে পথ চলে গেছে। যে পথে বারবার চলতে চেয়েছ কিন্তু চেয়েও পারোনি। আজ বের হও। এই রাত্রেই, এই মুহূর্তে।

বিলম্ব সে করে নি। মালা ছিঁড়ে ফেলেছিল, গহনা খুলে ফেলেছিল, শাঁখা ভেঙে ফেলেছিল, কনে-চন্দন মুখের কাজল, মুখের প্রসাধন মুছে বেনারসী শাড়ি ব্লাউস বদলে সাধারণ শাড়ি ব্লাউস পরে বেরিয়ে পড়বার মুখে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

ঘরখানা মৃত রণজিতের ঘর। তার জন্য এখন থেকে সাজানো

থাকবার কথা। রণজিতের ড্রয়ার খুলে সে বের করে নিয়েছিল তার একখানা ছোট নেপালী ভোজালি। রণজিত যেখানা তাকে দিয়েছিল সেখানা সে স্বপ্নের মোহে খাপে ভরে বাক্সে রেখেছে, কাছে নেই। এটা তার চেয়ে ছোট, কিন্তু মারাত্মক। আর তুলে নিয়েছিল সাজানো দান সামগ্রীর মধ্যে রাখা একটি ছোট ভেলভেটের থলি। তাতে ছিল নগদ, একশো এক টাকার ধাতুর টাকা।

বিবাহ-সভার সবার সামনে এসে সে দাঁড়িয়েছিল। অকুণ্ঠিতা অসমসাহসে সে তখন অগ্নিশিখার মত জ্বলছে ; প্রদীপ্ত অনবনমিতা সে তখন। সোমেশবাবুকে বলেছিল, আপনার পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে ফিরে যান দয়া করে। আমি বিবাহ করব না।

চমকে উঠেছিল সমস্ত সভাটা।

অজিত ছুটে এসেছিল।—নীরা।

সে ভোজালিটা বের করে বলেছিল, এসো না আমার কাছে। তা হলে আমি আত্মহত্যা করব।

হতভাগিনী সেই মেয়েটা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিল। নীরা তাকে বলেছিল. জোর করে তোমার স্বামীকে ওখান থেকে টেনে নামিয়ে নিয়ে যাও। সে তোমার দায়। আমি চলে যাচ্ছি।

—নীরা। অজিত আর একবার চিৎকার করেছিল।

বাকী সব স্তব্ধ স্তম্ভিত। সে তারই মধ্যে চিন্তাহীন মনে শঙ্কাহীন চিত্তে দর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে গিয়েছিল সদর দরজা দিয়েই। সেখানে ডেকরেটারদের সাজানো ফটকের মাথায় রোসনচৌকীর লোকগুলি বসে ছিল অবাক হয়ে।

—নীরা! আবার চিৎকার করেছিল অজিত।

—না। থাক, মনা ঘোষের উচ্ছিষ্ট কন্যায় আমার প্রয়োজন নেই। সোমেশবাবুর গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছিল সে।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল সে ফিরে জবাব দিয়ে আসে, কিন্তু আত্মসম্বরণ করেছিল সে।

ছোরাটায় হাত রেখে রাত্রির পৃথিবীর পথে এগিয়েছিল নির্ভয়ে; কনেসজ্জার এলো খোঁপাটা কখন এলিয়ে গেছে। কাজললতাটা তবুও কি ভাবে জড়িয়ে আটকে ছিল চুলে। পিঠে মধ্যে মধ্যে বিঁধছিল বলেই খেয়াল হল—কি এটা। কাজললতা? ব্যঙ্গে আপনিই তার ঠোঁট দুটো ভঙ্গি করে উঠেছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে ফেলে দিয়েছিল পথে।

তার মুক্তি।

শেষ করো দ্বিতীয় অঙ্ক। যবনিকা পড়ুক!

বলো তো। বিনো সেন ব্যঙ্গ করে, তাকেই যেন ব্যঙ্গ করে বললে —যান এইবার। নাটক তো হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেই নাটকটা করছিল, তার প্রস্থানের পরই নাটক শেষ হয়েছে—! তোমরাই বিচার করে বলো জীবন তার নাটক কিনা? সে সত্যই নাটকের নায়িকার মত বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে কিনা—তোমরাই বলো। বিপর্যয় এদেশে সবার জীবনেই আছে আসে যদি বলো তবে বলব আসে কিন্তু তারা লড়াই করে না, সভয়ে আত্মসমর্পণ করে বলেই তারা নায়িকা হয় না।

তবে তার মত নায়িকা বাংলা দেশে একালে অনেক আছে গো। হেনা নয়—নীরারাই এ যুগে বেশী। যারা কলেজে পড়ছে, চাকরী

করে বাপ মাকে পুষছে তারা হেনাদের মত মনাদের সঙ্গে প্রেম করে না। হেনার বর অমল ওই পাষণ্ড মনা এরা মনে করে এরা হেনাদের দল। হেনারাও মাঠে বেড়ায়, হোটেলে যায়। তাদের নিয়ে এরা খেলা করে। ভাবে সবাই হেনা। কাছে গিয়ে চড় খায় নীরাদের।

বিনো সেনের মত লোকও তাই ভাবে। ভণ্ড। সে ভাবছে বিনো সেনকে সে চড় মারবে না কেন? না—তা পারে নি!

সাত

ঢং ঢং করে ঘণ্টা পিটছে।

আশ্রমের নিয়মমাফিক—শোবার ঘণ্টা পড়ছে। ছেলেদের ঘরের আলো নিভবে এবার, পনের মিনিট বাকী। সওয়া নটা সাড়ে নটায় আশ্রম অন্ধকার হয়। মন সম্পর্কে আগের কালে লোকে বলত— তুরঙ্গ অর্থাৎ ঘোড়ার চেয়েও দ্রুতগামী। মন বায়ুর চেয়েও দ্রুতগামী। বায়ু কেন, এ কালে জেট প্লেন হয়েছে—তার চেয়েও দ্রুতগামী। বায়ু ঝড়ের গতিতে যখন ছোটে—তখন ঘণ্টায় একশো মাইল বেগে ছুটলেই পৃথিবী বিপর্যস্ত হয়ে যায়। সৃষ্টি ধ্বংস করে দেয়। জেট প্লেন ঘণ্টায় ছোটে ছ শো মাইল,—আটশো মাইলও ছোটে। রকেট চলে আরও অনেক অনেক দ্রুততর গতিতে। চন্দ্রলোকে—শূন্যলোকে তার পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরাম নেই। দ্রুততমগতি এরোপ্লেনে মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যায়; যেতে পথে ক্লান্তি আসে, ঘুমোয়। ভাবে কতক্ষণে শেষ হবে এই বিরক্তিকর ছোটা। কিন্তু পৌঁছবার পর ঘরে বসে এই পথের কথা—তার ছবি—মনের পটে আগাগোড়া ভেসে যেতে কতক্ষণ লাগে? কয়েক মিনিট! মনের পটে স্মৃতির আলোয় প্রতিফলিত ছায়া ছবি—মনের রঙ্গমঞ্চে স্মৃতির নাটকের অভিনয়,—উনিশ বছরের জীবন রঙ্গমঞ্চের অভিনয়—মনো-মঞ্চে একঘণ্টারও কম সময়ে শেষ হয়ে গেল।

আশ্রমের এই শোবার ঘণ্টার সঙ্কেতে নীরা সজাগ ও সচেতন হয়ে

উঠল। বিনো সেনের সঙ্গে জীবন মঞ্চের আসল নাটকে অনিবার্য সংঘাতপূর্ণ দৃশ্যটি শেষ করে ঘরে এসে বসে—উত্তেজনার মধ্যে আগাগোড়া জীবন কথা স্মরণ করতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল নিজের মনো-রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে। সেখানে এই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে তার জীবন নাটকের যেন দুটি অঙ্কের অভিনয় হয়ে গেল। জীবন তার স্রষ্টার নির্দেশে নাটক কি না সেই সত্যকেই তার স্মৃতি যেন দেখিয়ে দিলে। মানুষের জীবন নিয়েই নাটক বিনো সেন। তাই নিয়েই উপন্যাস—গল্প—তাই নিয়েই শিল্প সাহিত্য সব। জীবনে নাটক আছে—শিল্প আছে—তাই ওগুলো সৃষ্টি করতে পেরেছে মানুষ! তুমি নাটক দেখেছ ভুল দেখ নি। তবে ওতে ব্যঙ্গের কিছু নেই।

একটা পিতৃমাতৃহীনা দুঃখিনী মেয়ে—এই আত্মকেন্দ্রিক সংসারে শুধু আমার আমার আমার রোল তুলে কোটি কোটি আমির ঠেলাঠেলির মধ্যে বহু আঘাত সহ্য করে—আপন শক্তিমত তার ছোট হাতের দাঁতের নখের ধাক্কা কামড় আঁচড় দিয়ে—নিজের আমিকে বাঁচিয়ে এসেছে—তার 'আমি' স্বত্বার স্বত্বে 'আমার' ধ্বনিকে কারুর গলার জোরে চাপা পড়তে দেয় নি—সে তো কম বিচিত্র কম রোমাঞ্চকর নয়। বিনো সেনও তাকে আঘাত করলে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে নীরা। বিনো সেনকে সে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেছিল। এই চিঠিখানা পাবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তা একটা মিনারের গৌরবে দাঁড়িয়েছিল। ছি-ছি-ছি, বিনো সেন নিজেই তাকে এক মুহূর্তে ভূমিসাৎ করে দিলে। সেই কারণেই ক্ষোভটাও হয়েছে প্রচণ্ড। তাকে সে ঘৃণাও করেছে এক মুহূর্তে।

না। থাক। আজ রাত্রেই তাকে যেতে হবে। যাবেই সে। শপথ করেছে সে। এখানকার অন্ন সে গ্রহণ করবে না। এখানে

রাত্রির জন্যও বিশ্রাম করবে না চলে তাকে যেতেই হবে। যেমন সে ওই বিয়ের রাত্রে চলে এসেছিল। কিন্তু আর নয়, সে উঠল, জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করলে। জিনিসপত্র আছে অনেক। থমকে দাঁড়িয়ে চারিদিকের জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে দেখলে।

'আমার' বলে সে এখানে এসেই প্রথম কিছু না কিছু বস্তু সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। পিছনের জীবনের কিছুই নেই। সবই ফেলে চলে এসেছে বিবাহ বাসর ত্যাগ করবার সময়ে। পরণে যে সাজ সজ্জা ছিল—তার সবই ছিল নতুন। বেনারসী বদলেও নতুন কাপড়ই পরতে হয়। বিয়ের কনের সজ্জা তো! সেই কাপড় জামাগুলি সে সযত্নে রেখেছে বটে—কিন্তু সে তার অতীতের সঞ্চয় নয়। জীবনের একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের স্মৃতি। রণজিতের ছুরিখানা আছে সেখানাও তাই। থাকবার মধ্যে আছে মায়ের হাতের একটা আংটী। সেটা তার আঙুলে ছিল, বিয়ের দিনও সে সেটাকে খোলে নি।

তারপর এখানে এসে—এই বিনো সেনের আশ্রম বিদ্যালয়ে এসে সে 'আমার' বলে যে বাসা ঘর পেয়েছিল তার মধ্যে সঞ্চয় শুরু করেছিল। প্রথম কিনেছিল ওই সস্তা ব্রাকেটটা। কিছু আসবাব আশ্রম থেকে দেওয়া হয়েছিল, এখানকার শাল কাঠে তৈরী নেয়ারের খাট, একটা টেবিল, দুখানা চেয়ার। তারপর সে অনেক করিয়েছে বরাত দিয়ে—নিজের পচ্ছন্দমত। এই ক'বছরে ঘরখানা ভরে গেছে। এগুলো ফেলে দিয়ে যাবে। শুধু বাক্স ব্যাগ নিয়ে তিনটে আর একটা বিছানা। একটা কাঠের প্যাকিং বাক্সে বইগুলো। বাস। সে গোছাতে শুরু করে দিলে। কয়েক মিনিট গুছিয়েই সব রেখে ঘর খুলে বেরিয়ে এল। হাতে টর্চটা নিয়েই বেরিয়েছিল—সেটা জ্বেলে এগিয়ে চলল।

এল বিনো সেনের ঘরের দিকেই। বিনো সেন বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিমা নেই, সেনের বৃদ্ধ অধ্যাপক এখানকার রেক্টর, তিনি নেই, অনিমা দি নেই, কেউ নেই।

নীরা একটু দূর থেকেই তাঁকে দেখে একবার থমকে দাঁড়িয়ে ছিল। তারপর ঘৃণা, ক্রোধ, চক্ষুলজ্জা মিলিয়ে যে এক বিচিত্র জটিল সঙ্কোচের বাধা অতিক্রম ক'রে সে তাকে অতিক্রম করেই চলে গেল। যেন লক্ষ্যই করলে না তাকে। কিন্তু বিনো সেন আশ্চর্য মানুষ; লজ্জাহীন মর্যাদাহীন না কি সে অনুমান করতে পারলে না নীরা; তিনি নিজেই তাকে ডেকে বললেন, আপনি কি মাষ্টার মশাইয়ের ওখানে যাচ্ছেন? গাড়ীর জন্যে?

নীরা থমকে দাঁড়াল কিন্তু তার দিকে ফিরল না। বললে হ্যাঁ। আমি রাত্রেই চলে যাব।

—হ্যাঁ অনিমাদি আমাকে বলে গেছেন। বলছিলেন আমাকে রাত্রে যেতে যেন বারণ করি। কিন্তু না, এক্ষেত্রে আপনি অন্তরে অস্বস্তি বোধ করবেন। আমি কুড়োরামকে সাম্পানি খানা তৈরী করতে বলেছি। সে তৈরী করছে। আর আপনার মাইনে ইত্যাদি গুলোরও হিসেব করতে বলে দিয়েছি রতনবাবুকে। তিনিও যাবেন আপনার কাছে অল্পক্ষণের মধ্যেই।

কয়েকটা মুহূর্ত নীরা যে নীরা সেও উত্তর দিতে না পেরে নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর যেন একটি কথা খুঁজে পেয়ে বেঁচে গেল। হঠাৎ ধন্যবাদ কথাটা জুগিয়ে দিয়ে তার মনের মধ্যে থেকে তার অন্তরতম স্বত্বা বলে উঠল—ধন্যবাদটা দাও। বেঁচে গেল সে।

ধন্যবাদ। বলেই সে ঘুরল এবং হন হন্ করে এসে আপনার

বারান্দায় উঠল। মনে হল সে এইটুকুতেই হাঁপিয়ে উঠেছে। মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে থেকে যেন সামলে নিলে। সন্ধ্যায় তুরন্ত ক্রোধে ক্ষোভে সে বিনো সেনের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধ করে এমন হাঁপিয়ে ওঠে নি। বিনো সেনের ওই আপনি সম্বোধনটা যেন তাকে একটা প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। কেন তা বলতে পারবে না। তবে হেনেছে। না পারবে নাই বা কেন? লোকটিকে শ্রদ্ধা করেছে প্রথম দিন থেকেই। এই বহুরূপী মুখোসপরা মানুষটি কি মনোহরভাবেই মনোহর পটভূমিতে আনন্দময় পরিবেশের মধ্যে তার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন! মনে পড়ে গেল!

* * *

মনের রঙ্গমঞ্চের যবনিকা আবার উঠে গেল। মনের রঙ্গমঞ্চে স্মৃতির প্রযোজনায় একবার নাটক শুরু হ'লে আর যেখানে ইচ্ছে সেখানেই তো ছেদ টানা যায় না। বিশেষ ক'রে যদি মর্মে আঘাত লেগে থাকে। মর্মান্তিক আঘাতে ক্ষুব্ধ স্মৃতি সে দিন ওই নাটকের মধ্য থেকে হিসেব নিকেশ ক'রে দেখে।

যবনিকা উঠছে।

তৃতীয় অঙ্ক, যে অঙ্ক আজ শেষ হল সেই অঙ্কের প্রথম। বিয়ের আসর থেকে সে বেরিয়ে এসেছিল আশ্চর্য সাহসে ভর ক'রে। আশ্চর্য আর কি? সোমেশবাবু, অজিতদা মীনাক্ষীদের প্রতারণায় প্রবঞ্চনায় ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল সে। শৈশব থেকে সে মার খেয়ে কখনও চুপ করে থাকে নি। সেও মেরেছে। না-হলে হয়তো ছাদ থেকে ঝাঁপ খেতো, কাপড়ে আগুন লাগাতো, নয় তো কাঁদতো, অজ্ঞান হয়ে যেতো তারপর আত্মসমর্পণ করতো। কিন্তু চিতাবাঘিনী তখন কৈশোর

অতিক্রম করেছে, নিজের শক্তিকে জেনেছে—তার উপর হিংস্র স্বভাব যেমনটি তাকে করিয়েছে তেমনটি করেছে। সে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ীর সামনে বাঁধা প্যাণ্ডেলটা পার হয়ে।

রাস্তায় তখন ভিড় জমেছে। সে থমকে দাঁড়িয়ে বারেকের জন্য ভেবে নিয়েছিল। কি করবে? কোথায় যাবে? কুণ্ডুমশায় এ বাড়ি ছেড়ে বালিগঞ্জে বাড়ি করে উঠে গেছেন। না-হলে আজ হয়তো প্যাণ্ডেলেই তার সঙ্গে দেখা হ'ত। তিনি সাহায্য করতেন। তবে? যাবে কোথায়? কিন্তু দাঁড়িয়ে ভাববারও সময় নেই। পিছনে শিকারীর দলের সামনে চিতাবাঘিনীর মতই গর্জন করে বেরিয়ে এসেছে। যে কোন মুহূর্তে আবার আক্রমণ আসতে পারে। জেঠীমার চীৎকার শোনা যাচ্ছে।—নীরা—নীরা! লগ্ন ভস্ম হবে। নীরা।

নীরা সামনের জনতার দিকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে তাকিয়ে বললে—যেতে দিন আমাকে। পথ ছাড়ুন!

হাতের ছোরাখানা নিয়ে আস্ফালন সে করে নি—কিন্তু সেখানা হাতেই আছে। বের করাই আছে।

পথ তারা ছেড়েই দিয়েছিল। বেশ সম্ভ্রম করেই ছেড়ে দিয়েছিল।

একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—কিন্তু কোথায় যাবেন?

মুহূর্তে মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল—থানায়। পুলিসের কাছে যাব।

ভুল করে নি সে। ভুল হয় নি তার। মুহূর্তে নিজেই বুঝেছিল—ওইখানেই সে সব থেকে নিরাপদ হতে পারবে। হ্যাঁ পুলিসের কাছে যাবে।

এইটু এগিয়ে এসেই চার রাস্তার মোড়। বড় রাস্তায় বাস চলে। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে ছিল।

* * *

জিনিস গোছাতে গোছাতেই মনে হচ্ছিল সব। পুরনো কাপড় চোপড়, ছোট ছোট কত টুকিটাকি—ছুড়ে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছিল। সঞ্চয় তার জন্য নয়। সকল তুচ্ছ সঞ্চয়কে ফেলেই তাকে যেতে হবে এই তার নিয়তি।

এটা সেই সেই দিনের কাপড়খানা। এই কাপড় এই ব্লাউস পরেই সে ঘর থেকে বেরিয়েছিল।

চৌরাস্তার বহু জনের দৃষ্টি তার দিকে পড়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল। হওয়ারই কথা। বেনারসী শাড়ী ব্লাউস বদলেও নতুন কাপড় জামায় সেদিনের বিশেষ রূপটি সম্পূর্ণ বদলায় নি; মুখের চন্দন তিলক চোখের কাজল অনেক জোরে ঘষে মুছলেও সে শোভার প্রকাশ মেঘাচ্ছন্ন শুক্লা পূর্ণিমার মতই আভাসে বোঝা যাচ্ছিল। চঞ্চল হয়ে উঠেছিল সে লোকজনের দৃষ্টি দেখে। রাত্রি তখন বেশী হয় নি। সাড়ে সাতটা। পথে লোকজন অনেক। কিন্তু পৃথিবী বৈচিত্রময়ী।

আলোর মধ্যে ছায়ায় বিচিত্রিত। অন্ধকার রাত্রে আকাশের তারায়, বনে-লাগা আগুনে, জোনাকী পোকায়, মানুষের জ্বালা আলোয় ঝলমল। আলো অন্ধকারের মত ভালোমন্দ সব জায়গায় আছে। মানুষের ভিতরে আছে—বাইরের জগতে আছে। সেদিনও দুটি ছেলে সেই মুহূর্তে পাশে এসে বলেছিল—কোন ভয় নেই দিদি। আমরা আছি। আমরা রণজিতের বন্ধু।

একজন বলেছিল—আপনি আমাকে চেনেন। একদিন বোমা এনেছিলাম রণজিতের সঙ্গে গিয়ে।

তবু সন্দেহের চোখে সে দেখেছিল। তবে সাহস ছিল তার, আত্মহত্যা যে করে তার যে সাহস থাকে তাই তার ছিল। ছোরাখানাও ছিল। তখন সেখানা কোমরে গুঁজেছে।

আর একটি ছেলে বলেছিল—বিশ্বাস করুন। আপনি বোন। আমরা ভাই। মৃদুস্বরেই বলেছিল সে।

আমরা আপনাদের বাড়ির ওখান থেকেই বরাবর সঙ্গে সঙ্গেই আসছি। আমরা গোলমাল শুনেই গিয়েছিলাম। বিয়ে ভাঙব বলেই গিয়েছিলাম। আপনি নিজেই ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে এলেন। প্রণাম করতে ইচ্ছে করছে আপনাকে। আপনি কোথায় যাবেন বলুন, আমরা সঙ্গে গিয়ে পৌঁছে দি। মনা ঘোষ এমনটা হবে ভাবে নি। অজিতবাবু তাকে টাকা দিয়ে চুপ করিয়ে রেখেছিল। না হলে এতক্ষণ বেগ পেতেন আপনি। চলুন, দাঁড়াবেন না। থানায় চলুন। এই দিকে।

সে বলেছিল না। কলকাতার কোন থানায় আমাকে পৌঁছে দিন।

এখানকার থানায় অজিতদার আলাপ আছে। এসে হয় তো—

সেই মুহূর্তেই একখানা বাস এসে পড়েছিল। তারাই তাকে নিয়ে উঠে পড়েছিল পরমাত্মীয়ের মত।

সে তাদের বিপদাপন্নের অসহায় অবস্থায় বিশ্বাস করার মত বিশ্বাস করে নি; বানের জলে ভেসে যাওয়া মানুষের তৃণগুচ্ছ বা খড়ের আটি আঁকড়ে ধরার মত ধরে নি তাদের। মনের বিশ্বাসে সে স্থির জেনে তাদের সাহায্য নিয়েছিল।

তারা তাই পৌঁছে দিয়েছিল উত্তর কলিকাতার এক থানায় বিনা ভূমিকায় ইনস্পেক্টরকে সে বলেছিল, আমি বিয়ের আসর থেকে উঠে এসেছি, আমার বাপ নেই, মা নেই, ভাই বোন কেউ নেই, আছে জাঠতুতো ভাইয়েরা, ষড়যন্ত্র করে এক বড়লোকের পাষণ্ড ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চায়। স্বার্থ, ওই বড়লোকের কাছে তাদের দেনা আছে। তা থেকে রেহাই পাবে। এসব কথা বিয়ের আসরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। পাত্রের গোপনে বিয়ে করা বউ এসে হাজির হয়েছেন, আমি বেরিয়ে চলে এসেছি ছোরা দেখিয়ে। আমার বয়স উনিশ পূর্ণ হয়ে কুড়ি চলছে। এবার আই-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আমি আশ্রয়ের জন্য এসেছি। আমাকে—

ইনস্পেক্টর বাধা দিয়ে চট করে প্রশ্নও করেছিলেন—তা বিয়ে তো কাউকে করতে হবে, বল কাকে বিয়ে করতে চাও? মানে কে তোমাকে বিয়ে করে এ বিপদে রক্ষা করতে পারে বল? থানা না হয় এক দিনের আশ্রয়। নাম কর তাকে খবর দি।

সে বলেছিল—না। কাউকে না। তেমন কাউকে আমি জানিনে চিনিনে। কেউ বিয়ে করতে চাইলেও আমি বিয়ে করব না।

—করবে না?

—না। সে যে পাষণ্ড বদমাস নয় তা কি করে জানব?

—হুঁ। কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে ইনস্পেক্টর বলেছিলেন—বিয়ের জন্যে তো সারাদিন খাওনি কিছু। উপবাস করে আছ। কিছু খাও, কেমন? চল আমার কোয়ার্টারে—আমার মা আছেন, স্ত্রী আছেন, ছেলেরা আছে, সেখানে চল। কিছু খাবে আর সব বলবে।

আপত্তি করে নি নীরা। সেখানে বসে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে সব শুনেছিলেন ইনস্পেক্টর। শুনে বলেছিলেন, তাই ত মা, তুমি তো কঠিন মেয়ে। চল—একবার থানায় চল, একটা কেস লিখে নি। সোমেশ চাটুজ্জেকে আমি জানি অজিত মুখুজ্জে এণাক্ষী এদেরও জানি। তোমাকে বাঁচাতে আমার মাথাটা বাঁচিয়ে রাখি।

ডাইরী লিখতে লিখতে হঠাৎ বলেছিলেন, তা তুমি গয়নাগুলো খুলে দিয়ে এলে কেন? সেগুলো কি দোষ করলে? সে সব তো তোমার বাপের টাকায়।

—না ইচ্ছে হল না। সমস্ত দেহমনই কেমন যেন ঘিন ঘিন

—ঘিন ঘিন করছিল? বাঃ। চল এখন বাড়িতে আমার মায়ের কাছে শোবে। কেমন?

পরের দিন তিনি দমদম এলাকার থানায় ফোন করে ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিয়েছিলেন। হেসে বলেছিলেন, সোমেশবাবুর ছেলের বিয়ে আটকায়নি মা, এ কন্যাদায়ের দেশে সমারোহের সঙ্গেই হয়ে গেছে। এবং ছেলেটি তার পূর্ব বিয়ের কথা বেমালুম দিব্যি করে অস্বীকার করেছে, বলেছে, সে বিয়ে করে নি। পাত্রী ওই তোমাদের পাড়াতেই জুটে গেছে। অজিতবাবুই দেখেশুনে জুটিয়েছেন। তারা আর তোমাকে খোঁজেনও না, দাবীও করেন না। মামলা নেই, চুকে গেছে। সুতরাং এখন তুমি মুক্ত। কোথায় যাবে বল?

মনে পড়েছিল তার কুণ্ডুবাবুর কথা। কুণ্ডুবাবুর নামও ইন্স্পেক্টরের অপরিচিত ছিল না। বলেছিলেন—তাকেও তো জানি মা। সেখানে যাবে?

—তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। আমার ভালো দেখতেন। ইনস্‌পেক্টর হেসে বলেছিলেন—তা দেখতেন। তখন তার গরজ ছিল বাড়িতে তোমার অংশটার জন্যে। আর—বাবার বন্ধু বলছ—তা তোমার জ্যেঠামশায় তো তোমার বাপের সহোদর ছিলেন।

কথাটা ঠিক বুঝতে পারে নি নীরা। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তার মুখের দিকে।

ইনস্‌পেক্টর বলেছিলেন—কুণ্ডুবাবু যুদ্ধের বাজারে বহু লক্ষ টাকা কামিয়ে এখন কলকাতার বনেদীবাবুদের চাল ধরেছেন। লোকটি কোনদিনই ভাল ছিল না। তখন যা গোপনে করত এখন প্রকাশ্যে করছে। তখন ছিল জোনাকী পোকা এখন হয়েছে চাঁদ। কলঙ্ক তার শোভা। আমার এলাকাতেই তার একখানা বাড়ি আছে। সেই বাড়িতেই আজকাল রাত্রে এসে থাকে। নানাজনের কাছে নানান রিপোর্ট পাচ্ছি। এখনও ঠিক কিছু বলতে পারি না। তাছাড়া তার এক ছেলে বিলেত ঘুরে এসেছে এই কিছুদিন হল। এর মধ্যে বার তিনেক ধরা পড়েছে মাতাল অবস্থায় চৌরিঙ্গীর হোটেলে ফিরিঙ্গী মেয়ের সঙ্গে। তুমি এমন ভাল মেয়ে—ভুল করে আবার গিয়ে বিপদে পড়বে ?

নীরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীর সব মানুষই তবে এই রকম ? তবে সে যাবে কোথায় ? মনে আছে সব যেন কালো হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছিল। বিশ্রী কালো কুৎসিৎ কদর্য বীভৎস !

ইনস্‌পেক্টর বলেছিলেন ভেবে দেখ মা। মনটা শান্ত কর। আমি আপিসে যাচ্ছি এখন, পরে বলো। এখানে তুমি থাকতে কিন্তু

ভেবো না। ঘর মনে ক'রে থাক। অন্তত কয়েক ঘণ্টা যতক্ষণ ভাবতে লাগে। কেমন?

নীরার চোখে সত্যই অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। সেই অন্ধকারের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল—তাই তো মুক্তি তো নিশ্চিন্ততা নয়। কোথায় যাবে সে? কলকাতার পথ উত্তরে-দক্ষিণে পূর্ব-পশ্চিমে সহস্র শাখায় ছড়িয়েছে। দক্ষিণে টালিগঞ্জ, মাঝপথে ভেঙে ডালহৌসি স্কোয়ার, আপিস—হাজার হাজার মেয়েরা ছোটে। আরও উত্তরে এসে বিডন স্ট্রীট থেকে চিৎপুর ধরে শতবর্ষব্যাপী নারী-জীবনের নরক। পূর্বদিকে কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে ইউনিভার্সিটি। কিন্তু ইনস্‌পেক্টরের কাছে কুণ্ডুবাবুর কথা শুনে মনে হচ্ছে পথে পথে সতর্ক-দৃষ্টি, শ্বাপদের মত মানুষ। মনা ঘোষ, মনা ঘোষ, মনা ঘোষ, অজিতদা দিব্যেন্দু এরাই নানান চেহারায় নানান নামে ছেয়ে ফেলেছে কলকাতা। যাওয়া তো সহজ নয়। তবে একটা লক্ষ্য তার স্থির আছে;—যাবে সে ইউনিভার্সিটির দিকেই। জীবনে সে লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়নি একবার ছাড়া, অর্থাৎ ওই বিয়েতে মত দেওয়ার বারটা ছাড়া। আর হবে না। কিন্তু আশ্রয়?

আজ মা-বাপকে মনে পড়ছে। কিন্তু সে কাঁদে নি। অসীম সাহসের সঙ্গে ভাঙা আকাশ মাথায় নিয়ে সে সেই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে ভেবেছিল, আশ্রয়?

হঠাৎ মনে হয়েছিল অনাথ আশ্রমের কথা। রেস্ক্যু হোম। উদ্ধার আশ্রম। সেখানে, সেখানে আশ্রয় পেতে পারে না সে? সরকারী আশ্রমের কথাও শুনেছে। তাই যাবে সে!

ইনস্‌পেক্টরকেও সে তাই বলেছিল—আমাকে আপনি কোন

ভাল অনাথ আশ্রম বা রেস্ক্যু হোম দেখে পাঠিয়ে দিন। যেখানে আমি পড়াশুনা করবার সুবিধে পেতে পারি। আমি পড়ব।

—অনাথ আশ্রম, রেস্ক্যু হোম—ঠিক তোমার মত মেয়ের জায়গা নয় মা। তারা একটু অন্য ধাতের মেয়ে। অন্য জাত বললেই ঠিক বলা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাকে বলে ফলেন গার্লস। অত্যাচারিত অন্যভাবে।

—আমাদের নিজেদের না থাকে কৃশ্চানদের আছে শুনেছি। নেই ?

—তা আছে। ওদের যত গালই দিই ওদের এসব আছে। এদেশের রাজ্য ছেড়েছে কিন্তু ওগুলি বজায় রেখেছে। কিন্তু সেখানেও ওদের ধর্মের দাবী আছে। call of Christ আছে।

—আমি কৃশ্চান হব।

—কৃশ্চান হবে ?

—হ্যাঁ। প্রাণ মান দুই যদি বাঁচে তবে কেন হব না!

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ইনস্পেক্টর। তারপর হঠাৎ বললেন—হুঁ! একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হয় নি। সেটা তো জানা দরকার।

দৃষ্টি একটু যেন কঠিন হয়ে উঠেছিল ইনস্পেক্টরের।

নীরার ভ্রূতে বোধ করি তার প্রতিচ্ছায়াও পড়েছিল, সে শান্ত ধীর কণ্ঠে এতক্ষণের সমস্ত জলীয় অংশ মুহূর্তে নিংড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিল—বলুন।

ইনস্পেক্টর এবার হেসেই বলেছিলেন—তুমি একালে এমন একটা বেশ কড়াধাতের মেয়ে। তোমার তো একটা ঝাণ্ডা থাকা উচিত।

—কিসের ঝাণ্ডা ?

—politics গো। তোমার ঝাণ্ডাটা কি বল তো? লাল না তেরঙ্গা ?

একটু বক্র অবজ্ঞার হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে। বলেছিল—আমার ঝাণ্ডা আমার নিজের। কাস্তেও না হাতুড়ীও না চরকাও না। ওখানে আমার নিজের হাসি মুখ। আমি রাজনীতি করি নি। সময়ও পাই নি। ভালও লাগে না।

এবার ইনস্‌পেক্টর উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—গুড। তুমি হাঁ করে বলে দিলে কৃশ্চান হয়ে যাবে তাই জিজ্ঞাসা করলাম। ওটাই একালের রাজনীতির বড় লক্ষণ তো। তা বেশ। আমি মনে মনে তোমার জন্যে একটা আশ্রম ঠিক করেছি। সেখানে ছেলে মানে বাচ্চাদের পড়াবে। ঘরের মেয়ের মত থাকবে। কলেজে আমি দেখব ফ্রি করে দিতে পারি কিনা। তবে তোমার মান সম্মান সব নিরাপদ। আমি গ্যারাণ্টি দিচ্ছি। কেমন যাবে ?

একটু ভেবে সে বলেছিল —যাব।

—গুড। এস আমার সঙ্গে। দেখি তোমার অদৃষ্ট আর আমার পুণ্য। এস।

গাড়িতে চড়িয়ে শহরের উত্তর প্রান্তে নিয়ে এলেন একটা বাড়িতে। মাঝারি একখানি বাড়ি। ডাকলেন, দাদা আছেন ? দাদা ?

—কে ? বেরিয়ে এলেন কৃষ্ণকায় শীর্ণ বৃদ্ধ।—ইনস্‌পেক্টরকে সমাদর করে আহ্বান জানিয়ে বললেন—আরে ঘোষাল ভাই, কি ব্যাপার ? ওয়ারেণ্ট আছে না কি ? এদের কার নামে বলতো ? না খোদ সর্দারের নামে ?

পিছনে একটি দল বাচ্ছা-বাহিনী। তের চৌদ্দ হতে বছর চারেকের পর্যন্ত।

—এদের আজ সব কটাকে নিয়ে যাব।

বড়গুলি হাসতে লাগল। ছোট চারটির বড়টি ছুটে পালাবার সময় চিৎকার করলে—লড়াই লড়াই। অস্ত্র অস্ত্র!

ঘোষাল এবার বললে দাদা এই খুকীটিকে নিয়ে এসেছি। শুনুন বিবরণ। এ মেয়ে কঠিন মেয়ে, আপনার ঘরে তো অনেক বাচ্ছা খুদে ডাকাতের দল। ছোটগুলিকে পড়াবে আর থাকবে। আপনার আশ্রয়ে দিয়ে আমি নিজের কাছে জবাবদিহি করতে পারি, এমন মেয়েটাকে সত্যি ভাল জায়গায় দিতে পারলাম। শুনুন বিবরণ।

বিবরণ শুনে তিনি বলেছিলেন—বহুত আচ্ছা। বাহবা কন্যা! ধন্যা ধন্যা! তোমার পায়ের ধুলোয় পবিত্র হল ঘর। থাক তুমি এখানে। ওই ছোট দৈত্য তিনটেকে পড়াও, পাড়াতে দেখে শুনে আর কয়েকটা জোগাড় হয়ে যাবে। নিজে পড়। এই আমার বাড়ির সামনে দিয়ে রোজ একটি ছোটখাটো আকারের বেণী ঝুলিয়ে ঘড়ির কাঁটার মত যায় আসে। সে ওই ছেলে পড়ায় পাড়ায়। তোমারও হয়ে যাবে।

ঘোষাল বললেন, ইনি কে জান? বিখ্যাত আর্টিস্ট শিবনাথ বাড়ুজ্জে।

—না না না। ঘোষাল কিচ্ছু জানে না। আমি তো আসল পরিচয় দিইনে। তোমাকে দিই। আমি ভাই সাক্ষাৎ পিতামহ ব্রহ্মা। এই যে দল দেখছ এরাই সব নয়, আরও আছে, পাশে বড় মেয়ে থাকেন, তাঁর আছে চার, তিন কন্যা এক পুত্র। এক পুত্র থাকেন

রানীগঞ্জে, তাঁর তিন। কনিষ্ঠার এক। ওদের বন্ধু—তারা বলে পিতামহ। সামনে গুর্খা ক্যাম্প, তাদের ছেলেগুলো ঘোরে ফেরে তারা শুনে শুনে জেনেছে এর নাম পিতামহ। আমার সামনের এই ড্রেন, এতে যখন বর্ষার জল চলে, তখন তারা এসে শুয়ে পড়ে সাঁতার কাটে, আর চেঁচায়, আও পিতামহ (দাদু) পানিয়া মে সাঁতার খেলো। এর মধ্যে দেবতা আছে, দৈত্য আছে, যক্ষ আছে রক্ষ আছে, কিন্নর গন্ধর্ব রাক্ষস নরবানর সব আছে। আমি পিতামহ ব্রহ্মা। বাড়িটির মধ্যে অহরহ চলছে পুরাণের পালা। সমুদ্রমন্থন। দুটো বাদাম, চারটে ছোলা, একটা পেরেক বা নাট বল্টু নিয়ে চলেছে মহা সংগ্রাম। তা তুমি এলে, তুমি নীলা, সাক্ষাৎ মোহিনী হয়ে এদের বিবাদ ভঞ্জন করবে, থাকবে। ঠিক হয়েছে।

বক্তৃতার ভঙ্গিতে, যাত্রা থিয়েটারের বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললেন বৃদ্ধ শিল্পী। চিত্ত তার ভরে গেল।

ঘোষাল বললেন, আমি নিশ্চিন্ত। শুধু তুমি আশ্রয় পেলে না, একজন অমর শিল্পীর—

বাধা দিয়ে বৃদ্ধ আবার বক্তৃতা শুরু করে দিলেন—মূঢ়, তুমি মূঢ়। এই ডাকাতের দল আমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। কেউ ভাল কেউ মন্দ, কেউ দেবতা কেউ পাষণ্ড। কেউবা কালো কেউ ধলো—আঁটোসাঁটো এলোমেলো সিঁটকে রোগা মোটাসোটা হাবাগোবা চালাক চতুর বুঝলে না—এদের জন্য কেউ বললেন ধন্য ধন্য, এমন পিতামহ না-হলে এমন নাতি! কেউ বলেন এমন কুচক্রী, মন্দ ঠাকুরদা না হলে এমন নাতি! এক অঙ্গে চন্দন এক অঙ্গে পঙ্ক মেখে, আমিও বলব ধন্যোহং, আমি অমর পিতামহ। এখন ভাই তুমি ধন্য কন্যা, ধন্যা ধন্যা—সাক্ষাৎ

মোহিনী তুমি—তুমি এসেছ, দেখ তোমার মোহে যদি দৈত্যেরা দেবতা হয়। আমার দুই অঙ্গে চন্দনের ব্যবস্থা হয়। নীরা তাঁকে আপনা থেকে একটি প্রণাম করেছিল। ব্যবস্থা থাকলে এইখানে আলোর বৈচিত্রে ছেদ টেনে বুঝিয়ে দিয়ো খানিকটা নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের পর একটি নাটকীয়তা-হীন, সংঘাতহীন একটানা জীবন চলছে শান্ত সুখকল্লোল ধ্বনি তুলে।

পূর্ণ দেড় বছর এখানে তার কেটেছিল। জীবননাট্যে অনেক দুর্যোগময় পরিবেশ এবং অনেক যন্ত্রণাময় যুদ্ধের নাট্যপ্রবাহের পর এটি একটি সুন্দর প্রভাত। মেঘ নাই, মাটি ভিজে নরম, কিন্তু পিচ্ছিল নয়, পাখিরা কলরব করে আকাশে ডানা মেলেছে; তারই মধ্যে একটি বাউল একতারা হাতে গান গাইছে—

"কাঁদিস কেন ও পোড়া মন
'রাধে' বলে নাচনা কেন ?
এমন মানব জনম আর পাবিনে—
সাধে সুখে বাঁচনা কেন ?
ওরে কেঁদে কেঁদে মরিস কেন ?
সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে
মায়া ফাঁদে পড়িস কেন—"

এ ওই বৃদ্ধ শিল্পী শিবনাথ—দাদু পিতামহ! প্রাণে তিনি সুর লাগিয়ে দিয়েছিলেন। গানটি তিনি সত্যিই গাইতেন। গলা ছিল না তবু গাইতেন। অবশ্য বাউল সেজে নয়। তবে পোশাক ছিল

বিচিত্র, লোকে দেখে মুচকে হাসত। শিল্পী শিবনাথের এই পোশাক, এই চেহারা। খালি-গা, গলায় রাঁধুনীবামুনের মত মালার ঢঙে পৈতে, থান-কাপড় ডবল করে লুঙ্গির মত পরা, খালি পা, শীর্ণকায় কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধের হাতে মাটি পায়ে ধুলো। ওই এক ধরনের বাউল গুণ গুণ করে গাইতেন। গানটা ওরই রচিত। বৃহৎ সংসার, তিন ভাইপো, পুত্রকন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী চাকর ঠাকুর ঝি নিয়ে ছিল তেইশ, তাকে নিয়ে হয়েছিল চব্বিশ। এ ছাড়া বাড়তি একজন দুজন আছেনই। কেউ তার সাক্ষাৎ মা কালী, কেউ শনিঠাকুর, কেউ দুর্গা কেউ লক্ষ্মী, অবশ্য ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে। বাড়ির গৃহিণী ওদের দেখলেই চেনেন, সকালে আটটা থেকে ভাত খাওয়া শুরু, রাত্রি একটায় শেষ। পিতামহ মিথ্যে বলেন নি বাড়িতে উপরে নিচে ঘরে দালানে খাটের তলায়, ছাদে ওই নাতিগুলোর মধ্যে অহরহ দেবাসুর সংগ্রাম চলছেই চলছেই। বাড়ির ভিতরেই দর-দালানে সামনের প্যাসেজেই চলছে ফুটবলের ভলিবলের ক্রিকেটের সংগ্রাম। আবার যখন ওদের বন্ধুরাও জোটে তখন সেটা পাশের মাঠ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পাশেই বড় মেয়ের ছেলেও এসে জোটে। তার তিন মেয়ে আসে। বড় মেয়েটি এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠা। আশ্চর্য গুণবতী প্রতিভাশালিনী মেয়ে। দাদুই নাম রেখেছিলেন শকুন্তলা—এখন বলেন সরস্বতী। আর দুজন মণি রুণি। মণি মাধবী, বাস্তববাদিনী, রুণিকে বলেন অপ্সরী কারণ সে প্রায় অনবরতই নাচে। আর একজন আছে ছোট ছেলের বড় মেয়ে মঞ্জু, সে মধ্যে মধ্যে বাপের কর্মস্থল থেকে মায়ের সঙ্গে আসে,—সেও ভাই—নাচে। আর একটি সর্বকনিষ্ঠা কন্যার প্রথম কন্যা বছর দেড়েক বয়েস তার নাম লালমোহিনী। দাদু ছড়া বেঁধেছে—

"লালমোহিনী রাধে

লালমোহিনী মান করেছে বংশীবদন সাধে।"

বড় নাতিকে বলেন দেবরাজ, বড় দৌহিত্রকে বলেন জেণ্টেলম্যান। মেজ পৌত্র 'মহারুদ্র' তৃতীয় নাতিটি বড় ভাল। শান্ত মানুষ। মধুর মানুষ। তার পরেরটির অনেক নাম—বুদ্ধিমান, জ্ঞানবৃদ্ধ—কথাটা মিথ্যে নয়, পুরাণের গল্প শুনে কণ্ঠস্থ করেছে, কখনও হয় রাম কখনও হয় অর্জুন, কখনও বৃদ্ধও সাজে; এবং দুষ্টবুদ্ধির অন্ত নেই। দোতলা থেকে পড়ে কপাল কাটে, পথে পড়ে থুতনি কাটে। তার ছোটটি শ্যাম, এটি ওরই চাপে পৃথিবীর মত উত্তর-দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপার মত একটু ম্লান লোভী, কিছু পেলে ভাঁড়ারের চাল নিয়ে ভিজিয়ে খায়। গোটা রেশনের চালে জল ঢেলে দেয়। তার পরেরটা দিনরাত্রি ছুতোয় নাতায় চেঁচায়; হাতে পেরেক স্ক্রু-ডাইভার ছুরি, কাটারি নিড়েন, একটা কিছু চাই-ই। বছর চারেক বয়েস এর মধ্যে মায়ের ড্রেসিং টেবিলটা পেরেক ঠুকে ভেঙেছে। ডাক্তার আসছেই আসছেই। এর জ্বর, ওর পা কেটেছে, ওর টনসিল। আর দাদুর অসুখ লেগেই আছে। মধ্যে মধ্যে সন্দেহ হয়, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত। তবে শরীর অসুস্থ তাতে সন্দেহ নেই। বড় ভাই-পো চাকরে, কিন্তু কাব্যবিভোর। মেজ ভাইপো ডাম্বেল ভাঁজে, কলেজ ইউনিয়নে সেক্রেটারি, আপন মেজাজে আছে, তার পরেরটি ঘাড় গুঁজে পড়ে একটু গোঁয়ার, কিন্তু বেশ লোক। বড় জামাইটি আশ্চর্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি। ছোট জামাই ডাক্তার। বড় ছেলে ভাল চাকরি করেন। সুখের সংসার। সব সুখ ওই মানুষটাকে কেন্দ্র করে। তবু কলহ বাধে। বড় ছেলের সঙ্গে বাধে, সে তাগাদা দেয় নূতন

কিছু আঁকুন। বলে, আপনি জানেন না, কত বড় শিল্পী আপনি। উনি চটেন। মধ্যে মধ্যে ক্ষেপে যান। মধ্যে মধ্যে মা এবং স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করেন। কারণ তিনি সংসার চালান এখন। সেটা জাহির করেন। দাতুরও স্ত্রীর সঙ্গে বাধে মধ্যে মধ্যে, সে ভীষণ বাধা। তিনি পূজা নিয়েই থাকেন। তবে তাঁর ধারণা দাতু তাঁকে ঠিক তাঁর উপযুক্ত মনোরমা মনে করেন না। দাতুর অধিকাংশ নারীমূর্তির মুখে তাঁর আদল। তারা ছবির ভাববস্তুতে মহিমান্বিত। তবু স্ত্রী বলেন, কি খারাপ করেই আঁকলে তুমি আমাকে। লাগে বিরোধ। তুর্দান্ত বিরোধ। বড় পুত্রবধূ, ঝগড়া সে করে না, তবে মধ্যে মধ্যে না খেয়ে শুয়ে থাকে। বিচিত্র মানুষ, কখনও মনে হয় এ বাড়িতে এসে সে ধন্য হয়েছে, কখনও ভাবে এ বাড়িতে পড়ে তার কোন সাধই মিটল না। বড় মেয়ে পাশে থাকে। বড় জামাই তাকে আশ্চর্য গড়েছে। সুস্থ সবল মন। সকল গৃহকর্ম নিজে হাতে করে হাসিমুখে, ক্লান্তি নাই, বিরক্তি নাই। রোজ সন্ধ্যায় বাপ-মাকে দেখতে আসে। ছোট জামাই ডাক্তার, কৃতী ছেলে, সেও রূপোর চাঁদ নয়, সেও সোনার। ছোট মেয়ে বাপের সর্বপ্রিয় সন্তান। চমৎকার মেয়ে, কিন্তু তাতেও পোকা, সর্বদাই ভয়ে অস্থির তার টি বি হবে। ছোট ছেলে বাইরে থাকে, খুব কৃতী উচ্চাকাঙ্ক্ষী। বাস্তববাদী তুর্বাসা। ছোট বউটি মাটির মানুষ, বড় ভাল। তাদের বড় মেয়েটি নৃত্যপরা— তুটি ছেলে তার একটি ওই বুদ্ধিমানের চ্যালা, অন্যটি বাচ্চা, একটা মোড়া ঠেলে বেড়ানোই তার একমাত্র নেশা। কলরব, কোলাহল, কলহ, হাসি-কান্নার সে এক অহরহ মুখরতার মধ্যে মূল একটি সুর কান পাতলেই ধরা যায়, সে সুর আনন্দের, সে সুর সুখের। সে ওই

মানুষটিকে কেন্দ্র করে। এই দেড় বৎসরে সেও ওই সুরে জীবনের তার বাঁধতে চেয়েছিল। অনেক সময় বেঁধে খুশি হয়ে ভেবেছে, বাস, এইবার সে সুখী হতে পারবে। কিন্তু আশ্চর্য আবার কিছুক্ষণ বা কয়েকদিন পরেই দেখেছে, ঠিক সুরে সুর মিলছে না। এবং আরও আশ্চর্য হয়েছিল, বিচিত্র বেদনাহত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে দেখে। যেন কত বেদনা, কত উদাসীনতা। মধ্যে মধ্যে চোখে জলও পড়তে দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। তবে মনে হয়েছে, ঠিক তারই মত দাদুর মনের মূল সুরটি এদের সঙ্গে পৃথক। স্টুডিয়োয় ঢুকলেই এই বেসুরো মানুষটা আত্মপ্রকাশ করত। উদাস দৃষ্টি বেদনায় আচ্ছন্ন, চোখে জল পড়ে। ও ঘরে সে ঢুকত না। সাহস হত না তার। ভাবত, অনধিকার চর্চা। সে নিজের অধিকারের গণ্ডি লঙ্ঘন কেন করবে? উনি স্টুডিয়োতে ঢুকলে বাড়িটার প্রত্যেকেই প্রহরারত নন্দিকেশ্বরের মত তর্জনী উদ্যত করে শাসন করে—চুপ। ছবি আঁকতে বসেছেন। চুপ। ও ঘরে যাবে না ছেলেরা। নিজেরাও যায় না। উনি বেরিয়ে এলে চুপি চুপি গিয়ে দেখে আসে, কি ছবি আঁকা শুরু করেছেন। কিন্তু হতাশ হয়ে ফিরে আসে, দেখতে পায় ক্যানভাসটা শাদাই আছে। অবশ্য তাগিদে বরাতে কিছু আঁকেন, ওরা হৈ হৈ করে, উনি বিষণ্ণ হাসেন।

এরই মধ্যে সে আই-এ পাস করলে ফার্স্ট ডিভিসনে। সমস্ত কিছুর মধ্যেও আর কিছু না হোক সে পড়াশুনোর সুবিধেটা পেয়েছিল। তা পেয়েছিল। অসুবিধে ছিল, তবু আনন্দের মধ্যেই সহ্য হয়ে গেছে। এঁদের বাড়ি খাওয়া থাকা ছাড়া আর কিছু পেত না, তবে পুজোয় কাপড় জামা দিয়েছিলেন আর পরীক্ষার ফিজটা দিয়েছিলেন।

মাত্র এক বাড়িতে একটি ছেলেকে পড়িয়ে দশ টাকা পেত, তা থেকেই চলেছে কলেজের মাইনে। সম্বল একশো এক টাকার সবটাই খরচ হয়ে দাঁড়ালো তিরিশ টাকা।

পরীক্ষার খবরে সে খুশি হল। ফার্স্ট ডিভিসন, অখুশি হবার নয়। সে সর্বাগ্রে ছুটে গেল দাদুকে প্রণাম করতে। আজ অধিকার অনধিকার বিবেচনা করলে না, গিয়ে ঢুকল স্টুডিয়োতে। উনি চুপ করে বসেছিলেন। সামনে ইজেলে ফ্রেমে আঁটা কাপড়, তুলিটা নামানো, উনি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছেন। একটু চঞ্চল পদেই সে ঢুকেছিল, তবুও তাঁর তন্ময়তা ভঙ্গ হয়নি। অকারণে একটু কেশে সে বলেছিল, দাদু!

—কে? ও। কি খবর? কিছু সৌভাগ্য নিশ্চয়, তুমি তো কখনও এঘরে ঢোক না!

—আমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছি দাদু!

—বাঃ। বহুত আচ্ছা।

নীরা এবার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলেছিল, কিন্তু এইবার যে বড় ভাবনা হল দাদু। এরপর?

—পড়। পড়ে যাও।

—পড়া ঠিক এই রকম করে হয় না দাদু! তা ছাড়া—থাক দাদু।

—কেন ভাবছ আমি ভাবব ইঙ্গিতে তুমি আমার উপর চেপে বসতে চাও? না, তা ভাবব না। তোমাকে চিনি।

চুপ করে একটু বসে থেকে সে প্রসঙ্গটা পরিবর্তনের জন্যই বললে, কই, আঁকেননি তো কিছু? একটা দাগও পড়েনি।

—নাঃ।

—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব দাদু ?

—কর। বল।

—বাড়িতে প্রায়ই শুনি। আর-আপনি তাগিদ ছাড়া বরাত ছাড়া ছবি আঁকেন না। মানে নিজের কল্পনায়। কেন ?

মুখের দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নীরা সাহস করে বললে, দাদু !

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, যা আঁকতে চাই তা যে কল্পনা করতে পারছিনে। নীরা, সংসারে রূপ অপরূপ। অনেক এঁকেছি। দেখেছি, এঁকেছি। অরণ্য এঁকেছি, পাহাড় এঁকেছি, সমুদ্র এঁকেছি, আকাশে সূর্য চন্দ্র, সূর্যাস্ত সূর্যোদয়, প্রতিপদ পূর্ণিমার চাঁদ এঁকেছি, লতা গাছ ফুল মানুষ, মা প্রিয়া পূজারিণী বিধবা, শিশু যুবক বৃদ্ধ, অনাথ বিদ্রোহী প্রেমিক, মৃত্যু ভাবনারত, মৃত, সদ্যপ্রসূত, দেখলাম আর আঁকলাম। ঝড় এঁকেছি, আলো এঁকেছি, অন্ধকার এঁকেছি। বুদ্ধ এঁকেছি, ক্রাইস্ট এঁকেছি, গান্ধী এঁকেছি, রবীন্দ্রনাথ এঁকেছি, সুভাষ-চন্দ্র এঁকেছি। অনেক নাম, অনেক যশ, তার সঙ্গে অর্থও অনেক পেয়েছি। কিন্তু নিজে কি আঁকলাম ? অথবা এ সবের পিছনে যিনি বা যা একটা কিছু তাকে কই আঁকলাম ? পাচ্ছি না যে তাকে। যা বা যিনির মধ্যে এ সব আছে, সেই বিশ্বরূপ ! কিসের শিল্পী আমি নীরা, তাঁকে আমি কল্পনা করতে পারিনে, তাঁকে আঁকতে পারিনে। মিছে—আমার সব মিছে হয়েছে। তাই তুলি ফেলে দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে শুধু ভাবি, আর কাঁদি আমি নীরা।

বলে আকাশের দিকেই চাইলেন আবার। নীরা সন্তর্পিত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল। তিনি অবশ্য ফিরেও তাকালেন না।

এই দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। মধুর তবু প্রচ্ছন্ন বেদনা আছে। তা থাক। বেদনায় মাধুর্যে, পৃথিবীর দিনরাত্রির মত সহজ আনন্দে প্রসন্ন।

আরম্ভ হল যেন রাত্রির পর দিন।

দ্বিতীয় দৃশ্য। প্রভাত যেন দ্বিপ্রহরের পথে অগ্রসর হচ্ছে। ডাক পড়ছে চারদিক থেকে, ঘণ্টা পড়ছে ইস্কুলে। আপিসে আপিসে লোক ছুটছে। দরজা খুলছে। সে চিন্তায় পড়েছিল। এখানে থেকে কি করবে সে? এখানে এদের কাজ কিছু নেই। ছেলেরা ঠিক তার কাছে পড়ে না। নামমাত্র বসে। তারপর উঠে যায় ওদের কাকু শিবনাথবাবুর বড় ভাইপোর কাছে।

হঠাৎ সেদিন সে চমকে উঠল। দাদু উল্লাসে চীৎকার করছেন, বিনো-দা! আরে বাপরে। বিনো দা' দি গ্রেট। জয় ভগবান, সর্বশক্তিমান, জয় জয় ভবপতি। অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা! হে বিনো-দা!

হা-হা হাসিতে গোটা বাড়িটা ভরিয়ে দিয়ে কে হেসে উঠল। এবং সে এক ভরাট কণ্ঠস্বরে বিব্রতভাবে বললেন, আরে-আরে ওকি হচ্ছে, ওকি হচ্ছে। দাদু! ইউ আর লাভলি, ইউ আর গড-লি! আই অ্যাম ম্যাডলি ইন লাভ উইথ ইউ।

—চুমু খাবো বিনো-দা, তোমায় চুমো খাবো। বিশ্বাস কর, মুখে গন্ধ নেই, পুরনো দাঁত একটাও নেই, কোন জার্ম নেই। তুমি

আজ ছু বছর আসো নি। কিন্তু টুপিটা কেন? ওটা তো আগে পরতে না।

আবার হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, টাকের জন্যে দাছু। টাকের জন্য। দেখুন না।

—হে ভগবান! এ যে প্রায় মনুমেণ্টের পাদদেশ করে ফেলেছ। অনবরত মিটিং বুঝি? কিন্তু দেশ তো উদ্ধার হয়ে গেছে। না 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়'দের দলে জুটে মিটিং বাড়িয়ে ফেলেছ? কিন্তু তারা তো আণ্ডারগ্রাউণ্ড হে। দরজা বন্ধ করব না-কি!

—রামোচন্দর। ও সব বাদ দিয়েছি। বিশ্বাস করুন। কিন্তু টাক পড়ার কারণটা বুঝলাম না। বংশে তো নেই, আমার হয়ে গেল। তা থাকগে এখন আপনার ঝাণ্টুর দলকে ডাকুন, কিঞ্চিৎ বিলাতী মিষ্টান্ন আছে, অর্থাৎ টফি লজেন্স। আলাপ করা যাক, ঝালিয়ে নেওয়া যাক্।

—এ যে অনেক গো বিনো-দা! এত?

—সেখানে যে আমার ছেলেরা আছে। সে তো কম নয়। আপনি তো জানতেন সাত আটটি। এখন যে পঁচিশটি! একে-বারে পাকাপোক্ত পঞ্চাশ বিঘে জমির উপর পাকাবাড়ি, ইস্কুল, বোর্ডিং। বুঝলেন না। সরকার টাকা দিচ্ছে। আমাদের এডুকেশন সেক্রেটারি গিয়েছিলেন, দেখে এসে চীফ মিনিস্টার এডুকেশন মিনিস্টারকে বলেছেন, বিশ বাইশটে ছেলে, তা বিনো সেন খুব ভাল ম্যানেজ করছে; ডাকাতের দল হবে না, ওঁকে টাকা দেওয়া উচিত। তা টাকা দিয়েছেন।

বিস্ময়ের আর বাকী ছিল না নীরার। কে এই মহাপুরুষ? এতগুলি ছেলে। পঁচিশটি! ঠিক যেন ধরতে পারছে না ব্যাপারটা। দাদুর কোন বন্ধু সন্দেহ নেই, শুধু বন্ধু নয় দাদা স্থানীয় বন্ধু। এবং বিশ বাইশটি ছেলে নিজের ছেলে নয়—বাড়ির ছেলে দাদুর বাড়ির মত: ছেলেদের ছেলে নাতির দল! নইলে দাদুর দাদার গৌরব বজায় থাকে কি করে? ভদ্রলোক নিজে আট নয় সন্তানের বাপ এবং আট নয় সন্তানের পড়ে দু বছরে যোলটি আঠারোটি, তার সঙ্গে আগের সাতটি যোগ করলে অবশ্যই পঁচিশটি হতে পারে। আরও দেরী হয় নি এই আশ্চর্য। ওদিকে বাড়িতে সাড়া পড়ে গেছে, দাদুর বড় মেজ দুই নাতি উঁকি মেরে দেখে সোর-গোল তুলেছে, বিনো-দা, দিদি, দিদি, বিনো-দা এসেছেন, মা পিসীমা, বিনো-দা!

দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে গেল। বাচ্চাগুলো এবার সাহস করে ঢুকেছে। সেই কণ্ঠস্বর শুনলে নীরা।—এস বন্ধুগণ গ্রহণ কর। অর্থাৎ সেই আগন্তুকের কণ্ঠস্বর; কণ্ঠস্বরটি ভারী সুন্দর, প্রসন্ন এবং ভরাট—তিনি বলছিলেন—টফি এবং লজেন্স। এস এস। এস এস, বীণা এস, বউমা এস।

এমন সময় ঘরে ঢুকলেন খোদ দিদি।—আঁ্যা বিনো-দা, পথ ভুলে নাকি? বাপ! আমি ভাবলাম দেশান্তরে গিয়ে, মানে বিলেত টিলেত গিয়ে, আজকাল তো স্বাধীনতার পর খুব সুবিধে, গিয়েছেন সেখানে, কারুর প্রেমে পড়েছেন এতকাল পরে।

হেসে সারা বিনো-দা।—বলেছেন ভাল তো। কিন্তু ওটা ঠিক মনে হয় নি দিদি, নইলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু পোড়া বরাত আমার।

সেই জঙ্গলে পড়ে আছি, আশ্রম ইস্কুল নানান ঝঞ্ঝাট! নিন দুটো লজেন্স খান।

—রসিক খুব। আমি লজেন্স খাব? আপনি খান।

—আমি সারা রাস্তা খাচ্ছি। খাই। দেখুন দাতুকেও দিয়েছি।

—তা খান উনি, আমি খাব না।

—তবে এই নিন। ঠাকুরকে দেবেন তালের গুড়। চমৎকার জিনিস।

—নীরা, নীরা। এবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন দাতু। আরে নীরা নেই?

বড় নাতি ছুটে এসে তাকে ধরে টানলে, দাতু ডাকছে। জলদি। বিনো-দা এসেছে। এস, এস।

দেখে সব গোলমাল হয়েছিল। এতক্ষণ কথা শুনে যা কল্পনা করেছে, তার কিছুর সঙ্গে মেলে না। শুধু তাই নয়। সে প্রায় অভিভূত হয়ে গেল! ছ ফিটের উপর লম্বা, সবল স্বাস্থ্যবান। যৌবনের সীমান্তে উপনীত, রক্তাভ গৌরবর্ণ, এ যে ইতিহাসের কালের কোন মানুষ। টিকলো নাক, খড়েগর মত, চোখ তুটি ছোট, কিন্তু কি দৃষ্টি তাতে! তবে যত প্রসন্নতা তত কৌতুক সেখানে অহরহ। দীঘির তরঙ্গিত জলের মত আলোর ঝিলিমিলি তুলে রয়েছে; হঠাৎ শান্ত হয়ে গেলে তাতে জাগে সেই আশ্চর্য দৃষ্টি, একটি সূর্যের প্রতিচ্ছটা চোখের তারায় ঝলসে ওঠে। তাকে দেখেই সেই দৃষ্টি তাঁর চোখে ফুটে উঠল। বললেন, বাঃ!

দাদু বললেন, হ্যাঁ, শুধু বাঃ নয়, বাঃ বহুত আচ্ছা মেয়ে নীরা। ওর যা ইতিহাস সে শুনলে—

—শুনব পরে। কিন্তু এমন ফিগার এমন মুখ, ওর ছবি আঁকেন নি ?

—ছবি ? নাঃ। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন দাদু।

—নাঃ! ওই দীর্ঘনিশ্বাস আমার ভাল লাগে না দাদা। রূপ ফেলে অরূপ। এমন রূপ! এর মধ্যেই তো তাকে পাবেন। অরূপ যদি থাকেন তো অপরূপের মধ্যেই আছেন। বাঃ যেমন স্বাস্থ্য তেমনি রূপ তেমনি নাম। নীরা। সজল দিঘীর মত হিল্লোল চঞ্চলা নয়, অথচ গভীরা প্রসন্ন সুধীরা। উজ্জ্বল হীরার চেয়ে নাম তার নীরা।

দাদু তার পিঠে প্রচণ্ড একটা চপেটাঘাত করে বললেন—ব্রাভো—বিনোদা। চমৎকার বলেছ। কিন্তু দুঃখ কি জান কিছুই করলে না তুমি। জীবনটাই অবসর-সম্ভোগ ভালবাসা বেসে কাটিয়ে দিলে। না লিখলে কবিতা, না গাইলে গান, ছবি এঁকে খাবে বলে তুলি ধরলে—কিন্তু—

ভদ্রলোক—বিনো সেন বললেন—প্রতিবাদ করছি।

—কিসের ?

—এই কথার। ছবি এঁকেই খাই আমি। কিন্তু জীবনে আমার প্রয়োজন কম। বেশী আঁকবার দরকার হয় না। কিন্তু ওকথা থাক। শ্রীমতী নীরা দাঁড়িয়ে আছে। ওর পাওনা দিয়ে দিই। নাও। ধর। টফি লজেন্স ধর। ধর।

নীরা এই আশ্চর্য মিষ্ট প্রগলভতার মধ্যে যেন অভিভূত এবং একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছিল—হাত সে পাততে পারছিল না।

বিনো সেন বলেছিলেন—আমার কাছে লজ্জা করতে নেই, দেখছ, আমি বিনো-দা। ইউনিভারস্যাল।

বলে হাতখানা ধরে তার হাতে কয়েকটা টফি দিয়ে দিয়েছিলেন। যেমন অসঙ্কোচে ঝণ্টু দেয় বাচ্চুর হাতে কিছু গুঁজে বা কিছু কেড়ে নেয় তেমনি সহজছন্দে অসঙ্কোচে।

দিদি বললেন, এই খানে খাবেন, ইলিশ মাছ আনাই।

—আনান।

—এখনও নিম-সেদ্ধ খান না-কি? ভিটামিন?

আবার হাসি। সেই ঘরভরা হাসি। তারপর বললেন, না। তা আর খাইনে। তবে খাদ্যটা সত্যিই ভাল ছিল।

—আর ভাল ছিল।

—ভাল ছিল না? রঙটা দেখছেন তো? এ ওই নিম খেয়ে।

দিদি বললেন—আমার আর রঙ পরিষ্কারের দরকার নেই, ওই আপনার কৃষ্ণবর্ণ দাদুকে বলুন। তারপর হঠাৎ বললেন, নারা তুমিও খেয়ে দেখতে পার। তোমার রঙ কালো নয়, কিন্তু একটু মাটো। দেখছ তো বিনো-দা'র রঙ। নিম খেয়ে হয়েছে।

বিনো-দা বললেন—না না না। স্বর্ণ-লতায় আর শ্যাম-লতায় তফাৎ আছে দিদি। ওই শ্যামলিমাতেই ও অপরূপা। জিজ্ঞেস করুন দাদুকে। কি দাদু?

দাদু বললেন—কি বলব বল, 'তন্বীশ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বা-ধরোষ্ঠি মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা' ও তো পড়েনি। আর আমাদের মত শিল্পীর চোখ তো নয় ওর। ওদের হল সর্বদোষ হরে

গোরা। নইলে বিনো-দা তুমিই বল, আমার ভুবন আলো করা কালোরূপ থাকতে তোমার গৌরবর্ণে মুগ্ধ হয়।

বউ মেয়ে পালাল। সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ফিরতে হল। ওরা পালাল বলেই ফিরতে হল, নইলে যে লজ্জায় ওরা পালাল সে লজ্জা বা সঙ্কোচ সে ঠিক অনুভব করে নি। ওর মধ্যে একটি আশ্চর্য আনন্দরসের স্বাদ সে পাচ্ছিল। দিদি হয় তো ঝগড়া করতেন, কিন্তু শেষটার জন্যে হাসতে বাধ্য হলেন, বললেন, বলব কি বলুন। বউ বেটীর সামনে, ছি! এখন চা খাবার পাঠাচ্ছি। বীণার ঘর থেকে হারমোনিয়ম আনতে পাঠাচ্ছি। গান শোনান।

—যা আজ্ঞা করবেন। কিছু লবঙ্গ পাঠাবেন তা হলে।

আবার একবার চমকে উঠল নীরা। এ কি কণ্ঠস্বর! গান রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি প্রাণ ঢেলে গাওয়া। বুকের মধ্যে প্রতিধ্বনি ওঠে। জানালার লোহার গরাদেতে হাত দিলে টের পাওয়া যায় কম্পন উঠছে। গাইছিলেন—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কি ?
হায়, বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি—
হায়, বুঝি তার নাগাল মেলে না।

কোলাহলমুখর, চঞ্চল সংসারটার জীবন স্রোত, স্রোত কল্লোল, সব স্তব্ধ স্থির হয়ে গেছে। যমুনা হয় তো এমনই ভাবে উজান বইত। কিন্তু ভগবান যাকে দেন, তাকে কি এমনি করে দু হাত ভরে দিয়েও

ক্লান্ত হন না, পরিপূর্ণ করে উপচে মাটিতে ফেলে দেন? এ লোক তো গান গাওয়ার মত গায় না!

দিদি বললেন, তা বটে। সুধা আপনার প্রাণে আছে। খবর কেউ পেলে না।

আবার সেই হাসি।

দিদি বললেন, একখানা ভক্তি রসের হোক। রবীন্দ্রনাথেরই।

—উঁহু। এগুলো এই প্রেমের গান, নতুন শিখেছি এখন। সেগুলো পুরনো মনে হচ্ছে।

—তবে স্বদেশী।

—মহাত্মাজীকে যেদিন হত্যা করেছে, সেই দিন থেকে শব্দটাই ভুলে গেছি। খাইদাই, ওই অনাথ-আশ্রমটা করেছি, তাই করি, ছবি আঁকি, ও সব দামোদরে ভাসিয়ে দিয়েছি। এখন গান শুনুন—বলেই ধরে দিলেন—

কান্না হাসির দোল দোলানো
পৌষ ফাগুনের পালা—
তারই মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা।
এই কি তোমার খুশি,
আমায় তাই পরালে মালা
সুরের গন্ধ ঢালা।

গানের পর গান, বেলা দেড়টা পর্যন্ত। তারপর স্নান খাওয়া। খাবার পরও রইলেন তিনি। ছেলেদের সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কি করে। দিদি হুকুম করলেন—উঁহু রাত্রিটাও এখানে। খাওয়া ভাল হয় নি ওবেলা। বিনো সেনের তাই সই। দুই অসমবয়সী

বন্ধু—পরমানন্দে মগ্ন হয়ে রইলেন। শুধু উচ্চ প্রসন্ন হাস্যে বাড়িখানা মধ্যে মধ্যে যেন উল্লাসে চকিত হয়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ এরই মধ্যে দাদু ডাকলেন—নীরা। নীরার যেতে ইচ্ছে করছিল ওদের কাছে—যেতে পারছিল না। সে সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দাদু বলেছিলেন—নীরা, বিনো-দা তোমার কাহিনী শুনে তোমার ভক্ত হয়ে পড়েছেন। বলছেন, তুমি যদি ওঁর অনাথ-আশ্রমে যাও, কাজ কর, তবে উনি তোমায় কাজ দেবেন; বি-এ পড়ারও খুব সুবিধে হবে বলছেন। অবশ্য প্রাইভেটে।

বিনো-দা বললেন, আমার এক মাস্টারমশাই আছেন। বুঝেছ। পণ্ডিত লোক। মাস্টারি কলেজেই করতেন। রিটায়ার করে দুর্মতি, দেশে গিয়েছিলেন, ময়মনসিংহে সেই ভৈরবের ধারে। দেশভাগের সময় আসতে গিয়ে নিজে এসেছেন, দুটো নাতি এসেছে, আর বিধবা বোন, বাকী সব খতম। সর্বস্বান্ত। আমি তাঁকে ওখানে নিয়ে গেছি। যা পারি সেবা করি। উনি এটা ওটা করেন। তুমি পড়লে সানন্দে পড়াবেন। মাইনে দেব চল্লিশ টাকা, আর খেতে পাবে দু বেলা বোর্ডিং-কিচেনে। আরও দুটি মেয়ে-মাস্টার আছেন, একটি মহিলা আছেন ছোট্ট বাচ্চাদের দেখেন, এঁরা সবাই কিচেনের খাবার পান, তার ওপর নিজেরা যে যা পারে করে নেয়। এই আর কি! তোমার মত একটা মেয়ে বাংলাদেশে জন্মায় শুনেই তো আমার নাচতে ইচ্ছে করে। বই-কাগজে এ দেশের মেয়েরা দুঃখে দুর্দশায় কেবল অধঃপাতে যাচ্ছে, মিথ্যে বলছে, নিজেদের বেচছে, চোখে কাঁদছে আর কাজল পরছে, ঠোঁটে রঙ মাখছে, এই তো শুনি। এমন হয়েছে যে মেয়ে দেখলেই সন্দেহ হয়, কে রে বাপু, কি এর কাহিনী।

তোমার কথা শুনে ভারী ভাল লেগেছে। আমি মুগ্ধ হয়ে গেছি। ভক্ত হয়ে পড়েছি। তোমার মত মেয়ের উপকার আমি করছি এ অহঙ্কার আমার নেই ; বরং মনে ভরসা হচ্ছে, আশ্রমটা গড়ে তুলতে পারব।

সেও এর মধ্যে বিনো-দার কাহিনী শুনেছিল। রাত্রে শুনেছিল দিদির কাছে।

বিনো-দা—বিনয় সেন আর্ট স্কুলে পড়তে পড়তে দেশোদ্ধারের চেষ্টার অপরাধে ধরা পড়ে জেলে ঢুকেছিল। হাতেখড়ি তার আগেই হয়েছিল। তখন তার বিশ বছর বয়স, ১৯৩১ সালে।

তিন বছর জেল—সশ্রম কারাদণ্ড। তারপর ডিটেনসন। তারপর বেরিয়ে এসে গণসংযোগ। ছবি আঁকা অবশ্য বন্ধ হয় নি। জেলে প্রথম কাঠকয়লা। তারপর কাগজ রঙও জুটেছিল। ডিটেনসনে সব যোগাড় হয়েছিল, ইজেল থেকে বিলিতি তুলি রঙ, সব। ডিটেনসনের আর একটা সুবিধে হয়েছিল, গ্রামটা ছিল বোলপুরের কাছে। মহান শিল্পী নন্দলালের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন। ওখানকার অন্য শিল্পীদেরও সাহচর্য শিক্ষা তাও পেয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে গণসংযোগ করতে করতে হঠাৎ কলকাতায় এসে আবার বছরখানেক আর্ট ইস্কুলে পড়ে বেরিয়ে এলেন খ্যাতিমান হয়ে; সেবারকার একজিবিসনে সোনার মেডেল পেলেন। তখন এক বছর খাঁটি শিল্পী হয়ে কলকাতায় কাটিয়েছিলেন। সেই সময়েই দাদুর সঙ্গে আলাপ। কিছুদিন শিষ্যত্বও করেছিলেন। সেই সময় বিনয় সেনের চেলারা এসে ডাকত 'বিনো-দা'। একদা দাদুও বললেন 'বিনো-দা'। সে নামটা কলকাতায় ছড়াল। বেশী বয়সীরাও বলতে লাগল, বিনো-দা।

তারপর বিনো-দা হঠাৎ আবার উধাও। এবার একেবারে মহাত্মাজীর আশ্রমে। সেখানে বছরখানেক থেকে ফিরে এসে আবার গণসংযোগ। সেই সময়েই ওই অঞ্চলে গিয়েছিলেন। বছর আড়াই পরে—বিয়াল্লিশ সাল। ফের বিনো-দা জেলে। বেরুলেন পঁয়তাল্লিশ সালে। তখনই তাঁর আশ্রমের পত্তন। বিয়াল্লিশে এই জঙ্গলে লুকিয়েছিলেন ব্রাত্যদের ঘরে। ফিরে যখন সেখানে গেলেন, তখন দুর্ভিক্ষে মড়কে গ্রাম শেষ। ছিল গুটি তিনেক ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কালসার মেয়ে, একটি পুরুষ আর গুটি চারেক ছেলে। কাজ শুরু করেছিলেন তাদের নিয়ে। সাতচল্লিশে দেশ স্বাধীন হল, সেবার তিনি পেলেন একটি বড় শিল্পীর সম্মান। সেই বছরই তিনি গেলেন ফ্রান্সে। আশ্রমের ভার দিয়ে গেলেন এক অনুগামী কর্মীকে। ফিরে এলেন গান্ধীজীর তিরোভাবের পর। অর্থাৎ মাস কয়েক থেকেই। বললেন, কি হবে আর ছবি এঁকে। চাকরী তিনি দু তিনটে পেয়েছিলেন। কিন্তু তার কোনটা নিলেন না, এসে বসলেন এই অরণ্যভূমে, সেই গ্রামটিতে। গড়ে তুলতে লাগলেন। মধ্যে মধ্যে কলকাতায় আসতেন, তখন ঘন ঘনই আসতেন, দাদুর বাড়ি আসতেন, দু বেলা খেয়ে গান শুনিয়ে তবে যেতেন। মধ্যে মধ্যে দিল্লিও যেতে হয়। একদা মহাত্মার স্নেহ পেয়েছিলেন, আজ যাঁরা রাষ্ট্রের কর্ণধার তাঁরা এই খেয়ালী প্রিয়দর্শন শিল্পী কর্মীকে চেনেন, তাঁর গানও শুনেছেন। তাঁকে ডাকতেন শিক্ষাদপ্তর; সমাজকল্যাণ দপ্তর। তিনি যেতেন। পথে দাদুর বাড়ি ইলিশ মাছ না খেয়ে আর গান না শুনিয়ে যেতেন না। তারপর এই দু বছর একেবারে আসেননি। দু বছর পর এসেছেন, বাড়ি মেতে উঠেছে। উজ্জ্বল বাড়ি উজ্জ্বলতর হয়েছে। এই সার্বজনীন

বিনো-দা ; শিল্পী দেশসেবক বিনয় সেন। তিনি বললেন, যাবে আমার সঙ্গেই দেখ।

নীরা বললে—যাব।

এতো তার ভাগ্য! একজন খ্যাতিমান লেখক সেদিন তার অটোগ্রাফের খাতায় লিখে দিয়েছেন—

পিছে তোর পড়ে থাক নগরীর দীপ
মানুষের ঘরে জ্বালা ভীরু-শিখা আলো—
ভয় কিরে? চিরদিন আঁধার সমুদ্রে
যাত্রীদলে নক্ষত্রেরা দিগন্ত দেখালো।
এতো ধ্রুবতারার আলো।
চল উত্তর পথে। ওই তো শ্রেষ্ঠ পথ।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য শেষ হয়েছে এইখানে। মহাকাশে নক্ষত্র-পুঞ্জের মধ্যে ধূমকেতু ছুটে বেড়ায়—উল্কা ছুটে চলে। কোন্ নীহারিকা-পুঞ্জ থেকে ছিটকে বেরিয়ে লক্ষহীন পথে নিরুদ্দেশে অগ্নিজ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে চলে পুড়ে ছাই হবার জন্য। সেও বেরিয়েছিল তাই। তার মা বাপের কক্ষচ্যুত হয়ে ছুটে বেরিয়েছিল। জ্বলতে জ্বলতে, পুড়তে পুড়তে। হঠাৎ সে যেন তৃতীয় অঙ্কে এক প্রচণ্ড শক্তিশালী গ্রহের আকর্ষণে বাঁধা পড়ে গেল। ঘুরতে লাগল এক নির্দিষ্ট কক্ষপথে। ধীরে ধীরে এই প্রদক্ষিনায় সে রমনীয় দীপ্তিতে শান্ত স্নিগ্ধ হল ; সে জীবনে সুশ্যাম ধরিত্রীর মত হয়ে উঠতে লাগল। হয়েও উঠত। কিন্তু আবার ছিটকে বেরিয়ে পড়ছে। আবার সে প্রচণ্ড তেজে জ্বলে উঠেছে। ধূমকেতুর মত জ্বালাময়ী দীপ্তির আলোক বিচ্ছুরণ বিচ্ছুরিত হতে সুরু হয়েছে।

নয়

তৃতীয় দৃশ্য—পটভূমি এই আশ্রম। বিনোসেনের—সর্বত্যাগী, বিচিত্র সন্ন্যাসী-শিল্পী দেশসেবক বিনো সেনের সাধন পীঠ। মনোরঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় সুরু হবার পূর্বেই নীরা সচেতনভাবেই বললে—থাক এখন নয়। তাকে যেতে হবে। থাক অভিনয় থাক। গোছানোর কাজ কর্ম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পড়ে প্রায় সবই আছে। থাক। ঘর তার জন্যে নয়, সঞ্চয় তার জন্যে নয়, আবার সে কক্ষপথ পরিত্যাগ করে মহাশূন্যলোকে সোজা চলবে। চলবে সে জীবনের চরম সার্থকতায়। সে সার্থকতা তার কর্ম জীবনে মহিমান্বিত প্রতিষ্ঠায়। এনাক্ষী তাকে ছবির রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে দিতে চেয়েছিল—সে ধনে সম্পদে, বিলাসে বৈভবে, হাস্যে লাস্যে—গন্ধর্ব রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হতে পারত, অন্তত এনাক্ষী তাই বলেছিল—তাতে তার মন ওঠে নি। এদেশের বড় বড় লোক, কাগজ, সমাজসেবীরা আজ বাঙালীর মেয়েরা ছবিতে নামবার জন্যে জনগণমন-অধিনায়িকা হবার জন্য না কি পাগল হয়ে উঠেছে বলে চিন্তান্বিত। হায় রে হায়! কতটুকু জানে এরা? এরা কি ওই ক'জন মেয়েদেরই বাঙালীর মেয়েদের মুখপাত্র মনে করে? দেখেছে এরা কত হাজার মেয়ে আজ অফিসে কাজ করছে? কত হাজার মেয়ে আজ শিক্ষাব্রতী? তাদের শান্ত সংযত দৃষ্টি দৃঢ় পদক্ষেপ কি চোখে পড়ে না এদের? দেখে নি কি তাদের রূপ? কত সত্যকারের রাণীর মত মেয়ে এই জীবনে তপস্বিনীর মতই কৃচ্ছ-

সাধন করে চলেছে যাদের তুলনায় হয়তো এই ছবির রাজ্যের রাণীরা নিতান্তেই অকিঞ্চিৎকর। এই চিন্তাবিদেরা বিচিত্র। এরা একদিকে সতীত্বের কথায় ঠোঁট ওল্টায় আবার ছবিতে যারা নামে তাদের অবজ্ঞা করে, ঘৃণাও করে।

থাক্। গোছানো হয়ে গেছে। কাপড় চোপড় যা' পরণে আছে তাই পরেই যাবে। তার জীবনে বিলাস নেই, আছে তপস্যা। তার আত্ম-প্রতিষ্ঠার তপস্যা। এখনও অনেক পথ তার বাকী। অনেক পথ। পথের ধূলো তার গায়ে লাগবে। তার বেশভূষাকে মলিন করবে। থাক কাপড় চোপড়। তার জীবন নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যেই তার জীবন নাট্যকারের অঙ্গুলি নির্দেশে—অমোঘ ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে। তুমি চলো, তুমি চলো। তুমি ঘরের নও, পথের। এবারও ঠিক তৃতীয় অঙ্কের শেষে তার সেই তর্জনীটি তেমনি সোজা ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করছে—পথে-পথে-পথে। ঘর নয়।

বেরিয়ে এল নীরা ঘর থেকে। বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কই, আশ্রমের সামপানি গাড়ী কই? বিনো সেন বললেন তাকে লজ্জা ঘৃণার ঊর্ধ্বে দণ্ডায়মান মহিমাময় ব্যক্তির মহিমান্বিত ভঙ্গিতে! কই? না—ওই আসছে। ওই যে আশ্রমের ওই কোনটায় সামপানি চালকের ধেৎ-হেৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। গরুর গলার ঘণ্টাও শোনা যাচ্ছে। তার অবশ্য ট্রেন ফেলের ভয় নেই। ট্রেন সকালে। শুধু এখান থেকে চলে তাকে যেতে হবে আজই রাত্রে। হ্যাঁ আজই রাত্রে। লগ্ন এসে গেছে। বিস্তীর্ণ আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি মাত্র ইলেকট্রিক আলোর পোষ্ট, তাতে আলো একটা জ্বলছে—আড়াইশ বাতির বাল্ব কিন্তু তার আলোতে আলোকিত হয় নি ঠিক।

ওই কোণটা দিয়েই গাড়িটা ঢুকেছিল। ঠিক আজকের মতই—আজ যেমন ঢুকছে। সামপানির ভিতর সে দিন একটা সিটে ছিল সে—অন্য সিটে বিনো সেন। ছেলের দল ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল মাঠে।

বিকেলবেলা, তখনও ইস্কুলের ছুটি হয় নি। কিন্তু বিনো সেনের সামপানি দূর থেকে দেখেই ছেলেরা ভিড় করে বেরিয়ে এসে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সামপানিতে বসেই বিনো সেন হাত নাড়ছিলেন। এবং হাসছিলেন। সামপানিটা ওই কোণ দিয়ে ভিতরে ঢুকতেই তারা ছুটে এসে ঘিরে দাঁড়াল। বিনো দা—বিনো দা! বিনো সেন বিচিত্র, তিনি লজেন্সের বড় ঠোঙাটা হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে নেমেছিলেন ছোট ছেলের মত এবং গান ধরে দিয়েছিলেন সেই ভাঙা গলায়—

এসেছে পাগলা বিনো আগলে তোরা ধর দেখি কই!

লেবেনচুষের ঠোঙা হাতে ডাকল ডেকে ভাগলরে ওই।

বলেই তিনি ছুটতে সুরু করেছিলেন। ছেলেরা ওই গানের সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠল

হৈ হৈ হৈ রৈ রৈ রৈ

বিনো সেন লজেন্সের ঠোঙা ধরা হাতখানা উঁচু করে ধরে ছুটতে ছুটতে আবার ধরেছিলেন

পাগলা জিতে একলা খাবে হারবে যারা চোগ্‌লা পাবে

চোগলা মানে অয়েল পেপার কান্না শুনতে রাজী তো নই।

ছেলের দল সেই হৈ-হৈ-হৈ রৈ-রৈ-রৈ গাইতে গাইতে প্রাণপণে ছুটছিল। সে এক দৃশ্য। নীরার মুখ স্মিত হাস্যে ভরে উঠেছিল। সেইখানে দাঁড়িয়েই দেখছিল। চোখ তার ছুটছিল—ওদের পিছনে পিছনে। তারই মধ্যে চোখে পড়েছিল আশ্রমের চেহারাটা। সুন্দর

রাঙা মাটির দেশ। প্রায় তিন দিকে অল্প দূরে দূরে শালবন। ঘন সবুজের ঘর। তার মাঝখানে রাঙা মাটির উপর আশ্রম। চারিদিকে নতুন বাড়ির পত্তন হয়েছে। কাজ চলছে। রাজ মিস্ত্রীরা কাজ করছিল তখনও তারাও কাজ বন্ধ করে বিনো সেনের সঙ্গে ছেলেদের রেস দেখছিল এবং হাসছিল। বিনো দা প্রচণ্ড বেগে ছুটছেন। ছেলেরা অনেক পিছনে পড়েছে। বাচ্ছারা অনেক দূরে। তবুও তারা হা রে রে চীৎকার করে ছুটতে চেষ্টা করছে। জন কয়েক আছাড় খেয়ে পড়ছে। উঠে ধুলো ঝাড়ছে। বিনো সেন ছুটে পরিক্রমা শেষ করলেন পুরনো আমলের ইস্কুলের আপিস ঘরের বারান্দায়। মাটির ঘর খড়ের চাল শাল কাঠের খুঁটি। সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনটি মহিলা। তাঁরা এখানকার শিক্ষয়িত্রী তা সে বুঝেছিল। তাদের ভালভাবে তখনও সে দেখেনি, কারণ চোখ তার বিনোসেনের এবং ছেলেদের পিছনেই নিবদ্ধ ছিল; তারই মধ্যে দেখেছিল পারিপার্শ্বিক এবং নতুন বাড়ি ঘরের আয়োজন এবং যেখানে সে সামপানি থেকে নেমেছিল সেখানটা আপিস থেকে একটু দূরও ছিল। তা হাত চল্লিশেক হবে বৈকি। এবার বিনোসেনের সেখানে পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে তারও দৃষ্টি সেখানে পড়েছিল। একজন স্থূলাঙ্গী সে একেবারে উল্লাসে গদগদ হয়ে হাসছিল—এই ধরনের মোটা মেয়েরা যেমনভাবে হাসে। আর একজন শীর্ণাঙ্গী মুখে রুমাল চেপে হাসছিলেন। চোখে চশমা। আর একটি মেয়ে সরুপাড় কাপড়পরা আশ্চর্য সুন্দরী মেয়ে। দূর থেকে সে হাসছিল কি হাসছিল না বুঝতে পারে নি নীরা। পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এক বৃদ্ধ আরও জন তিনেক ভদ্রলোক। আরও জন কয়েক এদেশের মাটির মানুষ। চিনতে কষ্ট হয় নি। দেখবামাত্র তাদের চেনা যায়।

নগ্নগাত্র খাটো-কাপড়-পরা মানুষ। আর ওরা অণিমাদি, কমলাদি আর এই প্রতিমা। বৃদ্ধটি বিনো সেনের মাস্টার মশাই। সেই অধ্যাপক। বাকী তিনজন সত্যবাবু, হৃষিবাবু, চারুবাবু এখানকার শিক্ষক, বিনো সেনের সহকর্মী।

বিনো সেন ওখানে পৌঁছেই তাকে হাত নেড়ে ডেকেছিলেন—এখানে! এখানে! নীরা এখানে এস।

নীরা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং থমকে গিয়েছিল। অথবা পৌঁছেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সে কি দৃষ্টি! প্রশ্ন সকলের চোখেই ছিল, কিন্তু ওই সরুপাড়-কাপড়পরা সুন্দরী মেয়েটির প্রতিমার মত ডাগর চোখে সে কি শুষ্ক রুক্ষ্ম কঠিন দৃষ্টি। না, হল না—, শুষ্ক রুক্ষ্ম কঠিন থেকেও আরও বেশী কিছু। সে দৃষ্টি নিষ্ঠুর, হিংস্র। হ্যাঁ হিংস্র। পলকহীন ওই দৃষ্টিতে প্রতিমা তার দিকে তাকিয়েছিল। কিন্তু সারা মুখে ভুরুতে কপালে কি চিবুকে কোথাও আর কোন একটি রেখার চিহ্ন ছিল না। যেন পাথরের মুখে ওই দৃষ্টি। বোধ হয় নীরার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল সবিস্ময় তিক্ত প্রশ্নে। হয় তো সে কিছু বলত। কিন্তু তার আগেই বিনো সেন বলেছিলেন—তাকেই বলেছিলেন—এঁরা জিজ্ঞেস করছিলেন তুমি কে? পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি নীরা! বুঝেছ প্রতিমা, বুঝেছেন অনিমাদি ইনি শ্রীমতী নীরা। হীরা নয় জিরাও নয়, পাঁচফুটের বেশি লম্বা তেমনি গায়ে জোর, মনের জোর আরও বেশী। আজীবন লড়াই ক'রে জেতা মেয়ে, নাম তার নীরা। আই-এ-পাশ করেছেন। এখানে পড়াবেন; মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়বেন; এই গুণ্ডা দলের সঙ্গে লড়বেন, ওদের পিটে পিটে গড়বেন। উনি শ্রীমতী নীরা! আর নীরা, ইনি প্রতিমা—ছেলেদের মা-মণি

মহিমময়ী মাতৃত্বের তপস্যায় রত। ইনি অনিমাদি, ছেলেরা গোপনে বলে —টিপ্‌সি দি। অর্থাৎ মোটা দি। বড্ড হাসেন। ইনি কমলাদি, ছেলেরা বলে কাঠিদি। আমি বলি—বিষণ্ণদি। একি প্রতিমা যাচ্ছ কোথায়?

প্রতিমা অকস্মাৎ ঘুরে চলে যাচ্ছিল—ইস্কুলের ভিতরের দিকে। সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—শরীরটে আমার ভাল নেই।

—কি হল?

—ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—দেখি এখানে এস, জ্বর হয় নি তো? এস হাতটা দেখি।

প্রতিমা সে আহ্বান লঙ্ঘন করতে পারে নি। এসে দাঁড়িয়ে হাত-খানা বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিনো সেন নাড়ী পরীক্ষা করে বলেছিলেন—একটু চঞ্চল হয়েছে নাড়ীটা। কিন্তু তোমার কাজটা করে যাও। তুমি ওদের মা-মণি। বেচারারা হেরে গিয়ে মুখ চূণ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার কাছে লজেন্সের অয়েল পেপার ছাড়া পাওনা নেই। ভিক্ষে ওরা করবে না। এখন তুমি এটা কেড়ে নিয়ে বিতরণ করতে পার। তাতে ওদের অপমান হবে না। নাও। যাও। তোমরা তোমাদের মা-মণির কাছে নাও গিয়ে।

প্রতিমা নিঃশব্দে ঠোঙাটি নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল ছেলেদের মধ্যে। একটা যন্ত্রমানুষের মত। প্রাণহীন পুতুলের মত। কেমন যেন বেদনাদায়ক মনে হয়েছিল নীরার।

হঠাৎ বিনো সেন উঠে এগিয়ে গিয়েছিলেন—দাঁড়াও দাঁড়াও। বলেই ঠোঙায় হাতপুরে একমুঠো লজেন্স তুলে নিয়ে ফিরে এসে বলেছিলেন—অনিমাদি চুলবুল করছেন। আমি দেখেছি। জিভ ওঁর জলে ভরে উঠেছে। আমি হলফ করে বলতে পারি—।

খিল খিল শব্দে হেসে স্থূলাঙ্গী অনিমাদি কমলাদির ঘাড়ে হাত রেখে যেন পড়ে যাওয়া থেকে আত্মরক্ষা করলেন। বিনোসেন বললেন—please অনিমাদি, এমন ক'রে নয়, একটু সামলে। বেচারী কমলাদি কাঠির মত মানুষ, আপনার ভারে মট্ ক'রে ভেঙে যেতে পারেন। সমবেত সকলেই হেসে উঠল। বৃদ্ধ অধ্যাপক মাস্টার মশাই পর্যন্ত। বিনো সেন বললেন—নিন অনিমাদি, ধরুন। ধরুন। এবার কমলাদি ? এবার নীরা।

নীরার একবিন্দু সঙ্কোচ ছিল না।

দাদুর বাড়ি থেকে এই আশ্রম পর্যন্ত বিনো সেনের সঙ্গে একসঙ্গে আসার মধ্যে সে যেন আবিষ্কার করেছিল একজন মানুষকে—যে মানুষ সকল মানুষের হাসিখেলা সুখদুঃখের আসরের সমবয়সী সঙ্গীজন। সে হাসিমুখেই হাত পেতে নিয়েছিল এবং মুখে পুরেছিল।

এবার বিনো সেন বলেছিলেন—এবার মাস্টার মশাই।

প্রসন্ন সৌম্যদর্শন বৃদ্ধও দ্বিধা করেন নি, হাসিমুখে হাত পেতে নিয়েছিলেন। তারপর অন্য শিক্ষকদের এবং গ্রামের কয়েকজনকে দিয়ে নিজে দুটো লজেন্স মুখে পুরে বলেছিলেন—এবার আমি।

বৃদ্ধ অধ্যাপক এবার বলেছিলেন—তুমি কিন্তু নিজের ভাগে একটা বেশী নিলে বিনো।

—হ্যাঁ স্যার তা নিয়েছি। লজেন্স আমার ভারী ভাল লাগে। আমার বাক্সখানা তল্লাস করলে লজেন্সের প্যাকেট পাবেন। যখন মন খারাপ হয় তখনই একটা মুখে পুরে চুষতে শুরু করি। মন ভাল হয়ে যায়। বিশেষ করে টাকে হাত বুলিয়ে। তখন লজেন্স মুখে দিলে মনে হয় টাকটা বেদান্তের মায়া। আসলে আমি ছেলেমানুষ।

সকলের মুখই প্রসন্ন হাস্তে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। মুহূর্তে যাদুকরের মত সব আবহাওয়া পাল্টে দিয়েছিলেন বিনো সেন। বলেছিলেন—বলতে ভুলে গেছি স্যার। দিল্লি থেকে ফেরার পথে বেনারসে নেমেছিলাম। গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, এ প্রশ্ন কার? তোমার তো হতে পারে না। বললাম—কেন বলুন তো? বললেন, এ প্রশ্ন যারা করবে তাদের মুখের চেহারা আলাদা হয়। আর সে বয়সও নয় তোমার। বুঝুন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ। কি বললেন?

—বললেন—একটু নির্জনে চলুন, বাচ্চারা হৈ হৈ করছে।

নীরাকে টেনে নিয়ে তখন অণিমাদি আলাপ জুড়ে দিয়েছেন।

—আশ্চর্য চেহারা ভাই তোমার। দেখলেই জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে, আবার ভয়ও হয়। বলেই জড়িয়ে ধরে আলাপ শুরু।

—কিন্তু ভবিষ্যতে যদি মোটা হও, তবে আর দুঃখের সীমা থাকবে না। এই লম্বা তুমি, আমার ডবল মোটা হয়ে যাবে। বলেই হাসতে শুরু করে দিলেন।

কমলাদি বললেন, নামটিও তোমার বেশ ভাই। নীরা!

নীরা এবার বললে—প্রতিমাদি কি এখানে? আপনারা দিদিমণি উনি মা-মণি কেন?

হাসি শুরু করেছিল অণিমাদি কিন্তু কমলা একটু রূঢ় স্বরেই বললেন—অণিমাদি! ওকি। সে থেমে গেল।

কমলাদি বললেন—উনি ছোট বাচ্চাদের দেখেন। তাই মা-মণি।

তারপর আবার বললেন—দেখ, আমরা ঠিক জানিনে। তবে মনে

হয় জীবনে সন্তান হারিয়েছিলেন। বিনো-দাকে তো দেখলে, উনি ওঁকে এখানে এনে অনেক ছেলের মা করে দিয়েছেন। অবশ্য প্রতিমাদি আমাদের আগে এসেছেন। বোধ হয় উনি বিনো-দার আত্মীয়া, তা না হয় তো আগের চেনা লোক। বিনো-দার একটু বেশী স্নেহও আছে, প্রতিমাদির দাবীও একটু বেশী। মানে আমরা যা পারি না। এই আর কি। প্রতিমাদির জীবনে দুঃখ আছে। বুঝেছ না। উনি ওইরকম।

নীরার দৃষ্টি এরই মধ্যে আবদ্ধ হয়েছিল বৃদ্ধ শিক্ষক এবং শিষ্যের দিকে। গভীর আলোচনায় মগ্ন দুজনে। এ বিনো সেনকে সে এই কদিনের মধ্যে দেখেনি। এ এক নূতন মানুষ, গোপীনাথ কবিরাজের কথা এই কিছুদিন আগে আনন্দবাজারে পড়েছে। বিরাট মনীষী। একটি পাথরের বা ধাতুর তৈরী প্রাচীন ভারতের জ্ঞানস্তম্ভ। গুরু শিষ্য দুজনেই শুধু নির্বাক হয়ে মনশ্চক্ষু দিয়ে ওই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে আছেন।

এই মুহূর্তেই ঘটেছিল একটা ঘটনা। আকস্মিক তীব্রকণ্ঠে চীৎকারে সকলেই চমকে উঠেছিল। নীরা বেশী। চমকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিল সে।

প্রতিমা দেবী চীৎকার করে উঠেছেন—ছাড়। ছাড়। ছাড়। মেরে ফেলব তোকে। ছাড়।

তাঁর হাত থেকে পড়ে গেছে লজেন্সের ঠোঙা। দুটো বড় ছেলেতে প্রচণ্ড মারামারি বাধিয়েছে। পরস্পরকে নিষ্ঠুর আক্রোশে আক্রমণ করে জড়িয়ে ধরেছে। একজন পড়েছে নিচে, অন্যজন তার বুকে বসেছে, এবং আথালিপাথালি কিল চড় মারছে আর নিচের জন উপরের

জনের মাথার চুলের গোছা ধরেছে এক হাতে অন্য হাতে খামচে ধরেছে গাল। প্রতিমা হাতের ঠোঙা ফেলে দিয়ে একটা বাখারী নিয়ে তাদের নিষ্ঠুরভাবে পিটছে এবং তীক্ষ্ণকণ্ঠে চীৎকার করছে কঠিন ক্রোধে। কিন্তু তবু তারা ছাড়বে না কেউ কাউকে।

অনিমাদি বললে—গেল, গেল, একটা গেল। কি হবে?

বিনো সেন এবং অধ্যাপক ও শিক্ষকেরা গোপীনাথের কথা বলতে বলতে দূরে চলে গেছেন। অনিমাই আবার বললে—আমি এ গতর নিয়ে ছুটতে পারব না, তুমি যাও কমলা ভাই।

—আমি পারব ওই দৈত্যদের সঙ্গে? তার উপর প্রতিমাদি রাগলে যা করেন জানো তো। ডাকো বিনো-দাকে ডাক।

নীরা বললে, আমি যাচ্ছি। সে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে ছুটে চলে গেল। সঙ্কোচ করলে না। এবং দুই হাতে দুজনকে ধরে কঠিন কণ্ঠে বলল ছাড়! ছাড়!

অপরিচিত একটি মুখ এবং সে মুখে যেন একটা কিছু ছিল যা তারা মা-মণি বা দিদিমণিদের মধ্যে দেখে নি। যা অসাধারণ, প্রদীপ্ত এবং অধিকতর শক্তিতে প্রবল বলেও অলঙ্ঘ্যনীয়। তার সেই সবল দেহ এবং প্রদীপ্ত দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তারা নিষ্ক্রিয় হয়ে পরস্পরকে ছেড়ে দিল। নীরাও তাদের পৃথক ক'রে সরিয়ে দিয়ে তাদের ছেড়ে দিল। কিন্তু মুহূর্ত পরেই আবার হল বিস্ফোরণ—এবার একটি ছেলে ক্ষুব্ধ হয়ে নীরার উপরেই লাফিয়ে পড়ল। নীরা এটা আশঙ্কা করে নি। 'তা' হলেও সামলে নিতে দেরী হল না তার; সঙ্গে সঙ্গে রাগও হল। সে মুহূর্তে ছেলেটার চুলের মুঠোয় ধরে তাকে শূন্যে খানিকটা তুলে মাটিতে ফেলে দিয়ে

বললে—তোমাকে আরও নিষ্ঠুর শাস্তি দিতাম আমি, কিন্তু আজ তোমাকে ক্ষমা করলাম।

প্রতিমা সেই বিস্মিত তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। নীরা বললে—আপনাকে আঁচড় কামড় দেয় নি তো।

—না। সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েই সে ফিরল। এবং টফি লজেন্সের ঠোঙাটার দিকে দেখিয়ে দিয়ে অনিমা দিদিকে লক্ষ্য ক'রে বললে—ওঁকে বলো এ আর আমি পারছি না। লোকও এসেছে, লোকেরও অভাব হবে না। আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে। বলেই সে চলে গেল মাঠ ভেঙে ওদিকের ঘরগুলির দিকে।

অনিমাদি এবার হাসলে না—বললে, মরণ তোমার! স্থূল শরীর নিয়েও অনিমাদি নীরার পিছনে পিছনেই বোধ হয় এসে দাঁড়িয়েছিল।

কমলাদি একটু হাসলে। নীরা বললে—কি ব্যাপার বলুন তো?

—ব্যাপার? মরণের ব্যাপার! আবার কি? তার ওপর তুমি এসেছ। আর রক্ষে আছে?

কমলাদি বললেন, থাকতে থাকতে সবই বুঝবে ভাই। থাক কিছুদিন।

অনিমাদি বললেন—বুঝবে আর ছাই। ওই শিবের মত লোকটাকে অতিষ্ঠ করে দিলে গা।

কমলাদি বললেন—দোষ মিছে দিচ্ছ ভাই। মন যে বড় অবুঝ!

অবুঝ মেয়েটিকে তখনও দেখা যাচ্ছিল, ওই ও প্রান্তে মাটির ঘরগুলির এলাকায় সবে ঢুকছে। মন্থর ক্লান্ত গতিতে।

নীরার আর সমবেদনার সীমা রইল না। সে বুঝেছে—ওই সুন্দরী মেয়েটি বিনো-দাকে ভালবেসেছে। বিনো-দাও তা জানেন।

হয় তো বা ভালও বাসেন। তবে? তবে, কেন তাকে এ দুঃখ দিচ্ছেন? কিসের জন্য? এমন মানুষের একি আচরণ? একটু মনে লাগল তার। কিন্তু হঠাৎ এমন আচরণ করলেন কেন? হঠাৎ নিজের মনেই প্রশ্ন করলে—তাকে দেখে? সে হাসতে গেল কিন্তু পারলে না। ছি!

সেদিন সন্ধ্যাবেলার সারাটাক্ষণ অনিমাদি কমলাদি'র সঙ্গে নানান কথার মধ্যে ওই কথাটাই বারবার যেন ফিরে ফিরে এসেছিল—অথবা উঠে পড়েছিল।

নীরা নিজের জেঠীমার কথা বলতে বলতে বলেছিল—মানুষটা আশ্চর্য। বিষ সে সাতসমুদ্রের মত। আবার জ্যাঠামশায়ের বেলা সে যেন নীল আকাশ; রাত্রের নীল আকাশ—যত শান্ত নীল তত নক্ষত্রের শোভায় ঝলমল। আমাকে ক'দিন স্নেহ করেছেন—সে অগাধ। আবার সারা জীবন যে ঘেন্না যে হিংসে ক'রেছেন—তার জ্বালায় জীবনটা আজও জর্জর হয়ে আছে।

কমলা দি হঠাৎ বলেছিলেন—থাকে, এমন মানুষ অনেক আছে ভাই—

অনিমা দি বলেছিলেন—দেখ না প্রতিমাকে দেখ! কি কমলা? বল?

—হ্যাঁ। অনেকটা মিল আছে!

নীরা চুপ করেই ছিল। কি বলবে?

আবার কিছুক্ষণ পর নীরার কথায় ফিরে এসেছিল প্রসঙ্গটা। নীরা বলে যাচ্ছিল নিজের কথা। বলতে বলতে এসেছিল হেনার কথায়। বলেছিল—ওই মায়ের সে এক আশ্চর্য মেয়ে। বুঝেছেন—

নিজে ওই কাণ্ড করেছিল বলেই না কি বিয়ের পর স্বামীর উপর গোয়েন্দাগিরিই হল তার কাজ! কোথায় জামায় লম্বাচুল লেগে আছে, কোথায় কি গন্ধ উঠছে—

এ কথা সে আর শেষ করতে পারে নি। স্থূলাঙ্গী অনিমাদি বিপুল কৌতুকে হেসে বিপুল দেহভার নিয়ে গড়িয়ে পড়েছিল মেঝের উপর।—কমলাকে ঠেলা দিয়ে বলেছিল—মাইরী ভাই কমলা—আমি ঈশ্বরের দিব্যি গেলে বলতে পারি উনিও তাই করেন।

নীরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল—কে?

হাসি অনিমাদি'র একেবারে জলপ্রপাতের মত ভেঙে যেন আছড়ে পড়েছিল। কথা বলতে পারে নি। নীরা সবিস্ময়ে তাকিয়েছিল কমলার দিকে।

কমলা বলেছিল—ওই—উনি, প্রতিমাদি!

—প্রতিমা দি?

ঠিক এই মুহূর্তেই ডাক দিয়েছিলেন বিনো সেন।

—নীরা আছ!

সকলে সচকিত হয়ে উঠে বসেছিল। নীরা বলেছিল—আছি। আসুন।

ঘরে ঢুকে বিনো সেন বলেছিলেন—ত্রিমূর্তিই এখানে। ভেরি গুড! রাত্রে সকলের খোঁজ করা বিনো সেনের নির্ধারিত কর্ম্মসূচী।

আজ তার ব্যতিক্রম ঘটল।

দু বছর পর, আজ আর বিনো সেন আসবেন না—আসতে সাহস করবেন না, আর ডাক দেবেন না—নীরা!

শেষ তার সঙ্গে সব সম্পর্ক। শেষ হয়ে গেছে সন্ধ্যাতে। এইবার সে চলে যাবে। চলে যাবে সামপানিতে চড়ে এই বনের ভিতর দিয়ে পথের উপর দিয়ে, দামোদর ব্যারাজ পার হয়ে সে চলে যাবে।

সামপানিটা আসছে। আলো ছটো চাকার ঝাঁকুনিতে কাঁপছে। এ দিক থেকে কারা আসছে যেন। কয়েকজন। অনিমাদি, কমলাদি, আর কে? মাস্টার মশাই হরিচরণবাবু! তার পিছনে চারুবাবু। আর কে? বিনো সেন?

আশ্চর্য্য লজ্জাহীন স্পর্দ্ধিত মানুষ তো!

দশ

হ্যাঁ, বিনো সেনই।

হাতে একখানা মোটা খাম। বললেন—বিনা ভূমিকায় সহজ সাধারণ কণ্ঠে বললেন—এতে আপনার মাইনে আর আমাদের তরফ থেকে সকলকে প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকা দেওয়ার কথা হয়েছে তারই দরুণ টাকাটা রয়েছে। এটা ধরুন।

মুখের দিকে ক্ষণেকের জন্য মুখ তুলে তাকালে নীরা—তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে—টেবিলের উপর রেখে দিন।

রেখেই দিলেন বিনো সেন; রেখে বললেন—ওটা কিন্তু দেখে নিতে হবে আপনাকে এবং রসিদ একটা লেখাই আছে—সেটায় সই ক'রে দিতে হবে।

একটু হেসে বললেন—না ক'রে তো উপায় নেই। হিসেব দিতে হয় সরকারকে, আপনি জানেন।

মনের তিক্ততা মাটির বুকের উত্তাপের মতই চাপা রাখতে হল। তার উদ্গার একটু আগেই হয়ে গেছে। উচ্ছ্বসিত উত্তাপ নিঃশেষিত হয়ে গেছে; দেহমন দুই-ই ক্লান্ত এখন—তারপর মনোরঙ্গমঞ্চে তার অতীত জীবনের স্মৃতি-নাট্যাভিনয়ের মধ্যে মন কেমন যেন মগ্ন হয়ে খানিকটা উদাস হয়ে পড়েছে। হয়তো বা বিনো সেনের প্রতি সেই সময়ের শ্রদ্ধা বিস্ময় অনুরক্তি সব মনে পড়ে তাকে খানিকটা নরম ক'রে দিয়েছে। হয় তো প্রচ্ছন্ন একটি প্রশ্ন বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে

তাকিয়ে আছে নীরবে নিঃশব্দে। সে মুখর না হয়েও ইঙ্গিতে যেন বলছে এতটা কাল সব মিথ্যা হয়ে আজকের এইটুকুই কি পরম ও চরম সত্য হয়ে উঠল ?

এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্যই আছে কিন্তু সব সময় দেওয়া যায় না। ভিক্ষুককে ভিক্ষুক বললে সত্য কথাই বলা হয় কিন্তু চক্ষুলজ্জাই বল আর করুণাই বল, যা হল আসলে দুর্বলতা—তার এতটুকু মনের কোণে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ বলা যায় না। কাজেই এই ক্ষেত্রে মনের এই ক্লান্ত অবস্থায় বিদায়ের মুহূর্তে সকলের সঙ্গে যখন বিনো সেন এসে দাঁড়িয়েছে নির্লজ্জের মত তখন আর পারছে না তাকে বলতে—আপনার মত এত বড় লজ্জাহীন মানুষ আর আমি জীবনে দেখি নি। ধনী সোমেশবাবুর দম্ভভরে—'মনা ঘোষের উচ্ছিষ্ট কন্যা' ব'লে তাকে গাল দেওয়া সে বুঝতে পারে—কিন্তু আপনার এই ঘণ্টা দুয়েক আগের মাটির দিকে চেয়ে থাকা চোখ তুলে—মাথা তুলে অসঙ্কোচ হাসি হেসে সামনে দাঁড়ানো এবং কথা বলার প্রবৃত্তি ও মনকে সে বুঝতে পারে না। কেমন ক'রে পারলেন আপনি ?

থাক সে থাক। তিক্ততা তার মনের মধ্যেই থাক। সে টেবিলের কাছে গিয়ে নোট ও হিসেবের কাগজের ভিতর থেকে রসিদখানা বের করে অঙ্কটা দেখে তার উপর সই করে সেটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—নিন।

রসিদখানা পকেটে পুরে বিনো সেন বললেন—স্কলারশিপের কাগজগুলো বিকেলেই দিয়েছি। ওটাকে যেন আমার অনুগ্রহ বলে উপেক্ষা কর না। এটা এদেশের একটি সুযোগ্য মেয়ে হিসেবে তোমার প্রাপ্য। সে ভুল তুমি যেন ক'র না।

একটু থেমে আবার বললেন—তুমি আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছ আমি তোমাকে তুমি বলছি ব'লে। তা বলছি। আমি বয়সে বড়। অনেক স্নেহ করেছি। আপনি বলতে পারছি নে। এবং তার জন্যে ক্ষমা করো বলতেও বাধছে। আচ্ছা আমি যাচ্ছি। কল্যাণ হোক তোমার।

বলেই বিনো সেন চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ সব মানুষ ক'টি স্তব্ধ হয়ে রইল। রইল নয়, কেউ বা কিছুতে যেন বাধ্য করলে স্তব্ধ হয়ে থাকতে। নীরাও স্তব্ধ হয়ে রইল বাধ্য হয়ে। বিনো সেনের নিজের অন্যায় এবং সেই অন্যায়ের প্রতিবাদে নীরা যে নিষ্ঠুর অপমান তাকে করেছে—সে সব কিছুকে এমন আশ্চর্য নিরাসক্তির সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে এমন সহজভাবে এসে দাঁড়ানো এবং সহজ বিদায় দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে অবশ্যই বিস্ময়ের অনেক কিছু আছে। কিন্তু তারও চেয়ে বেশী কিছু আছে—যা অব্যক্ত অথচ অনুভবের মধ্যে সকলকেই স্পর্শ করেছে। বিনো সেনের ক্ষোভহীন এই প্রকাশ বড় সকরুণ; যেন, যেন—বেদনায় ভরা।

নীরার ভুরুদুটি মোটা এবং জোড়া। ওই ভুরুদুটির মিলনস্থলে একটি কুঞ্চনের কুণ্ডলী জেগে উঠেছে। শূন্যগর্ভ আগ্নেয়গিরির নিবিয়ে যাওয়া গহ্বর মুখের মত।

এ নিস্তব্ধতা প্রথম ভঙ্গ করলে—বৃদ্ধ অধ্যাপক হরিচরণবাবু। ডাকলেন—মা নীরা।

নীরা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে চেষ্টা ক'রে হেসে যথাসাধ্য সহজভাবে বললে—আমি যেতাম আপনার কাছে।

একটু থেমে আবার বললে—অবশ্য ভয় ছিল—পাছে বারণ করেন।

হরিচরণবাবু বললেন—না মা। এরপর তা বলব কেন? তা বলতেও আসি নি। অবশ্য তোমাকে বলা ঠিক হচ্ছে কি না জানি না—বিনো আমাকে নিজে থেকে ডেকে বলেছে বাধা ওকে দেবেন না মাস্টার মশাই। আমি তার বা তোমার কারও বিচারই করি নি, করছি নে। বুড়ো হলাম মা, দেখলাম অনেক। দেখেই যাই। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করতেই এসেছি। তবে মনটা খুঁত খুঁত করছে—এই রাত্রে যাবে মা।

নীরা শেষের কথায় এত কথার উত্তর এককথায় মিটিয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে গেল। সে এগিয়ে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—আর আমাকে বারণ করবেন না। মন আমার বিষিয়ে গেছে।

বলেই সে ঘুরে দাঁড়াল অনিমাদি এবং কমলাদির দিকে। এত দিনের সহকর্মী—সুখ দুঃখ হাসি কান্না—কত ছোটখাটো কলহ, কত নিবিড় অন্তরঙ্গতায় মনের-কথা বিনিময়ের সঙ্গী প্রতিপক্ষ-সখী। তারা এখনও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার জন্যে তারা দুঃখ পেয়েছে বা সেই তাদের আজ দুঃখ না দিক তিক্ত করেছে সে কথা নীরা ঠিক অনুমান করতে পারলে না। কিন্তু সে বোঝাপড়ার বা আলোচনার সময় নেই। সে এদের সঙ্গেও বিদায় পর্বটা এক কথায় মিটিয়ে দিলে। বললে—চলছি ভাই অনিমা দি, কমলা দি!

হাসতেও একটু চেষ্টা করলে।

—এসো ভাই। কি বলব? বললে অনিমাদি। সেও একটু হাসতে চেষ্টা করলে। কমলা দি শুধু হাসতে চেষ্টা করে ছেদ টেনে দিলে।

নীরাও আর বাড়ালে না। সে সামপানির গাড়োয়ানকে ডেকে বললে—জিনিসগুলি চাপিয়ে নাও বাঁকু। ধ'রে দেবার লোক চাই—না?

বাঁকুর নাম বাঁকারায়, সে বললে—লোক আসিছে দিদিমণি। অরে—হৈ—রাখহরি। পা চালায়ে আস হে! তারপর নীরার দিকে ফিরে বললে—তিনজনা যাব আজ্ঞা আমরা। হুকুম দিছেন বাবু।

গাড়িতে উঠবার আগে আর একবার সে সংক্ষেপে সম্ভাষণ সেরে নিলে। তাঁরা উত্তর দিলেন সংক্ষেপে। দুটি কথায় শেষ হওয়ার মত সংক্ষিপ্ত—

—আসি।

—এস!

তার সঙ্গে ওই চেষ্টা ক'রে হাসা একটু নিঃশব্দ হাসি।

শুধু হরিচরণবাবু বললেন—তুমি যেন স্কলারশিপটা নিয়ো না। ওটা যেন উপেক্ষা কর না। তোমার জীবনের গতি যে মুখে—আর যা যোগ্যতা তোমার তাতে দেশও অনেক কিছু পাবে, তুমিও সার্থক হবে।

—ভেবে দেখি!

বলেই গাড়িতে উঠল। গাড়িটা চলতে লাগল। ইটের খোয়ার উপর বাঁকুড়ার লাল কাঁকড় ফেলা পথ। বাইরে দেখতে চমৎকার, রাঙামাটির পথ। কিন্তু সামপানি গাড়িটার চাকার লোহার বেড় খোয়াগুলির উপর খড় খড় ঘট ঘট শব্দ করে শীতের কাঁপুনির মত ঝাঁকুনি খেয়ে থরথর করতে করতে চলেছে। মাথার চিন্তা এলোমেলো

হয়ে যাচ্ছে। আশ্রমটা পিছনে পড়ছে। মন কেমন করছে। ক' বছরের মধুর জীবনের স্মৃতি। আনন্দ কোলাহলে মুখর, আশায় উৎসাহে প্রদীপ্ত জীবন্ময়তায় সুরভিত বর্ণাঢ্য ছটা বৎসর। ওঃ কত আশা, কত কল্পনা, কত খেলা, কত হাসি, কত আনন্দ! আজকে সন্ধ্যের পূর্বেও তার কল্পনা ছিল স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত যাবে। শিশুদের শিক্ষা বিষয়ে ও দেশের বিশেষ শিক্ষা নিয়ে এখানেই ফিরে আসবে। এই আশ্রমকে এক আদর্শ আশ্রমে রূপায়িত করবে। এর মধ্যে এসে অনাথ আত্মীয়হীন ছেলেরা পরমাত্মীয়ের স্নেহ পাবে, আপনজন পাবে, দুষ্ট শিষ্ট হবে, স্থুলবুদ্ধি সূক্ষ্মবুদ্ধি হবে। সেই মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম—। তাই হবে। এখানেই আশ্রমের প্রান্তে খানিকটা জমি নিয়ে একটি ছোট বাড়ি তৈরী করবে। ছেদ পড়ে গেল চিন্তায়। বাড়ির পরই যে কল্পনাগুলি এসে দাঁড়ায়—ঘর সংসার—তারপর ?—

না—এর পূর্বে কখনও বোধ হয় এমন গম্ভীর মুখে সে প্রশ্ন বা কল্পনা এসে দাঁড়ায় নি। স্বামী পুত্রের কথায় সে সলজ্জ বৈরাগ্যে এবং প্রসন্ন কৌতুকে এর পূর্বে বলেছে—যা—যা—যা। কি ছেলেমানুষী! স্বামী? পাগল! নীরার আবার স্বামী হয় না কি? কে সে? তিনি কিনি?

মনে পড়ছে আয়নায় প্রতিবিম্বে তার সে হাসিমুখ। এবং বাংলাদেশের সেই আদ্যিকালের সেই কথাটি বলে—নিজের প্রতিবিম্বকে ব্যঙ্গ করতে তার জিভে বাধে নি—মরণ! পোড়ারমুখার সাধ কত?

আজ সেই প্রশ্ন সামনে আসতেই সে যেন বেদনায় বিষণ্ণতায় অভিভূত হয়ে পড়ল!

পরমুহূর্তেই সে আত্মস্থ হয়ে বিষণ্নতা বেদনা সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললে—ছি! ছি! ছি! এ সব কি ভাবছে সে! জীবনের এই ক্ষুদ্র প্রলোভন এই মুহূর্তে এমন বড় হয়ে উঠল? ছি!

ওই তো সম্মুখে চলেছে পথ। রাঙামাটির পথ—বনভূমি পার হয়ে, দুর্গাপুরে দামোদর ব্যারাজ পার হয়ে পিচের রাস্তা ধরে কলকাতা হয়ে—দেশ দেশান্তর—জলপথে—আকাশপথে—অন্তহীন পথ; এই আশ্রম জীবন থেকে বড় বৃহত্তর জীবনে মানস-সরোবর যাত্রীর মত একা একা—একা।

—সাবধানে যাবেক হে বাঁকু মশায় হৈ শেষ জঙ্গলটোতে ক'দিন থেকা কটা ভালুক উপদ্রব করিছে হে! বল্লাম টেল্লাম নিয়েছো তো হে গোবিন্দ মশায়?

সচকিত হয়ে উঠল নীরা। বিনো সেনের কণ্ঠস্বর। সে পিছনের দিকে তাকিয়ে ছিল। খেয়াল হয় নি। সামনেই বাঁ পাশে বিনো সেনের বাড়ি। বারান্দায় এখন আলো জ্বলছে না। অন্ধকারে বিনো সেন চুরুট মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

আর ও কে? পাশের বাড়িটার ঘরের মধ্যে আলো জ্বলছে, জানালার ধারে ও কে? চোখে নিস্পলক শানিত দৃষ্টি—। যত অতৃপ্তি তত নিষ্ঠুরতা তত আক্রোশ। প্রতিমা। প্রতিমা দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি হতভাগিনী কিন্তু অকপট।

বিনো সেন সৌভাগ্যবান—কিন্তু কপট—প্রবঞ্চক।

নীরা বললে—একটু হাঁকিয়ে চল বাঁকু। স্টেশনে পৌঁছে একটু শুতে পারব।

—হ আজ্ঞা! বাঁকু বললে—খুব ডাকায়ে নিয়ে যাব। দ্যাখেন

ক্যানে—। গরুর পিঠে আঙুলের টিপ এবং পেটে পায়ের গুঁতো দিলে বাঁকু। চল হে বাবাধনেরা। হোঁ—হোঁ! হোঁ—হোঁ!

গাড়িটা দ্রুত গতিতে চলতে লাগল। আশ্রমের ফটক পার হয়ে খানিকটা এসে সদর রাস্তায় উঠল। রাস্তা দুটোর সংযোগস্থলে মাটির বাঁধানো গোল বেদীতে ঘেরা একটা বড় মহুয়া গাছ।

* * *

আশ্রমের লোকেদের সকলের সঙ্গেই এই গাছটার সম্পর্ক বড় মধুর এবং নিবিড়। কতকগুলি সরল তরুণ শাল ও পলাশ গাছের মধ্যে মহুয়াগাছটি প্রবীণ এবং শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে একটি ছাতার মত দাঁড়িয়ে আছে। এর তলায় বেদীটা বাধানো আছে অনেক দিন থেকে। প্রায় প্রতিটি দিনই আশ্রমের সবাই একবার না একবার এখানে এসে বসেছে। ছেলেরা এসে এখানে গাছে ঝুলে ঝাল্লু ঝাল্লু খেলে। এখানে' ভোরবেলা আসেন হরিচরণবাবু আর বিনো সেন, বসে সূর্যোদয় দেখেন। সেও এসেছে কতদিন। ইদানীং তো নিত্যই এসেছে। কোন দিন সে আগে এসে বসে থাকত, বিনো সেন গান গাইতে গাইতে আসত—"ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময় তোমারই হউক জয়।" কোন দিন সে আশ্রম থেকে বেরিয়েই শুনতে পেত বিনো সেন এসে এখানে বসে গান গাইছেন—"তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয়! তোমারই হউক জয়!" ইদানীং মাস তিনেক হরিচরণবাবুর হাঁপানি বেড়েছে বলে ভোরে ওঠেন না—আসেন না; তারা দুজনে ব'সে এখানে কত গল্প আলোচনা পরিকল্পনা রসিকতা করেছে। কতদিন মন অকারণে বেদনাতুর হয়ে উঠলে পালিয়ে এসে এখানে চুপ করে বসে থেকেছে। বিকেলবেলা ছেলেদের খেলার পালা শেষ হলে অনিমাদি, কমলাদি

সে তিনজনে এসে বসেছে মুখ আঁধারি সন্ধ্যায়। খিলখিল করে হেসেছে—রসিকতায় পরস্পরকে ব্যঙ্গ করে আঘাত করে। অনিমাদি কতদিন এই বেদীর ওপর শুয়ে পড়ে তাল-মান-হীন সুরে গান ধরেছেন—মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।

আমার চাকুরী শ্যাম কারে দিয়ে যাব।

না—পুড়ায়ো এই অঙ্গ—না ভাসায়ো জলে

মরিলে তুলিয়া রেখো এই মহুয়ারই ডালে।

কমলাদি যে কমলাদি, যাকে ছেলেরা বলে কাঠীদি তিনিও কৌতুক রসে উৎফুল্ল হয়ে উঠে সুরে গেয়ে আখর দিতেন অবশ্য ছন্দ রাখতে পারতেন না আখর দিতেন—

"পোড়াতে লাগিবে সখি সারা গোটা বন—

পোড়ায়ো না—এ পাহাড় পোড়ায়ো না।"

—"নদী সে কয়েক ক্রোশ—পারিবে না করিতে বহন।"

পারিলেও এ পাহাড় ডুবিবে না জলে।

তার চেয়ে তুলে রেখো—মহুয়ারই ডালে।"

এ গান তাদের দীর্ঘদিনের কাব্য সাধনার ও সঙ্গীত সাধনার ফল। প্রায়ই এ গান তারা গাইত। হাসত। পুরোন হয় নি। আজও হয় নি। মাত্র কাল বিকেলেও এ গান গেয়েছে। আজ বিনো সেনের সম্বর্ধনার হাঙ্গামায় আসা হয়ে ওঠেনি। প্রতিমাও আসত এখানে। সে আসত একা। একা এসে বসে থাকত। প্রতিমা এখানে আসত তাদের ঠিক আগে; ইস্কুলের ছুটির পরই; তারা তিনজন এলেই সে উঠত। কখনও বসে থাকত না আর। ওই কটি কথা হত।

—উঠলেন!

একটু, প্রতিমার সেই বিচিত্র হাসি হেসে প্রতিমা বলত—

—হ্যাঁ। বস তোমরা। খেলাধূলা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

চলে যেত প্রতিমা। অনিমা মোটা দেহখানি নিয়ে বিচিত্র ভঙ্গি করে বলত—বিরহিনী রে! তারপর বলত—মরণ!

গাছটার কাণ্ডের গায়ে কত ছেলেতে ছুরি দিয়ে কেটে নাম লিখেছে। শুধু ছেলেরা কেন? অনিমাদি. কমলাদি, সে—তারাও লিখেছে। কত পথিকের নামও লেখা আছে। মধ্যে মধ্যে বেদীর উপর কতজন কত কথা লিখে যেত এবং যায়। এখানে এই ছায়াতলে দুপুরে রাখাল ছেলেরা বাঁশী বাজায়। মধ্যে মধ্যে জিপসীর দল এসে এই অল্প গাছপালার বনপ্রান্তে তাঁবু ফেলে দু চার দিন থাকে।

এর পরেই কিছুটা দূর, বোধ করি সিকিমাইল গিয়েই, আরম্ভ হয়েছে ঘন শালবন। এরই মধ্য দিয়ে একালের পিচঢালা পথ। সামপানিখানা এবার বেশ মসৃণ গতিতে চলতে লাগল। এই মহুয়া তলায় সে এসেছিল এখানে পৌঁছুবার ঠিক পরের দিন। পরের দিন ছুটির পর অনিমাদি বলেছিল—এস বেড়িয়ে আসি। ভারি চমৎকার একটি জায়গা আছে।

সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন কাজের পর এখানে এসে তার ভারি ভাল লেগেছিল।

এগার

পরের দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছিল তার কর্মজীবন।

নিস্তব্ধ রাত্রি। দুপাশে বনভূমির মধ্য দিয়ে পিচঢালা সমতল মসৃণ পথে সামপানিখানা খানিকটা পথ বেশ দ্রুত চলার পর আবার মন্থর গতিতে চলতে লেগেছে। গরু খানিকটা দৌড়ে আবার তার স্বাভাবিক গমনে চলছে। সামপানির চাকাগুলি গরুর গাড়ির চাকার মত ভারী নয়, ঘোড়ার গাড়ির চাকার মতই হাল্কা এবং অনেক সহজে ঘোরে; তবুও গরুর জন্য সেই সনাতন চাল। ঘুট্‌ঘুট করে চলেছেই চলেছেই, গরুদুটোর গলায় ঘণ্টা বাজছে। গরুর গাড়ির চাকার মত উচ্চ এবং সকরুণ বিলাপধ্বনির মত শব্দ না উঠলেও, চাকায় একটি মৃদু কঁ্যাচ কঁ্যাচ শব্দও উঠছে। দু পাশের বনের ভিতর থেকে ঝিঁঝির ডাক উঠেছে। ডেকেই চলেছে। একটানা। চালক বাঁকু রায় হঠাৎ সরব হয়ে উঠল—অঁই অঁই—আবার ঝিমায়ে গেলি যি রে! ই বেহুদ্দা বদমাসদিগে বললে কথা শুনে না হে! দির পাচনের বাড়ি—! বলেই নাকে ঘড় ঘড় করে বিচিত্র শব্দ করলে। নীরা বুঝতে পারলে লেজে মোচড় দিচ্ছে বাঁকু। গাড়ির গতি দ্রুত হল।

সামপানির ভিতরে অন্ধকারের মধ্যে বসে নীরা একটু হাসলে। একটা কথা মনে পড়ে গেল। কথা নয়—ছড়া।

"পেটগুলো মোটা আমার ক্ষুরগুলি চেরা—
আমার কাজ নয়কো দৌড়া—
নইকো আমি ঘোড়া—
আমি টানতে পারি হাল—
ঘোরাই আখের শাল—
ঘরে বোঝাই করে দিই গুড় ধান চাল।
আমার পিঠে চড়া বারণ
বলি তাহার কারণ
বাবা বুড়ো শিবের আমি একমাত্র বাহন।
তাই তো আমার দাঁতের কষে—একটি পাটি দাঁত—
ফোক্‌লা বুড়োর ফোকলা বাহন হবেই নির্ঘাৎ।
তাতেই বাজী মাত—
গবগবিয়ে গিলি—ঘাসের আঁটি টেনে ছেড়া।

মস্ত লম্বা ছড়া। গরু ঘোড়া গাধা মানুষ সাপ ব্যাঙ ফড়িং পাখি নিয়েই ছড়ার বিচিত্র পাঠ্য আশ্রমে। বড় বড় বোর্ডে মোটা মোটা এবং গোটা গোটা হরফে লেখা ছড়ার সঙ্গে সুন্দর ছবি। সারা দেওয়ালময় টাঙানো। শুধু গরু ঘোড়া গাধা কুকুর বেড়াল মানুষ কেন, উপরের ক্লাসের বড় ছেলেরা যারা ইতিহাস পড়তে শুরু করে—তাদের জন্য রামায়ণ মহাভারত থেকে ভারতবর্ষের মোটামুটি ইতিহাস ছবিতে এঁকেছেন বিনো সেন। এদেশের সেই পুরনো পটের পদ্ধতিতে গোড়ানো পটে এঁকেছেন নিজে। এবং বেশ ছড়া বেঁধে গান করে সেগুলি দেখানো হয়, ছেলেদের চমৎকার লাগে।

সেদিন অর্থাৎ পৌঁছুবার পরদিন—যেদিন সে কাজ আরম্ভ করে—সেইদিনের কথা মনে পড়ছে। বিনো সেন নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরিচয় করিয়ে—।

গাড়িটা একটা কোন খানায় পড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে উঠল। কিন্তু তাতেও কোন ব্যাঘাত হল না। মনে পড়ছে। জীবনের এই মনে পড়া একবার শুরু হলে সে সহজে থামেনা। বিশেষ করে কোনও সংকট বা সংঘর্ষের মুহূর্তে বা লগ্নে যদি আরম্ভ হয়।

* * *

আবার মনোরঙ্গমঞ্চে স্মৃতি-প্রযোজকের প্রযোজনায় জীবন নাটক শুরু হয়ে গেছে।

পরের দিন থেকে শুরু হল কর্মজীবন।

বিনোদাই এসে তাকে ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি নীরা-দি, বুঝলে। ইনি তোমাদের অঙ্ক কষাবেন, ইতিহাস পড়াবেন। আর তোমাদের খেলার মাঠে তোমাদের তাড়াবেন চরাবেন খেলাবেন।

কাল তুই ষণ্ডাকে যা শায়েস্তা করেছেন শুনেছি আমি। দেখছ কতটা লম্বা --কেমন হাত। তিনি হাতখানা টেনে তুলে দেখালেন। আবার তেমনি সুন্দর মিষ্টি চেহারা এবং মন। তোমাদের ঝগড়া-ঝাঁটির বিচারও উনি করবেন। তোমাদের মা-মণিকে তোমরা বড্ড বিরক্ত কর। উনি শান্তশিষ্ট মানুষ ; এই সব দুর্দান্তপনা সইতে পারেন না। ওঁর প্রমোশন হল, উনি আপীল শুনবেন আর ওই ছোট বাচ্চাদের দেখবেন, মানে মোটামুটি সবই দেখবেন। আপিসে বসে থাকবেন। বুঝেছ ?

প্রতিমাও বিনো-দার সঙ্গে এসে ঢুকেছিলেন ক্লাসে। প্রসন্ন মুখেই এসেছিলেন। আগের দিনের অনিমাদির কথাগুলি মনে ক'রে একটু বিস্মিত হয়েছিল নীরা। কই রাগ তো করলে না প্রতিমা। হাসি মুখেই তাকে ক্লাসে বসিয়ে প্রতিমা বিনো সেনের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। নীরা বলেছিল—তোমাদের মতই আমার বাবা মা কেউ নেই। • খুব ছেলেবয়সে তাঁরা স্বর্গে গেছেন। সেই হিসেবে আমি তোমাদের সত্যিই দিদি। নয়? ছেলেরা তোতাপাখির মতই বলেছিল—হ্যাঁ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে সত্যিই আপনার জন হয়ে গিয়েছিল। এবং ক্লাস শেষে মনে হল এইই তার জীবনের সবচেয়ে ভাল লাগার কাজ, সবচেয়ে ভাল কাজ। যোগী যোগ করুক, ভোগী ভোগ করুক, সে এই করবে। আজীবন। আজীবন। কাজ তার ভারী ভাল লাগল। সারাটা দিন আনন্দের মধ্যে দিয়ে যে কোনদিকে গেল সে বুঝতেই যেন পারলে না। সব সময় ক্লাস ঘরে নয়, মাঠে গাছতলায়। ওরই মধ্যে একজন চাষী মাস্টার আছেন, তিনি ছেলেদের নিয়ে মাঠে খাটেন খাটান। তখন অনেক বাদাম হয়েছে, তোলা হচ্ছে। অণিমাদি দুপুরে ঢুলতে শুরু করেন, তখন গোলমাল করলে একেবারে রেগে খুন হন। দুহাতে পেটেন। কমলাদি বিকেলের দিকে মাড় হয়ে যান, দুর্বল মানুষ। নীরার ডিউটি আছে খেলার মাঠে, তাই এক ঘণ্টা আগে ছুটি। আপিস-ঘরে বইটইগুলি রাখতে এসে প্রতিমাদির সঙ্গে আলাপও হল। স্বল্পভাষী মেয়েটি। দেহে মনে খুব সবল নন বরং দুর্বল, তার উপর সারা-অন্তর-জোড়া দুঃখ। বললেন, তোমার কথা সব শুনলাম ওর কাছে। মানে তোমাদের বিনো-দার কাছে। ওঃ খুব শক্ত মেয়ে, বাহাদুর মেয়ে তুমি।

নীরা বললে, জলে ফেলে দিলে সবাই সাঁতার শিখে যায়। ভগবানই বলুন আর অদৃষ্টই বলুন আমাকে যে জলে ফেলে দিয়েছিল। কি করব, হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কূল পেয়ে গেলাম।

প্রতিমার এক বিচিত্র বিষণ্ণ হাসি আছে। যে হাসি মানুষের ভাল লাগে না। আজ কিন্তু এই মুহূর্তে তার সেই হাসি নীরার ভাল লাগল। সেই বিষণ্ণ হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠল—প্রতিমা স্থির দৃষ্টিতে, বোধ করি নিজের জীবনের দিকে তাকিয়েই ঘাড় নেড়ে বললেন—না। জলে ফেলে দিলেই সাঁতার শেখে না, শিখতে পারে না। তোমার কথা শুনেছি। তুমি নদীতে পড়ে নদীর টানে ভেসেছ—শক্তি ছিল সাঁতারও শিখেছ। কিন্তু যারা সমুদ্রে প'ড়ে? যার তল নেই কূল নেই কিনারা নেই! বাপরে!

বলে কথায় এক মুহূর্তের ছেদ টেনে আবার বলেছিলেন—আসল হল ভাগ্য। আর শক্তিও বটে!

হেসে নীরা বলেছিল—ভাগ্য ঠিক মানিনে। তবে বিয়ের আসর থেকে বেরিয়ে পর পর পুলিস অফিসার আর শিবনাথদাদু তারপর বিনো-দার দেখা পেয়ে আশ্রয় পেয়ে মনে হচ্ছে ভাগ্য থাক বা না-থাক সময় বলে একটা কিছু আছে। পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থার মত—। ওকি—ওকি? ওকি করলেন?

মধ্যপথে কথা অসমাপ্ত রেখে নীরা সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল—ওকি—ওকি—ওকি করলেন আপনি।

প্রতিমা খাতার পাতা ছিঁড়ছে। যে-খাতাখানা নিয়ে সে কাজ করছিল তারই উপর হাত রেখে কথা বলছিল। হঠাৎ সেই খাতার পাতাটা মুঠোয় খামচে ধরে ছিঁড়ে ফেলছে। অথচ তার দৃষ্টি—তার দিকে।

নীরার কথায় প্রতিমা দৃষ্টি নামিয়ে নিজের কাজটা দেখে সেই দিকেই তাকিয়ে থেকেছিল—বোধ করি ভাবছিল—করেছে কি ?

নীরা খাতাটা নিয়ে কোন রকমে মেরামত করবার অভিপ্রায়ে হাত বাড়িয়েছিল—দিন—দেখি—গাম্ দিয়ে জুড়লেই হবে।

স্প্রিংকে টানলে যেমন স্প্রিং আপনি গুটিয়ে নিয়ে টানে—তেমনি-ভাবেই প্রতিমার হাত খাতাখানা নিয়ে তার কোলের দিকে চলে গিয়েছিল। তার মন যেন ওদিকে ছিল না। হুঁস ছিল না যাকে বলে। খাতাখানা টেনে নিয়ে সে বলেছিল—শিবদাদুর বাড়িতে ওর সঙ্গে কবার দেখা হয়েছে তোমার ?

আজ এই কাণ্ডের পর গাড়িতে বসে চলবার সময় এ নিয়ে যত সূক্ষ্ম তত্ত্ব, লুকনো মানের কথা মনে হচ্ছে—সে-দিন এত মনে হয় নি। তবে একটু হয়েছিল। হাসি পেয়েছিল প্রতিমার এই আগ্রহ দেখে। আবার একটু বিরক্তও হয়েছিল।—ছি এত নীচ। ওই মানুষকে এমন সন্দেহ! আজ বুঝেছে সন্দেহের কারণ কি!

থাক—।

তার স্মৃতি বলছে—ব্যাখ্যা রাখ। অভিনয়ে ছন্দভঙ্গ হচ্ছে।

সেদিন সে আত্মসংবরণ ক'রে হেসেই বলেছিল—এই তো একবার। এবারই।

—সে কি ? কবারই তো উনি গেছেন কলকাতা! দিল্লির পথে।

—তা জানি নে। আমি তো দেড় বছরের মধ্যে দেখিনি। শক্ত মেয়ে নীরা আত্মসংবরণ করে হেসেই এরপর বলেছিল—জানেন, মিথ্যে কথা আমি বলি নে। যে বলে তাকে খুব ঘেন্না করি। আর সত্যি বললেও

যে বিশ্বাস না করে তাকে বলি দেখ—বিশ্বাস করে ঠকলেও তোমার জিত, আর অবিশ্বাস করে ঠকলে মাটির তলায় মুখ লুকিয়েও নিজের কাছে লজ্জা এড়ানো যায় না।

প্রতিমা কিন্তু ওসব কথার মানে বোঝা তো দূরের কথা বোধহয় শুনলেও না। কারণ তার চোখ মুখ যেন বলছিল সে ভাবছে। হঠাৎ একসময় যে ভাবছিল তা মনে পড়ল বোধহয়; ঘাড় নেড়ে বললে—

—ও হ্যাঁ। উনি যে এ-কবার আসানসোলে উঠেছেন, আসানসোলে নেমেছেন। তারপর হঠাৎ উঠে এসে তার হাত ধরে বললেন, তোমার সঙ্গে কাল আমার কথা বলা হয় নি। ছেলে দুটো এমন করলে! একটু হাসলেন, হেসে বললেন, কিছু মনে কর নি তো?

—না—না। সত্যিই আপনার যা নরম-স্বভাব আর ডেলিকেট শরীর তাতে ও সামলানো সম্ভবপর হত না। বোধ হয় ফেলে দিত আপনাকে। তবে বড় সুন্দর আপনি—ওদের তাতেই বশ মানা উচিত।

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন খোলা দরজার দিকে—তারপর বললেন, রূপ! তিক্ত হাসি ফুটে উঠল মুখে। নাঃ। সেই দুর্বোধ্য—না!

খেলার মাঠে সে কোমর বেঁধে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়াল না, যে যখন পড়ল তাকে গিয়ে তুললে! ধুলো ঝেড়ে বললে, যাও যাও, ফের যাও।

বিনো সেন একটা চুরুট মুখে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। খেলার শেষে বললেন, ওয়াণ্ডারফুল। কনগ্র্যাচুলেশনস।

সন্ধ্যের আগে খেলা শেষ হলে অনিমাদি বলেছিলেন—এস

এধার ভূত নাচানো হল, :এবার চল আমরা পেত্নীরা নেচে আসি। একটু একেবারে নির্জনে হেসে খেলে নেচে কেঁদে আর কি!

নীরা বলেছিল—মানে!

—মানে এস বেড়িয়ে আসি আমাদের কুঞ্জবনে। চমৎকার জায়গা।

ওরা মানে অনিমা কমলা ও সে তিনজনে এসেছিল গাছতলায়। গাছতলায় এসে যেই ওরা হাজির হল—অমনি প্রতিমা উঠল—

অনিমাদি হেসে বললেন—হয়ে গেল বেড়ানো?

প্রতিমা বললেন—হ্যাঁ বস তোমরা, অনেকক্ষণ এসেছি।

চলে গেল সে। অনিমা বললে—মরণ। তারপরই বললে—তবু তো আজ খেলার মাঠে শ্রীমতী নীরার মহিষমর্দিনী রূপ দেখে নি।

নীরা বললে—না-না। বাড়িয়ে বলেন সব আপনারা। আজ তো আমার বেশ লাগল। অনেক কথা হল। আমাকে বললেন—কিছু যেন মনে করো না!

অনিমাদি বললেন, কাল যে লেকচারিফায়িং হয়েছে। দেড় ঘণ্টা!

—মানে বিনো-দা?

—হ্যাঁ গো। রোজ একটি করে লেকচার। অবশ্য এই এলেন বলে। সকলের ঘরে এসে খোঁজ করবেন, হাসবেন হাসাবেন। লোকটা সাক্ষাৎ শিব, বুঝেছ! তারপর ওর ঘরে গিয়ে কোনদিন আধঘণ্টা কোনদিন একঘণ্টা। অবিশ্যি পড়ান—ধর্মশাস্ত্র গীতা জাতক। কিন্তু কে শোনে? ওই ছাই চাপা দিয়ে যান, ও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উড়িয়ে দেয়। কিছুতেই বুঝবে না বিনো সেনের মত মানুষ কাউকে ভালবাসেন না, বাসতে পারে না।

নীরা বললে, কেন বলুন তো? উনি কি এমন যে কাউকে ভালবাসেন না? দেবতা না অবতার না—কি যে কাউকে বাসতে পারেন না?

এ আলোচনা অবশ্যই দীর্ঘ হয়েছিল। অনেককথা যার সবটা আজ মনে নেই—অর্থাৎ নাটকে তার প্রয়োজনই নেই। জীবন নিয়ে যখন নাটক লেখা হয়—তখন ঝড়তি পড়তি যা কিছু ঝ'রে প'ড়ে যাওয়ার পর যেটুকু ভবিষ্যতকালের বীজ আর বর্তমানকালের ফসল জমা থাকে তাই। যেটুকু যায় তার জন্য খামতি হয় না। বরং বাড়তি কথা বাদ পড়লে নাটক তাতেই জমে ওঠে।

সন্ধ্যে একটু গাঢ় হয়ে এলে তারা ফিরেছিল। নূতন উৎসাহে সে ফেরবার জন্যে একটু অধীর হয়েই ছিল। আজ সন্ধ্যে থেকেই সে হরিচরণবাবুর কাছে পড়া শুরু করবে।

ফিরে এসে তারা অনিমার ঘরেই ঢুকেছিল। অনিমাদি ছাড়ে নি। বলেছিল—এস না ভাই। প্রেম যখন করনি, করবেনা—তখন তো পড়া রইলই সারাজীবন। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করবার থাকবে না। তার জন্যে এত তাড়া কেন?

বেশ অনিমাদি—এই মোটাসোটা হাসকুটে মেয়েটি। জীবনে ওঁর সুখ বড় না দুঃখ বড় হিসেব করা কঠিন। কমলাদিদিও পাশের ঘরে থাকে; বাড়িটা একটাই। সেও ডেকেছিল।

নীরা যেতে যেতেই বলেছিল—প্রেম করলে তাহলে বলছেন, পড়া হয় না?

অনিমাদি বলেছিল—উঁহু—। প্রেম থাকলে পড়া দিনের আকাশে তারার মত। বড় জোর হলুদ-মাখানো কুমড়োর ফালি মানে চাঁদের

মত বলতে পার, আর পড়ায় ডুবলে প্রেম তো রাতের আকাশে সূয্যিঠাকুর। রাতের ভাসুর। লেখাপড়া শিখলেই তো মাস্টারনী মেজাজ। বরের সঙ্গে হেডমাস্টার সেকেণ্ড মাস্টারের মত খিটিমিটি। শেষ পর্যন্ত রেজিগ্‌নেশন। ছাড়াছাড়ি। ও হয় না হে ও হয় না।

হেসে উঠে নীরা বলেছিল—সে না হয় হল—কিন্তু আমাকে হে বলছেন কেন? আমি কি পুরুষ হয়ে গেছি?

অনিমা বলেছিল—হলে তো বেঁচে যেতে, ফাঁড়া কেটে যেত। বুক ফাটলে বলতে পারতে—।

বাধা দিয়ে নীরা বলেছিল—তবে?

—হে, এদেশে বলে। এটা রাঢ় দেশ।

—মেয়েরা মেয়েদের হে বলে?

স্বল্পভাষিণী রুগ্না কমলা বসে এতক্ষণ নিজের মনেই মাথা টিপছিল—সে এবার বলেছিল—এদেশে বলে।

অনিমা বলেছিল—হুঁ-হুঁ। শিখবে। শিখতে হবে। রা, সান্, সব শিখবা। বিনো স্যান ঠিক তালিম লাগায়েঁ দিবেক হে। কিছু ভেবো নাই। আর আমি তুমাকে গায়েন শিখায়েঁ দিবো। বুঝলা!

কমলা বলেছিল—চমৎকার ঝুমুর শিখে নিয়েছেন অনিমাদি। যা নাচেন!

—সত্যি? গান না অনিমাদি!

অনিমাদিদিকে এসব কাজে দুবার বলতে হয় না। বললে—দে দরজাটা দে। জানালাটাও।

এবার দাও থেকে দে বলতে শুরু করলে অনিমাদি। তারপর

কোমরে কাপড় জড়িয়ে তাকে টেনে ঘরের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে নিজে মেঝেতে বসে পড়ল—এবং একখানা হাত বাড়িয়ে বললে—যখন বলব হাতে ধরে তুলতে—তখন তুলবি কিন্তু।

বলেই গান ধরে দিল—

পীরিতি হল শূল গো
সখি পীরিতি হল শূল
আমি বসিলে উঠিতে লারি
আমার হাতে ধরে তুল গো হাতে ধরে তুল।

হাত ধরে তুলে দিতেই অনিমাদি নীরার গলা জড়িয়ে ধরে আবার সুরু করেছিল—

সখি আমার এঁলায়ে দে চুল
আমি গুঁজিব না ফুল।

বিষে অঙ্গ জ্বর জ্বর—ডংশিছে ভীমরুল। তারপর সে ধেই ধেই করে নাচ। নীরা আর আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। খিল খিল হেসে প্রায় গড়িয়ে পড়েছিল। মোটা অনিমাদির নাচের সঙ্গে ছেলেবেলার দেখা ভালুক নাচের কোন তফাৎ ছিল না। অনিমাদি তা নিজেও জানত। কিন্তু সে নির্লজ্জ। সখিদের কাছে তার লজ্জাও ছিল না, রাগও না, আশ্চর্য মানুষ। অনিমাদি নেচেই চলেছিলেন। হঠাৎ বাইরে উচ্চগলায় ডাক পড়েছিল—অনিমাদিদি! সর্বনাশ। বিনো সেন। বিনোদা। মুহূর্তে সব স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। অনিমাদি কালিমায়ের মত জিভ কেটে তাড়াতাড়ি গাছ কোমর বাঁধা কাপড়ের পাক খুলে সামলে নিয়ে খোলা চুলে ঝুঁটি একটা বেঁধে নিয়েছিলেন।

দরজায় ধাক্কা দিয়ে বিনো সেন ডেকেছিলেন—কি ব্যাপার ? নাচ হচ্ছে বুঝি অনিমাদি'র ?

অনিমাদি'ই এবার দরজা খুলে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিলেন —না-তো !

বিনো সেন ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আর না তো ! এখনও হাঁপাচ্ছ তুমি !

তারপরই নীরাকে দেখে হেসে বলেছিলেন—ওরে বাপরে। এযে একেবারে ত্রিমূর্তি ! নীরা সমেত ! অনিমাদি চতুর। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠেছিল—ত্রিমূর্তি নয়। তিন কন্যে। এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান, এক কন্যে রাগ করে বাপের বাড়ি যান। একজন থামতি ছিল—এবার পূরেছে।

—তা হলে শিবঠাকুর খুঁজি আমি। কিন্তু—

—কি কিন্তু ?

—নীরা কন্যে যা কন্যে—তাতে ও সতীনও নেবে না—বুড়ো শিবও নেবে না। দেখেছেন তো খেলার মাঠে ? ওঃ, চুলগুলো যা উড়ছিল একরাশ কালো চুল। ওয়াণ্ডারফুল।

নীরা বললে, ওসব বললে আমি কিন্তু খেলার মাঠের ভার নিতে পারব না।

—আচ্ছা আচ্ছা বলব না। তবে খুব খুশি হয়েছি। তুমি আমার প্রবলেম মিটিয়েছ। মেটাতে পারবে আন্দাজ আমি করেছিলাম। ছেলেরা তোমাকে পেয়ে খুশি হবে ভেবেছিলাম। তা হয়েছে। এখন চল, মাস্টারমশায়ের কাছে—পড়বে। বসে আছেন তিনি ! তুমি আমার সমস্যা মেটালে—এখন তোমার সমস্যা মিটলে আমি আরও খুশি হব। চল।

অনিমাদি বললেন, প্রতিমাদির বাড়ি যাবেন না?

—সেরে এসেছি।

সৌম্যমূর্তি বৃদ্ধ বসেছিলেন চুপ ক'রে। বিনো সেন তাকে বারবার বলে দিয়েছিলেন—দেখো স্মৃতির ঘরের দোরে ধাক্কা দিয়ো না। পুরনো কথা তুলো না! কেমন?

নীরা অন্ধকারে পথ চলতে চলতেই নীরবে সায় দিয়ে ঘাড় নেড়েছিল!

নীরাকে পৌঁছে দিয়েই বিনো সেন চলে গেলেন। শুধু বলে গেলেন—এ মেয়ে আশ্চর্য মেয়ে কঠিন মেয়ে। একে যেমন শেখাবেন তেমনি শিখবে। আমি বলতে পারি মাস্টারমশাই আপনি খুশি হবেন পড়িয়ে।

অল্প কয়েক মিনিটের মধ্যেই পড়া স্থুরু হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকা না, পরিচয় না, শুধু বললেন—পড় মা। স্থুরু কর।

নীরা স্থুরু করে দিল। তারপর সে এক অন্য জগৎ—এই জগতের মধ্যেই যেন আর একটা জগতের দোর খুলে গেল। সেখানে গুরু আর ছাত্রী। ঘণ্টা আড়াই পর বৃদ্ধ বললেন—এইবার থাক মা!

নীরবে বই বন্ধ করলে নীরা। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—পড়তে ভাল লাগল মা?

নীরা বলে ফেললে—এ ভাবে তো কেউ কখনও পড়ায় নি! এমনভাবে পড়ানো যায় তাও আমি জানতাম না।

বৃদ্ধ বললেন—উপনিষদে আছে মা—গোড়াতেই গুরু শিষ্য দুইকেই প্রার্থনা করতে হয়। প্রার্থনা করতে হয়—আমাদের দুজনের আকৃতি

যেন সমান হয়—আসন যেন সমান হয়—ছোট বড় নয়। সমান। শেষ কথা মা বিদ্বিষাবহৈ। আমরা যেন পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ না করি। অনুরাগ থাকা চাই।

নীরা তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে আবেগ বশে বলে ফেলেছিল—বাপ মায়ের কাছে আমার ঋণ হল জন্মের প্রাণের। আর কারও কাছে ঋণ আমার ছিল না। আজ নতুন খত লিখলাম। ঋণ পেলাম। শোধ—

—না—মা। শোধ-টোধ নয়। দিতে কিছু চেয়ো না। একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। তারপর চুপ করে রইলেন। অনেকক্ষণ পর বললেন—নেবার আর কিছু নেই মা। সব গেছে, নেব কার জন্যে? নিয়ে করব কি? সবই বাহুল্য মনে হয়। তবে যেটুকু আছে, যতক্ষণ পারি দিয়ে যাই। তুমি যখন সুবিধে হবে আসবে। পড়াতে পেলে সব ভুলে থাকি। তুমি আমায় বাঁচালে!

পড়া শেষ করে যখন ফিরল তখন প্রায় দশটা। বাইরে বিনো-দার গান শোনা যাচ্ছে, একটু এসেই দেখলে আপন বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি গান গাইছেন, 'কান্নাহাসির দোল দোলানো পৌষ ফাগুনের পালা।' ছোট একটি চিমনি জ্বলছে টেবিলের উপর। একখানা বইও নামানো। ওদিকে বারান্দার প্রান্তে ছবির ইজেল। এবং রঙ তুলি। তিনি উঠে এসে বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইছেন। তিনি তার পায়ের শব্দে তাকালেন বোধহয়। একটা মাটির খোলা তার পায়ের শ্লিপারের চাপে মড়মড় শব্দে ভেঙে গেল। সেই শব্দে মুখ ফিরিয়ে বিনো সেন বললেন—কে? নীরা?

—হ্যাঁ।

—পড়া শেষ করে ফিরছ বুঝি?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু আলো নেই কেন? এখানে সাপ আছে।

—এইটুকু তো পথ।

—না। দাঁড়াও। একটু আগে একটা বড় সাপ বেরিয়েছিল মাঠে। টর্চটা নিয়ে পথে নামলেন। চলতে চলতে প্রশ্ন করলেন, কেমন পড়লে?

—খুব ভাল।

—হ্যাঁ, খুব ভাল পড়ান উনি। জান, সংসারে উজাড় করে দিতে চেয়েও সবাই তা পারে না। সেইটেই মানুষের বোধহয় সব থেকে বড় ট্রাজেডি। যারা পারে তারাই মহত্তম মানুষ। উনি তাই। ওঁদের ট্রাজেডি উল্টো, ওঁরা যত দিতে চান তত নেবার লোক মেলে না। হয় তোমার মধ্যে—তেমনি ছাত্রী পাবেন। পড় ওঁর কাছে ভাল করে।

তারপর হঠাৎ বললেন, দেখ প্রতিমাকে একটু সহ্য করে চলো। করুণা করো। ও বড় দুঃখী। ও—। মানে কথাটা তোমাকে বলাই উচিত, ও ঠিক তোমাকে পছন্দ করে নি। প্রশ্ন করো না। শুধু জেনে রাখ। কেমন? যাও।

ঘরে এসে বসে পড়ে খানিকটা স্তব্ধ হয়েছিল সে। ভুরু দুটি কুঁচকে উঠেছিল।—কেন? পছন্দ করেন নি? তিনি কি ভাবেন—সে বিনো-দাকে ভালবাসে? না। সে পড়িয়ে পড়তে এসেছে। জীবনে সে পথ করে নেবে।

নক্ষত্রের আলো ডাকে আঁধার সমুদ্র বক্ষে
নূতন দিগন্তে যারা তরণী ভাসালো।

বিনো সেন তার জীবনাকাশের দিগন্তে একটি নূতন নক্ষত্র। তার আলোতে আজ সে পথ দেখে চলেছে। প্রতিমাদি, কাল সে তাকে পিছনে রেখে চলে যাবে। বিনো সেন তোমার জীবনের ধ্রুবতারা, তার নয়। নারী-জীবনে একের ধ্রুবতারা অন্যের নয়!

বিনো সেন তখনও গাইছেন—এই কি তোমার খুশি—আমায় তাই পরালে মালা সুরের গন্ধ ঢালা।

বারো

আশ্রমের কর্মসূচী ধরা বাঁধা ছকে কাটা ঘরের মত। সেই ভোরে ওঠা—তাড়াতাড়ি মুখ হাত ধোয়া। তারপর কাপড় ছেড়ে, মাথায় চিরুনিটা বুলিয়ে বেরিয়ে পড়া। ওদিকে ঘণ্টা পড়েছে। ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো ঢনো। ন্-ন্-ন্-ন্-ন্।

প্রতিমা ছোট ছেলেদের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ছেলেরা আসছে প্রণাম করছে। উনি মাথায় হাত দিচ্ছেন।

আশীর্বাদও হচ্ছে আবার ছেলেদের কপালের উত্তাপও দেখা হচ্ছে। মাটির পুতুলের মত বসে যন্ত্রের মত করে যাচ্ছেন।

নীরা ওদের স্তোত্র পাঠ করিয়ে খাবার ঘরে দাঁড়িয়ে জল খাওয়াতো। খাবারের ব্যবস্থা নিতান্ত রুগ্ন বা দুর্বলদের জন্য দুধ—দু-তিন জনের জন্য, তার সঙ্গে ডিম। বাকী সকলের ছোলা-ভিজে গুড় রুটি। মধ্যে মধ্যে সময়ের ফল। কাঁকুড়, ফুটি, শসার টুকরো, আমের সময় আম—তারপর জাম, আষাঢ়ে কাঁঠাল। তারপর খানিকটা হৈ-হৈ।

বিচিত্র খেলা হত। এটা খেলাতেন বিনো সেন নিজে।

সাপ আর ব্যাঙের খেলা। বাঘ আর হরিণের খেলা। জল আর পাহাড়ের খেলা। সব তাঁর নিজের আবিষ্কার।

ছেলেরা সব ব্যাঙ হত। বসে পড়ত মাঠময়। এবং গ্যাঙোর গ্যাঙ গ্যাঙোর গাঙ চীৎকার করত। এক একদিন বিনো সেন সাপ হতেন। নইলে কোন বড় ছেলে।

গান ধরত সে এবং এঁকেবেঁকে ছুটত।

হিলি বিলি কিলি— —

হাত নেইকো পা নেইকো বুকে হেঁটে এঁকেবেঁকে চলি—

হঠাৎ দাঁড়িয়ে তুলত এবং ফোঁস ফোঁস করে নিয়ে গাইত—

মেরুদণ্ড নেইকো আমার নেইকো মাথার খুলি

তবুও লেজে ভর দিয়ে মাথা তুলে ফোঁসফুসিয়ে তুলি।

ব্যাঙরা লাফাতে লাফাতে চলত। আর ডাকত।—

কে কার কড়ি ধারে? কে কার কড়ি ধারে।

সাপ এসে জাপটে ধরত একটা ব্যাঙকে। বাকী ব্যাঙেরা থপ্ থপ্ করে লাফিয়ে পালাত।

তারপর চলত লড়াই। রেফ্রী হুইসিল দিয়ে বলে দিত ব্যাঙ মরেছে। বা সাপ এবং ব্যাঙ দুইই মরেছে। মানে—সাপটার হাঁয়ের চেয়ে ব্যাঙটা বড়—তাই গিলতে না-পেরে সাপ ব্যাঙ দুই মরেছে। কারণ সাপ ধরে ছেড়ে দিতে পারে না। সাপ ব্যাঙ দুই মরলে বাকী ব্যাঙগুলো এসে মরা সাপের উপর লাথি মেরে আবার ডাকত গ্যাঙোর গ্যাঙ—কে কার কড়ি ধারে। না-হলে দূরে বসে ডাকত—কড়র। কড়র। কড়ি নে। কড়ি নে।

রেফ্রী হতেন বিনো সেন নিজে। যেদিন তিনি সাপ হতেন সেদিন রেফ্রী হতেন প্রতিমাদি। এ সময়টায় নীরা অবকাশ পেত। সে পড়ত। নিজের পড়াটাই বেশী—কিছুক্ষণ ইস্কুলে ছেলেদের যা পড়াতে হবে দেখে নিত। ক্রমে ক্রমে সবই বেশ সয়ে এসেছিল—বা আসছিল। প্রতিমাও অনেকখানি সহ্য করতে পেরেছে অবশ্য মধ্যে মধ্যে তির্যকভঙ্গিতে তাকানো—সেটা যায় নি। কখনও কখনও

বিনো সেনের সঙ্গে সে যখন কথা বলত—তখন অকস্মাৎ নজরে পড়ত আড়ালে একখানা কাপড়ের আঁচল অথবা কোন গাছের আড়ালে একটা মানুষ বা গাছের কাণ্ডের ছায়ার সঙ্গে একটি মানুষের ছায়া। নীরা কতদিন বলেছে মৃদুস্বরে—প্রতিমাদি !

বিনো সেন সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য মুখে প্রসন্ন কণ্ঠে ডাকতেন—প্রতিমা নাকি ? এস-এস। বস। কি কাণ্ড, দাঁড়িয়ে কেন ?

প্রতিমা প্রথম প্রথম বাধ্য হয়ে বসত। বিনো সেন তাকে সামনে রেখে আলোচনা একটু দীর্ঘায়িতই করতেন ইচ্ছে ক'রে। কিছুক্ষণ পর প্রতিমা উসখুস করত, একসময় বলত—আমি যাই।

—আরে বস বস। তাড়া কিসের ?

তাকে যেন কেউ হাত পা বেঁধে জলে ডুবিয়ে ধরছে এমনি অবস্থা হত প্রতিমার—সে হাঁপিয়ে উঠে বলত, না কাজ আছে আমার। আমি যাচ্ছিলাম আপনি ডাকলেন—।

—তা হলে আর আটকাই কি ক'রে ? আমার কিন্তু একটু কাজ ছিল। যদি একটু চা ক'রে খাওয়াতে।

ক্রমে আড়াল দিয়ে শোনাটাও কমেছিল। কারণ নীরা এবং বিনো সেনের কথার মধ্যে হাস্যপরিহাসের অভাব থাকত না—কিন্তু তবুও তার মধ্যে প্রেমের গন্ধ প্রতিমাও খুঁজে পেত না। কারণ পরিহাসের বিষয়ের মধ্যে প্রতিমার কথা কম থাকত না। বেশীই থাকত।

মনে পড়ছে একদিনের কথা।

বিনো সেন বোধ করি দিন কয় দাড়ি কামান নি। এবং ময়লা পাজামা পাঞ্জাবী পরেই কাটিয়ে দিচ্ছিলেন। মধ্যে মধ্যে এমন করতেন বিনো সেন।

.আজ এতদিন পর বিনো সেনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হবার পর নীরা বুঝেছে ওটা তাঁর জীবনের বহু ছদ্মবেশের একটা ছদ্মবেশ। উদাসী বৈরাগীর সঙ্গে সাধুতার একটা অভিনয়।

আজ এই আশ্রমে ছ' বছর ধরে জীবনে ভাল আর মন্দ সং আর অসতের যে নিরন্তর সংগ্রাম—তার মধ্যে সতের প্রভাবই বড়—সে-ই একদিন অবশ্যম্ভাবীরূপে জিতবে এই ধারণাই তিলে তিলে গড়ে এসেছিল নীরা—ওই বিনো সেনকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে এসেছিল। আজ একদিনে সব ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সৎ নেই সততা নেই। মিথ্যের মুখোশ। শুধু অভিনয়।

বিনো সেন—তোমার জীবনটাই তো একটা নাটকের একটা অংশ—একটি মুখোশধারী চরিত্র। নিপুন অভিনেতা তুমি।

* * *

থাক। নাটকে ফিরে এস নীরা। মনোমঞ্চের স্মারক বলছে নাটকে ফিরে এস।—কদিন ধরে দাড়ি কামান নি বিনো সেন। ময়লা পাঞ্জাবী পাজামা পরে যেন এক উদাসী বৈরাগী। অথবা আত্মভোলা শিল্পী। শিল্পধ্যানে বিভোর। এ মানুষকে তো শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। এককালে "আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান তার লাগি কাড়াকাড়ি" যারা করেছিল তাদের একজন—তারপর—মহাত্মার মধ্যে পুনরুজ্জীবিত ভারত-তপস্যায় দীক্ষিত একজন, তার উপর শিল্পী। এই মানুষের উপর কার না শ্রদ্ধা হয়। কে অবিশ্বাস করে? তারও বিশ্বাস ছিল এই বৈরাগ্য এসেছে তাঁর নতুন শিল্পসৃষ্টির গভীর আকর্ষণের ফলে। একটা বড় ছবির কল্পনা মাথায় এসেছে, কিন্তু সেটা পরিপূর্ণ হয়ে

উঠছে না,—ঠিক যেটি মন চায় সেটি কল্পনায় স্পষ্ট হচ্ছে না, তিনি আহার নিদ্রা ভুলেছেন, সাজ পোষাক দেহ মার্জনা তো তুচ্ছ কথা।

হরিভূষণবাবুর কাছে যাবার পথে নীরা দেখেছিল—বিনো সেন ওই চেহারা নিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন আর চুরুট টানছেন।

সে প্রলোভন সম্বরণ করতে পারে নি, এসে তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিল। এবং একান্তভাবে কৌতূহলী কিশোরী মেয়ের মত আগ্রহভরে বলেছিল—নতুন ছবি আঁকবেন বুঝি?

মুহূর্তের জন্য শূন্য দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন বিনো সেন।

সেও অভিনয়। আজ আর তার সন্দেহ নেই।

তারপরই বিনো সেনের চোখ দুটি সচেতন কৌতুকে ঝলমল করে উঠেছিল। সে যেন এক দুষ্টু ছেলের চোখের ঝিকিমিকি। বলে উঠেছিলেন।—হুঁ। ঠিক ধরেছ।

—কি ছবি বলুন না।

—সেই তো ভেবে পাচ্ছিলাম না এইমাত্র পেলাম। মানে তুমি জিজ্ঞাসা করলে আর পেয়ে গেলাম। তোমার ছবি।

—আমার ছবি? আমার ছবি হয়?

—হয়। আঁকব। কিন্তু সমস্যা হয়েছে। কোন্ রূপে আঁকব? কাপড়-বাঁধা পাষণ্ডদলনী কিম্বা তপস্বিনী কিম্বা কি? সেই রূপটা যে আবিষ্কার করতে পারছি নে।

—আপনার সব তাতেই ঠাট্টা।

—কেন ?

—ছবি হল রূপের প্রকাশ। সুন্দরের প্রকাশ—আমার মধ্যে রূপ কোথায়—সুন্দরকে পাচ্ছেন কি করে ?

—আছে গো আছে। নন্দবাবুর মহাত্মাজীর ডাণ্ডী অভিযান ছবি দেখেছ ?

—দেখেছি।

—তবে ?

ঠিক এই সময়েই প্রতিমার আভাস পাওয়া গিয়েছিল বাড়ির কোণের মোটা শিরীষ গাছটার আড়াল থেকে সাদা শাড়ীর আঁচলের দোলায়। বিনো সেন বলেছিলেন—প্রতিমার মত রূপ বর্ণে-ছটায় সকলের নেই। কিন্তু তবু রূপ সবারই আছে। আমি যে আমি আমারও একটা রূপ আছে। ঘুমিয়ে যখন আমার নাক ডাকে—তখন সেটা ফুটে ওঠে। নাকে গর্জন হয়। মুখ হাঁ হয়ে যায়, মধ্যে মধ্যে গাল ছুটো ফোলে। সে ওয়াণ্ডারফুল।

প্রতিমার আভাস সম্পর্কে সচেতন হয়েও নীরা হেসে উঠেছিল। হেসে বলেছিল—কিন্তু সেটা নিরীক্ষণই বা করলেন কি করে ? আবিষ্কারই বা করলেন কখন ?

—এই কাল রাত্রে। স্বপ্নে। স্বপ্নে দেখলাম। বুঝেছ। অবিকল কুম্ভকর্ণ।

—রূপ যাদের থাকে তারাই নিজের রূপের এত কুৎসা করে।

—বিশ্বাস কর। কতবার কত অজানা জায়গায় অজানা পুকুরে ডোবায় নদীতে আমি ডুব দি। বলি তুমি যদি রূপসায়র হও—তবে আমার রঙ করে দাও প্রতিমার মত। চোখ ডাগর করে দাও—

প্রতিমার মত। এবার অবশ্য তার সঙ্গে যোগ করব, টাক পড়া মাথায়—চুল করে দাও নীরার মত।

তারপরই চকিত হয়ে বলেছিলেন—আরে ওখানে কে? প্রতিমা। এস—এস। আরে তোমার রঙ তোমার চোখ তোমার গড়নের হিংসেয় যা গোপনে করি সেগুলো তুমি শুনে নিলে না কি?

এর পর প্রতিমাকে আসতে হয়েছিল। বসতে হয়েছিল। বলেছিল—যাচ্ছিলাম ওদিকে, হঠাৎ কানে এল—আমার কথা হচ্ছে। কি জানি অপ্রস্তুত হও তোমরা—তাই—

—ভাগ্যে নিন্দে করিনি তা হ'লে। তারপরই নীরাকে বলেছিলেন—এই দেখ না—প্রতিমাকে এক রাবণের চেড়ী বাদে যে রূপে আঁকতে চাইবে—তাইতেই মানাবে ওকে। মধ্যে মধ্যে মনে হয় নতুন করে যশোদা— ম্যাডোনা রূপে আঁকি ওকে। কিন্তু ওর এক বিষণ্ণ রূপ ছাড়া অন্যরূপে প্রকাশ নেই।

প্রতিমার সুন্দর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ঘামতে সুরু করেছিল। নাকের ডগায় পেটি ছুটিতে ঘামের আভাস স্পষ্ট দেখা গিয়েছিল।

নিভে-যাওয়া চুরুটটা নতুন করে ধরিয়ে বিনো সেন আবার বলেছিলেন—এবার যেন একটা কাহিনীর পটে ওকে ধরা যায় বলে মনে হচ্ছে। ঘাড় নেড়ে যাচাই করে দেখার একটা স্বভাব আছে মানুষের; মনের কল্পনাকে মনে মনে সেটা ঠিক কি বেঠিক খতিয়ে দেখে—হয় 'হ্যাঁ' বা 'না' এর ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ে মানুষ। বিনো সেনও সেই ভাবে—'হ্যাঁ' এর ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে আবার বললেন—হ্যাঁ—। পেয়েছি এবার! হ্যাঁ। নীরার কৌতূহলের সীমা ছিল না। প্রতিমাকে কোন্ কল্পনার চালচিত্রের সামনে দাঁড় করাবেন! সে বলতে যাচ্ছিল—

বলুন না শুনি! কিন্তু প্রতিমার মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলতে পারে নি। প্রতিমার চোখ দুটি নিষ্পলক হয়ে বিস্ফারিত হয়েছে—তার মধ্যে ফুটে উঠেছে বিচিত্র অভিব্যক্তি,—ভয় না বিস্ময় তা বুঝা যায় না, হয় তো বা দুটোই। আনন্দও খানিকটা থাকবার কথা—তাও হয় তো ছিল;—বিনো সেন তার ছবি আঁকবেন—আনন্দ নিশ্চয় ছিল কিন্তু তা ছিল ভয় বিস্ময়ের সঙ্গে মিশে। ত্রিধারা সঙ্গমে লুপ্তবেণী সরস্বতীর মত।

বিনো সেন টেবিলের উপর থেকে একখানা বই হাতে করে নিলেন—ঝকমকে বাঁধানো বই। বললেন—বইখানা পড়ছিলাম। বড় ভাল বই। সংস্কৃত সাহিত্যের অপরূপ রোমান্স। কবি বাণভট্টের কাদম্বরী। নায়িকা কাদম্বরী, উপনায়িকা 'মহাশ্বেতা'। আশ্চর্য চরিত্র মহাশ্বেতার। যাকে সে ভালবাসে—যে তাকে ভালবাসে, সেই পুড়ে ছাই হয়ে যায় তার সেই ভালবাসার উত্তাপে দাহে। প্রেমের তপস্যা কোথাও সমুদ্র কোথাও আগুন। সে আশ্চর্য।—সে ভালবেসেছিল এক ব্রাহ্মণ কুমারকে—পুণ্ডরীক—। পুণ্ডরীকের মৃত্যু হল তার সঙ্গে মিলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। গন্ধর্বকন্যা মহাশ্বেতা। সে প্রিয়তমের মৃত্যুতে সাজল তপস্বিনী। তপস্যা ক'রে প্রিয়তম পুণ্ডরীককে বাঁচাবে। মৃত্যুলোক থেকে আবার আনবে জীবনলোকে। এল, আসতে হল পুণ্ডরীককে পুনর্জন্ম নিয়ে—। এবং সে যখন এল মহাশ্বেতার আশ্রমে—হঠাৎ তাকে দেখলে, পূর্বজন্মের আকর্ষণ জাগল, উথলে উঠল—সে আত্মহারা হয়ে দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে গেল মহাশ্বেতাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। মহাশ্বেতা শিলাসনে বসে তপস্যা করছিল; তার ধ্যান ভঙ্গ হল; এবং হতচকিত হয়ে গেল; একজন যুবা তাকে

আলিঙ্গন করতে আসছে। চিনতে দেরী হল একমুহূর্ত! সেই এক মুহূর্তেই তার চোখ থেকে বের হল তার ক্রোধের সঙ্গে তপস্যার তেজ; সেই তেজে পুড়ে ছাই হয়ে গেল পুণ্ডরীক। বল তো, কি মর্মান্তিক! কি বেদনা মহাশ্বেতার! কি ভাগ্য! ওঃ!

মুগ্ধ হয়ে শুনছিল নীরা। গল্পটি অপরূপ। হঠাৎ চেয়ার ঠেলার শব্দে সে চকিত হয়ে মুখ ফেরালে। প্রতিমা; প্রতিমা চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার মুখের দিকেও চাইবার অবকাশ সে পেলে না, প্রতিমা প্রায় ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে! সে বিস্মিত হয়েছিল।

বিনো সেন ডেকেছিলো তাকে—প্রতিমা! প্রতিমা!

প্রতিমা—না-না এর ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়েছিল কিন্তু থামে নি বা ঘুরেও দাঁড়ায় নি। নীরার বুঝতে বাকী থাকে নি যে সে কাঁদছে। এবং সে কান্না প্রতিমা কাউকে দেখাতে চায় না।

বিনো সেন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন—বড় দুর্ভাগিনী মেয়ে। ওকে দেখে ভাগ্য ছাড়া আর কোন কারণ খুঁজে পাইনে। ও আমার বন্ধুর বোন, ছেলেবেলা থেকে জানি, চিনি। ভারী মিষ্টি স্বভাব, অপরাধ বলতে যদি কিছু থাকে সে ওর অগাধ ভালবাসা আর ওর ভাগ্য। ওর দাদা ছিলেন আমাদের দাদা—মানে বিপ্লবী নেতা। ধরা পড়লেন বোমা মারতে গিয়ে—ফাঁসী হল। সংসারে রয়ে গেল বিধবা মা আর কুমারী মেয়ে। দেখাশুনার ভার ছিল আমার উপর। মানে দল থেকে হুকুম ছিল আমার উপর। হঠাৎ সেবার উত্তর বঙ্গের এক বন্ধু আমার সঙ্গে গেলেন আমাদের দেশে বরিশালে। পূর্ব বঙ্গ দেখবেন। নাম বলব না। শিল্পী। নতুন নাম হচ্ছে। আর

তেমনি অগাধ আকর্ষণের শক্তি। বরিশালে এসে—ওই প্রতিমাকে দেখলেন। মুগ্ধ হলেন। প্রতিমাও মুগ্ধ হল। ভদ্রলোক যেচে বিবাহ করলেন! আর একজায়গায় বিবাহের কথা ছিল—প্রতিমা বললে—সেখানে বিয়ে হলে ও বিষ খাবে। বিয়ের পর ওরা কলকাতায় এল, আমি মাস কয়েক পর এ্যারেস্টেড হলাম। ১৯৩০ সাল। তারপর আমার জীবন থেকে ওরা দুজনেই একরকম মুছে গিয়েছিল, হারিয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ প্রায় কুড়ি বছর পর ওকে দেখলাম ও বিধবা। পথের ধারে ভিক্ষা—হ্যাঁ ভিক্ষা—। থেমে গেলেন বিনো সেন।

বোধহয় অন্তরে আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। একটু পর বললেন—ওর দাদা আমার দীক্ষা-গুরু ছিলেন। আবার একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—আমার বন্ধু যে ওকে বিয়ে করেছিল তাকে বিবাহ করতে আমি নিষেধ করেছিলাম। ও শোনে নি। মানে ব্যাধি ছিল তার। আমি জানতাম। কিন্তু আমার কি হাত?—ওর ভাগ্য সর্বনাশা ভাগ্য!

তারপর একেবারে চুপ ক'রে গেলেন।

নীরাও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইল। কি বলবে? বলবার কিছু ছিল না—সে ভাবছিল—। ভাবছিল মেয়েরাই বোধহয় মেয়েদের নিন্দা সব থেকে বেশী রটনা করে। পুরুষরা নয়। নইলে অনিমাদি কমলাদি প্রতিমাকে নিয়ে এই সব জঘন্য রটনায় সরস রসনায় মুখর হয়ে উঠতেন না এই ভাবে।

ছি-ছি-ছি।

তেরো

ভুল হয়েছে তার। ভুল হয়েছিল বিনো সেনের কথায় বিশ্বাস করা আর অনিমাদিদের কথায় অবিশ্বাস করা।

বিনো সেন, আজ তুমি লোকেদের বললে—যান এইবার সব আপনার আপনার বাসায় যান, অভিনয় তো শেষ হয়ে গেছে। অর্থাৎ অভিনয় করে এল নীরা। কিন্তু তুমি সুদীর্ঘদিন এই সাধু দেশসেবক শিল্পী গুণী জনের মুখোশ পরে দেশসুদ্ধ মানুষকে প্রতারণা করে এলে—সেটা কি ? অভিনয় নয় ? ওঃ, তুমি ধুরন্ধর অভিনেতা। কেমন ক'রে নরনারীর চিত্ত জয় করতে হয় অন্তত নারী চিত্তকে যে কিভাবে হরণ করতে হয় তার কৌশলী শিল্পী তুমি। সুনিপুণ, সুচতুর ! নাটক নীরার জীবনে আছে—সে এসেছে স্বাভাবিকভাবে : বিনো সেন, তুমি সেই নাটকে সচেতনভাবে জেনে শুনে ভাল লোকের সাজ সেজে এসে ঢুকেছ। নীরা স্বীকার করছে ; আজ এই অন্ধকার রাত্রে আশ্রম ছেড়ে নূতন অঙ্কে নূতন পটভূমিতে প্রবেশের মুখে স্বীকার করছে যে তুমি সচেতনভাবে যে অভিনয় করেছিলে তা অত্যন্ত স্বাভাবিক হয়েছিল, নীরা বিশ্বাস করেছিল তোমাকে।

সেদিন বিনো সেনের ওখান থেকে আসবার সময় কাদম্বরী বইখানি সে নিয়ে এসেছিল পড়বার জন্য। অপরূপ রোমান্টিক গল্প তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমাসবদ্ধ বিশেষণ-বহুল রচনা ভাল লাগে নি।

কয়েকদিন পর নীরা বইখানি ফিরিয়ে দিতে গিয়েছিল। বিনো সেন ক্লান্তভাবে শুয়েছিলেন সেদিন। মাথার কাছে গুচ্ছবাঁধা শালের মঞ্জরী। মৃদুগন্ধ উঠছিল। শাল বনে সদ্য তখন মঞ্জরী দেখা দিয়েছে। তখনও দুর্লভ। দুটো চারটে গাছে একেবারে সেই ডগায় দু-দশটা মঞ্জরী সবে উঁকি দিচ্ছে। বিনো সেনের বহু ভক্ত, সে শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ কৃশ্চান থেকে সাঁওতাল পর্যন্ত।

ঘরে ঢুকেই সে বলে উঠেছিল—বাঃ।

একটু অন্যমনস্কভাবে বিনো সেন জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন। মুখ ফিরিয়ে তাকে দেখে স্মিত হেসে বলেছিলেন—নীরা! এস-এস। কিন্তু বাঃ কি বল তো?

—শালের ফুল।

—তা হ'লে এ তুমি গ্রহণ কর।

—না-না-না। ভাল লাগলেই তা নিতে হবে বা পেতে হবে বুঝি?

—অন্তত দিতে তো হবেই। এটা চিরাচরিত রীতি। নাও তুমি। আমি খুশি হব।

—বেশ। সব আমি নেব না, তিনটে চারটে শিষ নেব।

—তিনটে নয়, চারটে। তিনে নাকি শত্রু হয়।

একটু থেমে আবার বলেছিলেন—আমি বলি আরও কয়েকটা নাও। কারণ তোমার যা রাশিকৃত চুল—কালবৈশাখীর পুঞ্জিত কালো মেঘের মত, তাতে চারটে শালমঞ্জরী ঠিক বিজুরী চমক সৃষ্টি করতে পারবে না। বল তো আমি শিল্পী, কালো মেঘে বিদ্যুত রেখার মত সাজিয়ে পরিয়ে দিতে পারি।

নীরা সপ্রতিভ চিরকাল কিন্তু প্রগলভা কোন দিন নয়। তার

সপ্রতিভতার মধ্যে রূঢ়তা বা কাঠিন্যের অভিযোগই লোকে ক'রে থাকে। কিন্তু নীরা এখানে এসে স্নেহের মধ্যে প্রীতির মধ্যে পাল্টাচ্ছিল। এর মধ্যেই পাল্টেছিল তাই সে একটু প্রগলভা হয়েই বলেছিল— দিন না।

কাদম্বরীর পুণ্ডরীক এবং মহাশ্বেতার মধ্যে পারিজাত-মঞ্জরী আদান প্রদানের ঘটনার কথাটা মনে পড়া সত্ত্বেও সে বলেছিল—দিন না। কিন্তু সে কি তার বিনো সেনকে ভালবাসার পরিচয়? না। না। না। তা হলে সত্য কথাটা শোন। বারেকের জন্য তার মনে এসেছিল—দুরন্ত একটি লজ্জার কম্পন, কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিজেকে শাসন করে বলেছিল—ছি। ওঁর সে কথা মনে হচ্ছে না, তোমার হচ্ছে কেন? ছি! ভালবাসাকে সে লঙ্ঘন করেছিল। সেটা তারই পরিচয়।

বিনো সেনকে শ্রদ্ধা করতো। সংসারে শ্রদ্ধাও ভালবাসা, স্নেহও ভালবাসা—প্রেমও ভালবাসা। শেষেরটা সর্বগ্রাসী। কায়মনবাক্য সব দিয়ে একেবারে নিজেকে ঢেলে দিয়ে ভালবাসা।

হয় তো তাই সে বেসে বসত। বিনো সেন সুকৌশলে;—আজ বুঝতে পারছে সুন্দর কৌশল জানে বিনো সেন, সে দিন তা ভাবে নি—বুঝতে পারে নি,—ভেবেছিল স্বাভাবিক—সহজ, গুণীর আকর্ষণ, নদীকে সমুদ্রের আকর্ষণের মত স্বাভাবিক। সমুদ্র আদিম কালের প্রবীণতম পুরুষ; আজ দুর্গম মালভূমিতে হ্রদের বাঁধন কেটে যে কিশোরী নদী বের হল—সেও ওই সনাতন পুরুষের দিকেই ছোটে।

কথাটা তাকে বলেছিল—মনে করিয়ে দিয়েছিল অনিমাদি। ওই এক মেয়ে। প্রৌঢ়া মেয়েটা বোধ করি জীবনে ভালবাসা পায় নি অথবা ভালও কাউকে বাসতে পারে নি। তাই দুনিয়াভোর মানুষ আর

মানুষীকে পাশাপাশি বা দূরে থেকে, একটু স্মিতমুখে হাসাহাসি দূরের কথা, প্রসন্নদৃষ্টিতে চাইতে দেখলেই ভাবে এরা দুজন দুজনকে ভালবাসে। মাথায় শালের মঞ্জরী গুঁজে চলে আসবার জন্যে সে উঠেছে, বিনো সেন বলেছিলেন—এক গেলাস জল গড়িয়ে দিয়ে যাও, আর দেখ ওই রঙের বাক্সের নিচে একটা এ্যাসপিরিন আছে দাও।

সে এতক্ষণে লক্ষ্য করেছিল বিনো সেন যেন ক্লান্ত—মাথায় প্রশস্ত টাক, চুল পাশে—তাও বড় নয়, সেগুলি রুক্ষই থাকে—কিন্তু মুখের ও দৃষ্টির ক্লান্তি তার সঙ্গে তার চোখে পড়া উচিত ছিল। হয় তো এতক্ষণ চেষ্টা করে বিনো-দা হাসি-কথা দিয়ে চেপে রেখেছিলেন; এবার পারছেন না। তবুও তার চোখে পড়া উচিত ছিল। মুহূর্তে শঙ্কিত এবং একটু অনুতপ্ত হয়েই প্রশ্ন করেছিল—কেন? এ্যাসপিরিন খাবেন, মাথা ধরেছে?

—হ্যাঁ অনেকদিন পরে অনুভব করছি—মাথা আমারও আছে; কারণ মাথা ধরেছে। একটু জ্বর হয়েছে বোধ হয়।

—জ্বর হয়েছে? কেন?

—এই দেখ। এ প্রশ্নের উত্তর ডাক্তারও সহজে দিতে পারবেন না। ক্লিনিকাল রিপোর্ট ভিন্ন এর উত্তর সম্ভবপর নয়। দাও, এ্যাসপিরিন দাও।

এ্যাসপিরিন দিয়েই সে চলে আসে নি। মাথার শিয়রে পাখা নিয়ে বসে বলেছিল—আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন আমি বাতাস করি।

ছলনাময় বিনো সেন।

বিনো সেন কুণ্ঠিতভাবে বলেছিলেন—কিন্তু ওটা যে আমার নিয়মের বাইরে কল্যাণী নীরা। সেবা নিতে যে আমার নিষেধ আছে।

গুরুর নিষেধ। যখন অক্ষম অজ্ঞান হব—তখন করো। এখন দুঃখকে আস্বাদন করতে দাও।

নীরা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ে নয়—শ্রদ্ধায়। এ কি মানুষ! প্রতিবাদ করতে সাহস করে নি। কিন্তু দুঃখে হোক—শ্রদ্ধার সুখে হোক চোখে জল গড়িয়ে এসেছিল। রোধ করতে পারে নি। পাখাখানা হাতে নিয়েছিল—সেখানা রেখে চলেই আসছিল। বিনো সেন ডেকেছিলেন—নীরা।

নীরা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারে নি জল এইবার ঝরবে। বিনো সেন বলেছিলেন—দুঃখ পেলে।

নীরা কথায় উত্তর দেয় নি; তার চোখের জল উপচে পড়ে বলেছিল—তার প্রমাণ আমি।

—না। দুঃখ পেয়ো না। লক্ষ্মী! যাও।

চলে এসেছিল সে।

ওই ফেরার পথেই কিছুটা এসে দেখা হয়েছিল অনিমাদির সঙ্গে। অনিমাদি তার মাথায় শালের ফুল দেখে বলেছিল—এই মরেছে। হ্যাঁ লা সাঁওতালনী—কোন সাঁওতাল মাথায় তোর শালের ফুল গুঁজে দিলে লা? এ্যাঁ? এখনও বনের মাথায় তাকিয়ে শালের ফুল চোখে পড়ল না, আর তোর মাথায় কি করে এল লা?

নীরা রাগ করে নি। কারণ অনিমাদির ওই আদিরস-ঘেঁষা রসিকতা তার সহ্য হয়ে গিয়েছিল তাঁর প্রকৃতির মিষ্টতার জন্যে। একটু ম্লান হেসে বলেছিল—বিনো-দা'কে কে দিয়ে গেছে, উনি দিলেন।

গালে হাত দিয়ে অনিমাদি ভঙ্গি করে বলেছিল—তাহলে মরলি শেষ পর্যন্ত?

এবার তার কপাল কুঁচকে উঠেছিল—বলেছিল—মানে ?

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিলেন অনিমাদি—মানে আবার কি ? মরলি মানে মরলি।

—না। ওসব বল না। কেন মিছিমিছি ভালকে মন্দ বলে মুখ খারাপ কর বলতো ? এমন একজন লোক—তার সম্বন্ধে বলতে নেই ওভাবে।

—এমন লোকই হোন আর তেমন লোকই হোন—বলি পুরুষ তো !

—কি হল তাতে ? পুরুষ হলেই মেয়েকে ভালবাসবে—বাসতে হবে—তার মানেটা কি ?

—মরণ ! তবে আর সে পুরুষ কেন ? ওটা যে বিধান। তা তার কথা না হয় নাই বললাম। সে নয় তোকে ভালবাসে নি। কিন্তু তুই ? আমি তো তোর মরণের কথাই বলেছি।

এবার নীরা বলেছিল—তোমার মরণ। তুমি ওই ছাড়া আর কিছু দেখতে পাও না।

—বটে ? আমি ওই দেখি ? ভুল করে ?

—নয় তো কি ?

—নয় তো কি ? ভাল—তোর চোখের পাতাগুলো তো প্রজাপতির শুঁড়ের মত লম্বা, তাতে জল কেন লেগে লা ? চুলে ফুল পরে কেঁদে ফেলেছিস কেন ?

এতেও রাগ করে নি নীরা। ম্লান হেসে বলেছিল—তুমি জান ওঁর জ্বর হয়েছে ?

—জ্বর হয়েছে ? বিনো-দার ?

—হ্যাঁ। মাথা ধরেছে খুব। এ্যাসপিরিন খেলেন। শুয়ে আছেন।

মুহূর্তে পাল্টে গিয়েছিল অনিমাদি। চিন্তিত মুখে শঙ্কিত কণ্ঠে বলেছিল—ওঁর তো অসুখ হয় না। আমি তো কখনও দেখি নি।

সে কথার জবাব নীরা কেমন ক'রে দেবে,—উত্তরে সে তার শোনা—অসুস্থ বিনো সেনের—সেই বিচিত্র কথা ক'টি বলেছিল;—আমি বললাম, অনিমাদি—আপনি এ্যাসপিরিন খেলেন এখন একটু চোখ বুজুন—আমি হাওয়া করি, ঘুম আসুক। তা বললেন—সেবা নিতে যে আমার নিষেধ আছে নীরা। গুরুর নিষেধ। যখন অক্ষম অজ্ঞান হব তখন করো; এখন দুঃখকে আস্বাদন করতে দাও। সামলাতে পারলাম না অনিমাদি, চোখে জল এসে গেল।

এরপর আর কথা বলেন নি অনিমাদি। চলে গিয়েছিলেন বিনো সেনের ঘরের দিকে। নীরা একটু হেসেছিল। মনে মনে বলেছিল—আমার কথা বাদ দাও অনিমাদি। তবে তুমি, বয়স থাকলে, বিনো সেনের প্রেমে উন্মাদিনী হতে।

কথাটা আবার উঠেছিল বিকেলের দিকে। অনিমাদিই তুলেছিলেন। বলেছিলেন, গুরুর কথা-টথা মিথ্যে নীরা।

—মানে? অর্থাৎ কথাটা ঠিক ধরতে পারে নি নীরা।

—বিনো-দা'র। অনিমাদি বলেছিল—তোকে ওবেলা বলেছিলেন না? সেবা নিতে গুরুর বারণ আছে!

—হ্যাঁ।

—মিথ্যে কথা। সব ওই প্রতিমার জন্যে।

—প্রতিমার জন্যে?

—হ্যাঁ। জানিস, আজ তখন গিয়ে দেখলাম ঘুমুচ্ছেন—ফিরে

এসেছিলাম। তিনটের সময় উঠে একবার গিয়েছিলাম—যাই একবার দেখে আসি, হয় তো এখন উঠেছেন বিনো-দা। আর এই পাথুরে দেশের বোশেখী তাত—নিশ্চয় ঘুমিয়ে নেই। বারান্দার কাছে গিয়েই শুনি—প্রতিমা বলছে—আমার সেবা নিতে হবে বলেই তুমি দোহাই দিচ্ছ। আমাদের বরিশালের বাড়িতে তুমি সেবা নাও নি? বিয়ের পর কলকাতায় যখন এসেছিলে জেল থেকে, তখন সেবা নাও নি? গুরু—? কে তোমার গুরু? আমি তোমার কাছে এত অস্পৃশ্য? কই অন্য কাউকে—। বিনো-দা বললেন—না প্রতিমা বিশ্বাস করো। সংসারে কারুর সেবাই আমি নেব না। জ্ঞান থাকতে না। গুরুর বারণ? প্রতিমা বলে মিথ্যে কথা। কবে তুমি দীক্ষা নিলে? কে তোমার গুরু? বিনো-দা বললেন—সবার গুরু বাইরে থাকেন না প্রতিমা, গুরুর বাস অন্তরে। প্রতিমা হন হন ক'রে বেরিয়ে চলে গেল। আমি তো লজ্জায় মরি—ভয়েও মরি। হয় তো চেঁচামেচি করবে, হিস্টিরিয়া হবে, এই মোটা দেহ নিয়ে মধুমালতী লতাটার আড়ালে দাঁড়ালাম। প্রতিমা তখন সেই বলে না—বাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিনী—সেই মত একেবারে ফোঁপাতে ফোঁপাতে চলে গেল। এত মোটা আমি, আমাকেও দেখতে পেলে না।

নীরা চুপ করে শুনে গিয়েছিল। কথা বলে নি। মনে মনে হিসেব ক'রে বুঝতে চেষ্টা করেছিল।

—মরণ! বলে কথা শেষ করেছিল অনিমাদি। মরণ অবশ্যই প্রতিমার—সে কথা বুঝতে নীরার বাকী থাকে নি।

অনিমাদি আবার বলেছিল—প্রতিমা ভেতরে ভেতরে বোধ হয় পুড়ে যাচ্ছে। দেখেছিস কেমন শুকিয়ে রোগা হয়ে যাচ্ছে!

হঠাৎ আশ্রমের সাতটার ঘণ্টায় সচকিত হয়ে উঠেছিল নীরা। পড়তে যেতে হবে তাকে হরিচরণবাবুর কাছে। তার বি-এ পরীক্ষার আর খুব দেরী নেই।

সেদিন হরিচরণবাবুই তাকে বলেছিলেন—তোমার কথা আজ বিনো জিজ্ঞাসা করছিল। অসুখ হয়েছে খবর পেলাম, গিয়েছিলাম দেখতে। তোমার প্রিপারেশনের কথা জিজ্ঞাসা করলে। আমি বললাম—এদিকগুলো ঠিক আছে। ভালভাবে পাশ করবে। তবে বাংলাটা কেমন হয়েছে বলতে পারব না। সেবার আমার এক ব্রিলিয়াণ্ট ছাত্র সব বিষয়ে খুব ভাল মার্ক পেলে কিন্তু বাংলায় একেবারে ফেল করে বসল। প্রথমটা ছেলেবেলায় পড়ত দার্জিলিংয়ে, বাপ-মা থাকত দিল্লিতে। সে এক দুঃখের কথা। রামায়ণ মহাভারত কিছুই পড়ে নি। কোশ্চেন ছিল পরশুরামকে নিয়ে। তা লিখে এসেছিল "পরশুরাম রামচন্দ্রের বড় ভাই—তাঁহাদের মাতা কুন্তীর কুমারী অবস্থায় পরশুরামের জন্ম—তাই তাহাকে পথে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরশুরাম বড় হইয়া খুব বীর হন এবং মাকে কাটিয়া ফেলেন ; তখন রাম তাহাকে গদাব আঘাতে কোমর ভাঙিয়া দিয়া মারিয়া ফেলেন।"

এরপর হেসে বৃদ্ধ বলেছিলেন- -তুমি যখন বাংলা নিয়ে এস না ?—তখন আমিও বিব্রত হই মা। আমরাও বাংলা ভাল শিখি নি। বঙ্কিম পর্যন্ত মোটামুটি বুঝি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এমন কাব্য রচনা করেছেন—যা বিশেষ চর্চা ভিন্ন বুঝতে পারি নে। তুমি বাংলা ভালই জান। একালের মেয়ে। তবু সাবধান হওয়া ভাল। বিনো আমাকে বললে—তা হলে ওকে বলবেন—আমার কাছে দরকারমত আসতে। ওর ভাল হোক—তারপর তুমি দেখিয়ে টেকিয়ে নিয়ো।

নীরা প্রশ্ন করেছিল—উনি এবেলা আছেন কেমন?

—আছে ভালই। তবে জ্বরটা বেড়েছে একটু।

—কে রইল কাছে রাত্রে?

—কে থাকবে? ও তো অদ্ভুত। সেবা নেবে না। তবে থাকবেন কেউ। বোধ হয় রমেশবাবু থাকবেন। রমেশবাবু সেকেণ্ডারি সেকশনের একজন শিক্ষক।

আসবার পথে একবার দাঁড়িয়েছিল নীরা। কিন্তু কারুর কোন সাড়া পায় নি। বোধ হয় ঘুমিয়েছিলেন।

পরের দিন সকালে নিজেই গিয়েছিল নীরা—বিনো সেনকে দেখতে। জ্বর তখন ছেড়েছে। বিনো সেন স্নানের আয়োজন করছেন। নীরা বলেছিল—সে কি? স্নান করবেন কি?

হেসে বিনো সেন বলেছিল—ও আমার অভ্যাস।

—অভ্যাস? অন্যায় বা খারাপ অভ্যাস।

—এই দেখ! মাস্টারণী কি না। ঠিক শাসন শুরু করেছে। কিন্তু হরিচরণবাবু কাল রাত্রে আমাকে তোমার মাস্টার নিযুক্ত করে গেছেন। বলেছেন বাংলা পড়াতে। সুতরাং আমাকে আদেশ করা তোমার চলবে না নীরা দেবী।

বলেই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

বিনো সেন বিচিত্রই বটে। স্নান করেও আর জ্বর আসে নি। সন্ধ্যাবেলা সে যখন বই নিয়ে তাঁর কাছে গিয়েছিল—তখন সেই গানটিই গাইছেন—

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি?
হায় তুমি তার খবর পেলে না।

চৌদ্দ

তৃতীয় অঙ্কের এই দৃশ্যটা ওইখানেই শেষ ক'রো। নাটকীয়তার যদি অভাব ঘটে তবে একবারে শেষে জুড়ে দিয়ো—ছোট্ট একটি ঘটনা।

বিনো সেনের কাছে নীরার বাংলা পড়ার প্রথম দিন।

পড়ার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল বেলা এগারটায়। ঠিক হয়েছিল—পরীক্ষা পর্যন্ত নীরাকে তার নির্ধারিত কাজ থেকে আংশিকভাবে ছুটি দেওয়া হবে। বেলা এগারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ক্লাসে ছেলে পড়ানোর কাজ কমিয়ে দিয়ে বিনো সেন বলেছিলেন—সকালবেলা ডাকাতগুলোকে মুখ ধোওয়ানো—খাওয়ানো—আর বিকেলবেলা ওদের খেলাধুলো—রাত্রে খাওয়ানো শোয়ানো—এ কাজ তুমি ভিন্ন হবে না। পড়ানোর কাজ চালিয়ে নেওয়া যাবে। দশটায় ইস্কুল বসিয়ে একঘণ্টা দেখে শুনে চালু করে দিয়ে—এগারটা থেকে চারটে পর্যন্ত তোমার ছুটি।

তারই মধ্যে এগারটা থেকে একটা বিনো সেনের কাছে বাংলা পড়ার সময় নির্দিষ্ট হয়েছিল। সে দিন অর্থাৎ ওই জ্বর ছাড়া মাত্র স্নান করার দিনের দু দিন পর নীরা সেই প্রথম পড়তে গিয়েছিল বিনো সেনের কাছে। সবে পড়া শুরু করেছে এমন সময়—ডাক পিওন এসে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল—একটা রেজেস্ট্রী আছে।

মস্ত একটা লম্বা চওড়া খাম, মোটা শক্ত কাগজের খাম। রসিদ সই ক'রে সেটা খুলে বিনো সেন বের করেছিলেন কয়েকখানা এক্স-রে

ফটো প্লেট। তার সঙ্গে মস্ত ডাক্তারী রিপোর্ট। বলেছিলেন—একটু অপেক্ষা কর, এটা দেখে নি।

দেখে—তিনি ডেকেছিলেন চাকরকে—সমস্তটা হাতে দিয়ে বলেছিলেন প্রতিমাকে দিয়ে এস।

তারপর নীরাকে বলেছিলেন—পড়।

মনে প্রশ্ন নিয়েই পড়তে শুরু করেছিল নীরা।—প্রতিমার এক্স-রে প্লেট? মাস খানেক আগে কয়েকদিনের জন্য প্রতিমাকে নিয়ে বিনো সেন কলকাতায় গিয়েছিলেন। সে কি এইজন্যে? কি হয়েছে প্রতিমার? দিন দিন রোগাও হচ্ছে সে!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রতিমা এসে দাঁড়িয়েছিল প্রসন্ন সহাস্য-মুখে। এবং বলেছিল—আমি বলছি—আমি ভাল আছি। আমার কিছু হয় নি—। তবু জোর ক'রে তোমরা সকলে বলবে—ডাক্তার দেখাও, ডাক্তার দেখাও! দেখলে তো!

হেসে বিনো সেন বলেছিলেন—যাকে স্নেহ করে মানুষ, তার জন্যেই অযথা আশঙ্কা হয় প্রতিমা! আশঙ্কা কেটে গেল। এটা ভাল হল না?

মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল প্রতিমার। উত্তর দিতে পারে নি সে। উত্তর হয় তো খুঁজে পায় নি; কণ্ঠস্বর হয়তো আবেগে রুদ্ধ হয়েছিল।

বিনো সেন আবার বলেছিলেন—তা হ'লে এই গরমের মাসটা ডাক্তারের কথা মত তুমি শিলংয়ে থেকে এস। তিনি বিশ্রাম এবং চেঞ্জের কথা বলেছেন।

প্রতিমা বলেছেন—না।

—না কেন? ডাক্তার সেটা বিশেষ করে বলেছেন।

—বলুন। ওঁরা বলেন। আমি যাব না। আমি পরীক্ষা দেব,

—পরীক্ষা দেবে? কি ক'রে দেবে? আর পনের দিন পর ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু। ফিজ দাখিল কর নি—পরীক্ষা দেবে? পরীক্ষা দেব বললেই তো দেওয়া হয় না প্রতিমা। এর আগে তুমি দুবার পরীক্ষা দিয়েছ—না-জানা নও। হঠাৎ আজ এসে বলছ পরীক্ষা দেব? যাও। শিলং যাবে—তার ব্যবস্থা কর।

—না।

প্রতিমা 'না' বলেই ফিরল।

বিনো সেন ডাকলেন—শোন—! বিনো সেনের কণ্ঠস্বরে যেন একটা ধনুকের টানের মত টান ছিল। কিন্তু প্রতিমা তাতে বিচলিত হয় নি।

না। আমি শিলং যাব না।

বলেই সে বেরিয়ে গেল। বিনো সেন নীরাকে বললেন—পড়। শেষ কর এইখানে দৃশ্যটা।

* * *

আরম্ভ কর তৃতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্য। যা আজ এই ঘণ্টা কয়েক পূর্বে শেষ হয়েছে।

অন্ধকার রাত্রে শামপানি গাড়িটার মধ্যে ঘড়ি দেখে ঠিক বুঝা যাচ্ছে না ক'টা বাজছে। দুপাশে বন শেষ হয়ে এসেছে। পথে যে ভালুকটা বা ভালুক কয়টা ঘুরে বেড়ায় তারা যেন পথে এসে দাঁড়ায় নি। নিশ্চিন্তভাবেই তার মনশ্চক্ষের সামনে জীবন নাটকের অভিনয় হয়ে চলেছে। আরম্ভ হচ্ছে এই শেষ দৃশ্য।

না। দাঁড়াও। নীরা ভাবছে—স্মরণ করতে চেষ্টা করছে সে

দিন ওই প্রতিমা যখন চলে যায় এবং বিনো সেন যখন নির্বিকারভাবে নীরাকে 'পড়'—বলেন তখনকার মুখভাবটা স্মরণ করতে। একটি বা দুটি কোথাও বা দৃষ্টির চকিত আভাসেও কি বিনো সেনের প্রতিমার প্রতি তিক্ততা এবং নীরার প্রতি আসক্তি ফুটে উঠে নি ?

না; মনে পড়ছে না। বিনো সেন নিপুণ অভিনেতা। বরং নীরা মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর সংযম এবং কর্তব্যপরায়ণতা ও নিরাসক্তি দেখে।

অনবুঝ প্রতিমার উপর বিরূপ হয়েছিল সে। নীরা বুঝতে পারে নি যে, প্রতিমা বিনো সেনের নীরার প্রতি দৃষ্টিপাত লক্ষ্য করেছিল; শঙ্কিত হয়েছিল।

ডি-এল রায়ের সাজাহান নাটকের ঔরংজেবের চরিত্র মনে পড়ছে। ঔরংজেব সাধুতার মুখোস প'রে—ফকীরের জপমালা হাতে নিয়ে—সৈন্যবাহিনী নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে দিল্লির পথে। ওদিক থেকে আসছে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা মোরাদ। সে নিজের জন্য সিংহাসন দখল করতে চায়। ঔরংজেব বললে—সে মক্কার দিকে পা বাড়িয়ে আছে। ফকীরিই তার জীবনের কাম্য। শুধু কাফের দারার হাত থেকে পবিত্র ইসলাম-সেবক মুঘল সিংহাসন উদ্ধারের জন্যই বাধ্য হয়ে ব্যথিত চিত্তে অগ্রসর হচ্ছে সৈন্য নিয়ে। তার কটিবন্ধের তরবারি খুলে সম্রাট মোরাদকে উপঢৌকন দেবে আর বাঁধবে না। বিনো সেন তাই। সে দিন নীরাকে সে ওই ঔরংজেবের মোরাদকে ভোলানোর মতই ভুলিয়েছিল।

আশ্চর্য—'সাজাহান' নাটক তাদের পাঠ্য ছিল। বিনো সেন চরিত্রটি চমৎকারভাবে বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন—Truth is

stranger than fiction—নীরা। দেখ এ চরিত্রটি কাল্পনিক হলে যে কেউ বলত নাট্যকার অতিরঞ্জন করেছেন। হয় তো বা বলত—চরিত্র অবাস্তব। কিন্তু এ চরিত্র ঐতিহাসিক। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর নজীর আছে। হয় তো নাটকের চরিত্রের চেয়েও বাস্তব ঔরংজেব—আরও জটীল আরও কুটীল ছিলেন। stage-অভিনয়ে একজন অভিনেতা ঔরংজেব—একজন অভিনেতা মোরাদকে ভুলিয়ে থাকে। কিন্তু বাস্তবে—বাস্তব ঔরংজেব—বাস্তব মোরাদকে ভুলিয়েছিলেন। মোরাদও রাজপুত্র—ডিপ্লোমেসি তার মধ্যেও ছিল। তারও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল। কিন্তু কেউ ধরতে পারে নি।

দিনের পর দিন মুগ্ধ হয়ে শুনেছে বিনো সেনের সাহিত্য ব্যাখ্যা। নিজের অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে তার নিকট থেকে নিকটতর হয়েছে।

অজগর হরিণকে টানে। তার নিশ্বাসে হরিণের চেতনা অসাড় হয়ে আসে। এগিয়ে যায় মুখের কাছে। পরীক্ষা দিতে যাবার দিন মাথায় হাত দিয়ে সে কি গাঢ়স্বরে আশীর্বাদ !

—আমার মুখ রাখতে হবে। ভালভাবে পাশ করা চাই। আমার হাতের 'তৈরী তুমি'। হ্যাঁ !

পরীক্ষাতে প্রশ্নও এসেছিল সাজাহান নাটক নিয়ে। সর্বাপেক্ষা বিচিত্র চরিত্র কি ? অধিকাংশই লিখেছিল—দিলদার। সে লিখেছিল—"দিলদার চরিত্র কল্পনার বৈচিত্রে সমৃদ্ধ হলেও বাস্তবতার মূল্য বিচারে অনুত্তীর্ণ। অর্থাৎ কল্পনা ঠিক বাস্তব হইয়া উঠে নাই। এ দিক দিয়া—ঔরংজীব চরিত্র বাস্তব পটভূমিতে কল্পনার চাতুর্যে একটি ক্রিয়াশীল গতিশীল কেন্দ্রীয় চরিত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। নাটকের প্রত্যেকটি নরনারী ঔরংজীবের আঘাতে চলিয়াছে, রূপ পরিবর্তন করিতেছে।

তাহাকে বুঝিয়াও ধরিতে পারিতেছে না। এবং শেষ দিকে মানব চরিত্রের অবিনাশী সত্বা যখন অসহ্য অনুতাপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে এবং কখনও যখন তাহার প্রতারক-সত্বা প্রাণপণে নিজেকে রক্ষা করিতে চাহিতেছে তখনই চরিত্রটি পূর্ণভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।”

বিনো সেনও তাই। কেউ বুঝতে পারে নি কেউ ধরতে পারে নি। এমন কি শিবনাথ দাহু পর্যন্ত না। তিনি মধ্যে মধ্যে চিঠি লিখেছেন—তার মধ্যেও তিনি বিনো-দার কথাই পঞ্চমুখে গান করেছেন।

নীরা একবার লিখেও ছিল। আপনি যদি সত্য শিব হতেন অর্থাৎ কাঁধের উপর পাঁচটা মুখ থাকত তা হলে বিনো-দার কথা বোধ হয় বলে শেষ করতে পারতেন।

দাহু লিখেছিলেন—দিদি যা লিখেছ তার উত্তরে বলি—“শিব নামের জন্যে পাঁচটা মুখ যদি পাওয়া যায় তা'লে শিবের বদলে রাবণ নাম নিতে চাই। দশটা মুখ পাওয়া যাবে। তোমাদের সুবিধে দিদি, মুখের দরকার হয় না, দুখানি হাতে একগাছি মালাতেই তোমরা বিধাতার ঋণ শোধ করতে পার। দুঃখের কথা কি জান? বিনো সেন ওইখানে দেবতাদের চেয়েও চতুর। লোকটার ওইখানেই নিন্দে। লোকটার ফুলের মালায় লোভ নেই। বিনো-দা'র চিঠি পেয়েছি। লোকটা একমুখেই তোমার শতনাম করছে গো। চিঠিখানা দেখলে তুমি লজ্জা পাবে। লেখক ভাগ্যে বিনো-দা; নইলে ভাবতাম হয়েছে এইবার; নীরাদির ছেঁড়া মালা আবার বিধাতা জোড়া দিয়ে হাতে তুলে দিলে! ভাই, ঠাট্টা করছিনে। বিনো-দা লিখেছে—

দাদু এইবার আশা হয়েছে—আমার শিষ্যার মধ্যে আমি বাঁচব—আমার এই মরুভূমিতে লাগানো বাগানটি বাঁচবে। ভারী ভাল লাগছে দাদু—একটি মেয়েকে অন্তত মনের মত ক'রে গড়ে যেতে পারলাম—অথবা সেই আমার আকাঙ্ক্ষা বুঝে সেই মত বেড়ে এবং গড়ে উঠল। পরীক্ষার জন্যে খুব পড়ছে নীরা। পাশ ভালভাবেই করবে। দেখবেন। দেখো, তার মুখ রেখো। আমার বাড়িতে বসন্ত হ'চ্ছে। কলকাতা জুড়েই। তুমি বর্ধমানে সেণ্টার করো।

* * *

পাশ সে ভালভাবেই করেছিল।

খবর কলকাতা থেকে পাঠিয়েছিলেন দাদু—টেলিগ্রামে। আর তার কাছে সেটা নিয়ে এসেছিল বিনো সেন। নাটক! বিনো সেন আজ বললে—সে নাটক করলে। নাটক করার কৌশল তোমার থেকে কেউ ভাল জানে বিনো সেন?

ওঃ সে কি নাটকীয় আবির্ভাব!

স্কুলের ক্লাসে সে পড়াচ্ছিল। মাথায় একখানা চাদর পাগড়ীর মত বেঁধে ক্লাসের দরজায় দাঁড়িয়ে হেঁকেছিল—টেলিগিরাপ পিওন! নীরা মুখার্জী—টেলিগিরাপ!

গলার স্বরটাকেও চেপে চিনতে দেয় নি। নারারও এক মুহূর্তের জন্য ভুল হয়েছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আপনার বলে কেউ না থাকলেও—একবার বুকটা ধ্বক্ করে উঠেছিল। বলেও উঠেছিল—আমার? টেলিগ্রাম? পরমুহূর্তে বিনো সেন ঘরে ঢুকে হেঁট হয়ে একটা সেলাম ক'রে বলেছিল—বকশিশ্ দিদিমণি!

আর বুঝতে দেরী হয় নি। পাশের খবর এবং ভাল পাশের

খবর! এবং বিনো সেনকে বকশিশ দিতেও তার মুহূর্তের জন্যে ভাবতে বা বিব্রত হতে হয় নি। চট করে ঠিক মাথায় এসে গিয়েছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই নতজানু হয়ে টিপ করে একটা প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—মিল গিয়া বকশিশ্! দিজিয়ে টেলিগিরাপ!

বিনো সেন অভিনয়ের ভঙ্গিতেই বলেছিল—বহুৎ খুশ্! বহুৎ খুশ্ হো গয়া। তারপরই টেলিগ্রামখানা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন——নাও। শুধু পাস নয়, উইথ ডিস্টিংশন। আজ আমি ভোজ দেব। স্কুলের ছুটি। ছুটি তোমাদের, সব ছুটি আজ। নীরা দিদিমণি খুব ভাল করে বি-এ পাশ করেছে। রাত্রে আজ লুচি মাংস মিষ্টি।

নীরা পড়েছিল—Thousands blessings. Passed with distinction. Dadu.

তারপর আর সে দাঁড়ায় নি—"মাস্টারমশায়কে প্রণাম করে আসি" বলেই ছুটে গিয়েছিল হরিচরণবাবুর বাড়ির দিকে। হরিচরণবাবু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন। বিশীর্ণ মুখে কৃষ্ণা চতুর্দশীর শেষ রাত্রির আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রলেখার মত শীর্ণ রেখায় একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল। সে বুঝেছিল তাঁর বেদনার অন্তর্নিহিত অর্থটুকু। তিনি মধ্যে মধ্যে বলতেন, এই পৌত্র দুটির বড় ভাই অর্থাৎ বড় পৌত্রের কথা। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলে ছিল। সে থাকলে সেও এবার বি-এ দিত।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়তে চাইছিল, সেটাকে চেপেই সে বেরিয়ে এসেছিল। তারও মনে পড়েছিল মাকে। বেরিয়ে এসে সে ফিরেই যাচ্ছিল ইস্কুলে। ওই ডাকাতদের সঙ্গে খানিকটা হৈ চৈ করতে হবে। ওরা তাকে বড় ভালবাসে। ও সেই একদিনই সেই ছেলে দুটোকে

মেরেছিল। তারপর আর মারেনি। সে তো জানে এই সব আপনজন-হারা ছেলেগুলির জীবনের কি ক্ষোভ কি অবিশ্বাস! মূল আছে তাই ফুল ফোটে। পরগাছা অর্কিডেও ফুল ফোটে, তাতে আর একটি গাছকে জীবনের সকল রস দিতে হয় পরিপুষ্ট করতে; বুকে ক্ষত করে রক্ত দিয়ে লালন করার মত।

তাই সে দিতে চায়। প্রত্যেক ক্ষোভের ক্ষেত্রে নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে, মিলিয়ে দেখে বিচার করে সে। আজ সে তার বাল্যকালের অন্যায়কেও দেখতে পায়। আজ সে ওদের সঙ্গে নাচবে খেলবে গান করবে।

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি ?
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।

ছেলেদের নিয়ে সে গানটা রপ্ত করছে। শোনায় এবং বলে সমাজকে, সংস্কারকে। আজ সে নিজেকে বলবে। সবাইকে বলবে। জীবনে কিছু কিছু সঞ্চিত সুধা-নির্ঝরের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। আপন মনেই সে আবৃত্তি করতে করতে চলেছিল আনন্দচঞ্চল পদক্ষেপে

আমি ঢালিব করুণা ধারা
আমি ভাঙিব পাষাণ কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা
এত কথা আছে, এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে, এত সাধ আছে—
প্রাণ হয়ে আছে ভোর॥

হঠাৎ সব ছন্দ তাল কেটে গিয়েছিল। কাকে যেন স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসছিল। সঙ্গে বিনো-দা। পিছনে স্কুলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল অনিমাদি আর কমলাদি।

কে আবার? বুঝতে বাকী থাকে নি। প্রতিমাদি। নইলে প্রতিমাদি কই? সে যেদিক থেকে যাচ্ছিল—সেইদিকেই আসছে। সেইদিকেই ছিল তাদের সকলের কোয়ার্টার।

পথে দেখাও হয়েছিল। প্রতিমাদিই বটেন। বিনো-দা একটু হেসে বলেছিলেন, প্রতিমা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তুমি যাও—আপিসে। কাগজপত্র দেখে সামলে রাখো। এরপর তো গোটা ইস্কুলের ভার পড়বে তোমার উপর। স্ট্রেচারের মধ্যে প্রতিমাদি প্রায় মরার মত নিথর হয়ে পড়ে ছিলেন।

অনিমাদি কমলাদির সঙ্গে দেখা হতেই তাঁরা বলেছিল, মা। কি কাণ্ড!

—কি হ'ল বল তো?

—কি আবার? ঝগড়া করতে করতে অজ্ঞান হয়ে গেল। তোকে নিয়ে ঝগড়া।

—মানে?

—নেকী তুই।

কমলাদি বলেছিল, আপিসে এস। এখানে—ছেলেদের সামনে নয়।

আপিসে সে সব শুনেছিল। কমলাদি আর অনিমাদি ক্লাসেই ছিলেন, ছুটি পেয়ে ছেলেরা নাচছিল। হঠাৎ চীৎকার শুনে ছুটে অনিমাদি কমলাদি দুজনেই, কিন্তু অফিস-রুমের দরজা বন্ধ ছিল। কথা

তাতে আটকায় নি। তারা সব শুনেছিল স্তব্ধ হয়ে। প্রতিমা প্রায় আর্তনাদ করছিল,—কই আমার জন্যে তো কর নি। আমিও তো পড়তে পারতাম। পাস করতে পারতাম। দুবার ফেল করেছি বলে —তুমি—। বিনো-দা বলছিলেন, তার আগেও তুমি কলকাতায় একবার ম্যাট্রিক দিয়ে ফেল করেছিলে। এখানে দুবার ফেলের পর আমি বুঝেছিলাম, তুমি পড় না। পড়তে চাও না। আমি নিজে তোমাকে পড়িয়েছি। নীরার চেয়ে কম যত্ন নিয়ে পড়াই নি। কিন্তু তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত। তুমি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতিমা—অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তুমি তুমি কখনও আকাশের দিকে তাকাতে পারলে না। তোমার আমার সম্পর্ক—তাও—তুমি—

অনিমাদি বলেছিলেন—এই না ভাই, সে কি চীৎকার। চেঁচিয়ে উঠল—ওই—ওই—নীরা সব বিষিয়ে দিলে—তোমাকে নিশ্বাস দিয়ে টানছে—। বাস, উনি গম্ভীর গলায় বললেন, প্রতিমা। তারপর ধড়াস্। পতন ও মূর্ছা।

গম্ভীর কমলাদিও হেসেছিলেন একটু। সে একটু স্তব্ধ থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, ওর জীবন আমি বিষ দিয়ে বিষিয়ে দিই নি —আমার গায়ে অকারণে বিষ ঢালতে এসে—সেই বিষ ঢাললে নিজের গায়ে। আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়—কেন—উনি—আমাকে এমন করে সব কিছুর মধ্যে টানেন—দায়ী করেন? কেন?

ধ্বনির প্রতিধ্বনির মত সঙ্গে সঙ্গে হাত নেড়ে ভঙ্গি করে অনিমাদি বলে উঠেছিলেন :—

—উনি জানেন যে, বিনো-দা তোমার প্রেমে পড়েছেন!

—অনিমাদি! ধমকে উঠেছিল সে।

অনিমাদি বলেছিলেন,—তোর ধমকে আমি ভয় পাই নে। আমি পুরুষ মানুষ হলে আমিই তোর প্রেমে পড়তাম। তোর পিছু পিছু ঘুরতাম।

—আমি ছেলেবয়সে একজনকে এক চড় মেরেছিলাম।

—সেটা একটা মস্ত হাঁদা। আমি এক গালে চড় খেলে আর একগাল পেতে দিতাম। চড় মার, ঝাঁটা মার—দেহি পদপল্লবমুদারম। হাত জোড় ক'রে দাঁড়িয়েছিল অনিমাদি। সে ভঙ্গি দেখে সে আর না-হেসে পারে নি। হেসে ফেলেছিল।

সামপানির মধ্যে নীরা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। বিনো সেনের দৃষ্টি ও ব্যবহারের মধ্যে আজকের ঘটনার অঙ্কুর কি সেদিন আর সকলেই দেখেছিল, শুধু সেই দেখে নি? কেন দেখে নি? কেন? সেও কি—? না-না। সে কখনও দুর্বলতা অনুভব করেনি, দুর্বল হয় নি, প্রতারিত হয়ে বিনো সেনকে সে শ্রদ্ধা করেছে কিন্তু ভাল সে বাসে নি। নীরার ভালবাসা মরুভূমি বিদীর্ণ করে—উৎস-মুখে জলের ধারার প্রকাশ। সে গোপন থাকত না—চাপা থাকত না। আর নীরা ভালবাসবে এমন পুরুষকে যে পুরুষ মনে মনেও আর একজনকে ভালবেসেছে? প্রতিমাকে বিনো সেন মনে মনেও ভাল বাসেন! ছি! ছি!

থাক। মানসমঞ্চে নাটকের অভিনয়ে সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। প্রস্থানে বিলম্ব হচ্ছে। না। বিলম্ব হয় নি—ব্যাঘাত ঘটে নি। সেদিন অনিমাদির ওই কথায় হেসে ফেলে পরমুহূর্তেই বিষণ্ণ এবং

অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। ওই প্রতিমার কথা মনে করেই বিষণ্ণ এবং অন্যমনস্ক হয়েছিল। রাত্রে খাওয়া দাওয়া হবে—ছেলেরা উৎসব করবে হুল্লোড় করবে। সেও নিশ্চয় অনিমাদি-কমলাদির সঙ্গে হাস্য পরিহাসে মাতবে, বিনো সেনও মাতবেন, আর প্রতিমা?—ওই ভেবেই সে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ চলে গিয়েছিল। গিয়েছিল বিনো-দার কাছে।—বন্ধ করুন খাওয়া দাওয়া!

প্রতিমাদির অসুখ। বিনো-দা বলেছিলেন, না। সেরে যাবে অসুখ সন্ধ্যের মধ্যে। তাঁর সে মুখ দেখে প্রতিবাদের সাহস হয় নি। সে মুখে একটা কাঠিন্য ছিল। দৃঢ়তা ছিল। সংকল্প ছিল। বাড়ি ফিরে এসে সে বসে ভেবেছিল, ঠিক আজকের মতই ভেবেছিল—কিছু কি সত্যই করেছে সে আপন অজ্ঞাতসারে? না। দিনের পর দিন, সেই একই ধারায় কাজগুলি করে গিয়েছে—যন্ত্রের মতন; সেই—সকালে উঠে ছেলেদের খবর নেওয়া কে কেমন আছে। তারপর ইস্কুল। বিকেলে খেলা দেখা। সন্ধ্যায় একবার ক'রে বিনো-দা সবার কাছে আসেন, তার কাছেও এসেছেন। খবর নিয়ে গেছেন। তারপর সে গিয়েছে হরিচরণবাবুর কাছে পড়তে। কোন কোন দিন অবশ্য বিনো-দা সঙ্গে গিয়েছেন। রাত্রে ফেরার সময় তিনি বারান্দায় কোনদিন গান করেন, কোনদিন ছবি আঁকেন হেজাক বাতি জ্বেলে—ইলেকট্রিক আলোতে তাঁর কুলোয় না, বেশী পাওয়ারের বাল্ব ব্যবহার করলে ফিউজ হয়ে যায়। তাকে দেখলেই নেমে সঙ্গে তার বাড়ির দোর অবধি আসেন, এই পর্যন্ত। কই কখনও তো এমন কথা বলেন নি যার মধ্যে এতটুকু অনুরাগের চিহ্ন আছে। শুধু একটা কথা, তুমি ওয়াণ্ডারফুল। আশ্চর্য মেয়ে! মধ্যে মধ্যে ছেলেদের নিয়ে পিকনিক

হয়েছে, তাতে হৈচৈ হয়েছে, হুল্লোড় সবাই করেছে, বিনো-দা সব থেকে বেশী। একদিন ছেলেদের সঙ্গে রেস দিয়েছিলেন, তাতে তিনি তাকেও টেনেছিলেন। হ্যাঁ, সে যোগ দিয়েছিল। অনিমাদি মোটা, কমলাদি রোগা, প্রতিমাদি মাটির পুতুল। তার শক্তি আছে উৎসাহ আছে—সে রেস দিয়েছিল। বিনো-দা জিতেছিলেন, সে সেকেণ্ড হয়েছিল, ছেলেরা দম রাখতে পারে নি। তার মধ্যে প্রেম কোথায়? মধ্যে বিনো-দা মিটিং করেছেন সমাজ-সংস্কার নিয়ে, মুগ্ধ হয়ে সে শুনেছে। নিশ্চয় চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সে মুগ্ধতার ছায়া। তাই বা প্রেম হবে কেন?

ভাবতে ভাবতে সে এমনই ক্ষুব্ধ হয়েছিল—যে সে হঠাৎ উঠে কোন বিবেচনা না-করেই গিয়েছিল প্রতিমার কোয়ার্টারে। কেন—কেন তিনি এমন সন্দেহ করবেন?

প্রতিমা বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। দেখে তার আবার ক্ষোভ চলে গিয়ে মায়া হয়েছিল। কি বলবে ভেবে পায় নি, চুপ করে দাঁড়িয়েই ছিল, ভাবছিল; হঠাৎ চোখে পড়েছিল—টেবিলের উপর পড়ে-থাকা বিনো-দার একখানা ছোট চিঠি।

সে নিজেকে সম্বরণ করতে পারে নি। চিঠিখানা নিয়ে পড়েছিল। ঠিক সেই মুহূর্তেই মুখ তুলেছিল প্রতিমা। এবং সঙ্গে সঙ্গেই মুখ গুঁজে পড়ে বলেছিল, তুমি যাও। তুমি যাও। আমাকে কি মরতেও দেবে না শান্তিতে? কাঁদতেও দেবে না?

সে বলেছিল, আমি আসতাম না প্রতিমাদি। কিন্তু আপনি যে আমাকে বিশ্রীভাবে জড়িয়ে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন। কেন আপনি এ রকম ভাবেন?

—ও তোমাকে ভালবাসে না ?

—না। আমি অন্তত মনে করি না। স্নেহ করেন। আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি। তার মধ্যে আপনি যা ভাবেন তার লেশমাত্র নেই।

—লেশমাত্র নেই ! ব্যঙ্গ ভরে সে বলেছিল। চোখ বুজে ভেবে দেখো !

তারপরই প্রতিমা কেঁদে উঠেছিল হু হু করে। নীরার আর সহ্য হয় নি—সেও চলে এসেছিল বিরক্ত এবং নিরুপায় হয়ে। একে সে কি বলবে ? ঘৃণা হয়েছিল, করুণাও হয়েছিল। বাসায় এসে খেয়াল হয়েছিল চিঠিখানা তার মুঠোর মধ্যেই রয়ে গেছে। ভ্রূকুঞ্চিত করে সে ভাবতে বসেছিল, বিনো-দার প্রতি তার কি—? বিনো-দার কথা বিনো-দা জানেন। না, সেও জানে, ও মানুষ ভাল কাউকে বাসে না ! জগৎ ওদের কাছে তুচ্ছ, ক্ষুদ্র। হায় প্রতিমাদি, তুমি যদি জানতে যে এ মানুষের কাছে নীরারও দাম নেই। অন্তত সেদিন তাই মনে হয়েছিল। সেদিন বিনো সেনকে সে বুঝতে পারে নি। সে স্বীকার করছে। বিনো সেনের প্রতারকের ভূমিকা নিখুঁত। আর নিজে সে ? না। সে কোনদিন মনে ঠাঁই দেয় নি। কোনদিন না। মনে মনেই প্রতিমাকে উদ্দেশ করে বলেছিল—প্রতিমাদি—এই মুহূর্তে চোখ বুজলে হয় তো তোমার কথার সূত্র ধরে নীরার মনে বিনো সেনের মুখ ভেসে উঠবে, কিন্তু তা বলে তাই সত্য নয়। সে মনে করে দেখেছে। ভাল করে খতিয়ে দেখেছে। হিসেব সে তোমাকে দিতে পারে।

হ্যাঁ। সে স্বীকার করবে যে সেদিন নিজের ঘরে সেই সময়টুকুর মধ্যে বারবার—বারবার বিনো সেনের মুখ তার চোখের সামনে ভেসে

উঠেছিল। তার কারণও সে জানে তার কারণ প্রতিমাদির ওই কথাক'টি। মনের একটা বিচিত্র অবাধ্য গতি আছে; যে মুহূর্তে একটা অন্যায় অপরাধের অপবাদ মানুষের ঘাড়ে কেউ চাপিয়ে দেয়—সেই মুহূর্ত থেকেই মনের মন্দ সেই অপবাদকেই সত্য ক'রে তুলতে চায় মিথ্যে কল্পনার মধ্যে।

বিনো সেন, বিনো সেন, বিনো সেন। ঘুরে ফিরে বিনো সেনই তার মনের মধ্যে চারিদিকে দাঁড়িয়ে হেসেছিল।

সে দিন সে মাঝে মাঝে বিব্রত বোধও করেছিল। তা করেছিল। মাথাটা পর্যন্ত ধরে উঠেছিল।

ঠিক এই সময়েই ঢং-ঢনন-শব্দে পড়েছিল—কিচেন ঘণ্টা।

মিনিট দুয়েক পরেই অনিমাদি এসেছিলেন দূর থেকে হাঁকতে হাঁকতে—নীরি। নীরি। আঃ, যার বিয়ে তার মনে নেই পাড়াপড়শীর ঘুম নেই। তোর পাসের ভোজ, তুই কি করছিস? ঘরে ঢুকেছিল অনিমাদি—বলি ধ্যান করছিস কার?

—কারও নয়, চল। জীবনটা খতাচ্ছিলাম। মাথা ধরে গেছে।

খাবার আগে একটি ছোট আসর হয়েছিল। ডাইনিং হলে ছেলেরা অনিমাদি কমলাদি হরিচরণবাবু এবং অন্য মাস্টারেরা এসে বসেছিলেন। তার আগেই তাঁরা এসে তারই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। সে এসে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এসব আবার কি?

হরিচরণবাবু বলেছিলেন—আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করব মা। ছোটরা তোমাকে প্রণাম করবে।

সে তাঁরই পাশে বসে বলেছিল—না—না। সে আমার ভারী

লজ্জা করবে। না। তা ছাড়া শরীরটা আমার আজ যেন ভাল নেই। মাথা ধরেছে।

হরিচরণবাবু তার আপত্তির কথাটা গ্রাহ্যই করেন নি; বলেছিলেন —এই তো অল্পক্ষণের মধ্যেই হয়ে যাবে। এই—কেউ যাও, বিনোকে ডাক—। বল আমরা বসে আছি।

অনিমাদি বলেছিল, একেবারে নিরীহের মত বলেছিল—বোধহয় প্রতিমাদির আবার অসুখটা বেড়েছে।

নীরার অসুস্থ দেহমন যেন অকস্মাৎ একটা খোঁচা খেয়ে তিক্ততায় টান হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল—আমি তো বারণ করেছিলাম—এ সব করবেন না। একজনের অসুখ আর একজনের অভিনন্দন, তাকে নিয়ে উৎসব—এ হয় না বা হওয়া উচিত নয়।

ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই বিনো সেন এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এবং হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে বলেছিলেন—উদ্বোধন সঙ্গীত গাইছে বিনো সেন। গেয়েছিলেন—

তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নিচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমায় প্রেম হ'ত যে মিছে।

জাদুকর! ভুল করে ত্রিভুবনেশ্বর মনোহরণের জাদুদণ্ড দিয়েছিলেন —প্রতারক—ভণ্ডের হাতে। না; ভুল ক'রে নয়; নীরার জীবন নাটকে নীরাকে অগ্নি-পরীক্ষার সম্মুখে ফেলে দিতে।

ওই গান আর বিনো সেনের কণ্ঠস্বর—মুহূর্তে আশ্চর্য একটি

শান্তিময় পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। অতি ক্লান্ত তিক্ত মনও প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। হরিচরণবাবু কেঁদেছিলেন।

শুধু অনিমাদি তার কানের কাছে এসে বলেছিলেন—এ ভাই তোকে বলছে।

তখনও বিনো সেন গাইছিলেন—

তাই তো তুমি রাজার রাজা
তবু—তোমার হৃদয় লাগি—
ফিরছ কত মনোহরণ বেশে
প্রভু নিত্য আছ জাগি।

ভ্রূ কুঁচকে সে ফিরে তাকিয়েছিল অনিমাদির দিকে। অনিমাদি বলেছিলেন—ওটা রাজার রাজা নয়—রাণীর রাণী হবে। প্রতিবাদ করবার সময় সেটা ছিল না। তাই সে চুপ ক'রে গিয়েছিল। ভেবেছিল—এ সব শেষ হলে অনিমাদিকে কঠিন কথা বলবে বেছে-বেছে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে হয় নি। প্রতিবাদ নিজেই জানিয়ে গিয়েছিলেন বিনো সেন। গান শেষ ক'রেই তিনি বলেছিলেন—মাস্টারমশাই আপনার সভা শেষ করুন—আনন্দ করুন। প্রতিমা বড় অসুস্থ, আমাকে যেতে হচ্ছে। নীরা—তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না।

নীরা বলেছিল—না।

বিনো সেন চলে যাবার পর সে বলেছিল—

আমার শরীরটাও বড় খারাপ মাস্টারমশাই, আমি আর বসে থাকতে পারছি নে। অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। সত্যই হচ্ছিল।

ব্যাপারটা এমনি হয়েছিল যে কেউ কোন কথা বলতে পারে নি

এর পর। হরিচরণবাবু শুধু অল্প কয়েকটি কথায় তাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপরই সে সামান্য কিছু মুখে দিয়েই উঠে পড়েছিল। মাথা তার খসে যাচ্ছিল—তার উপর চিত্তের তিক্ততারও সীমা ছিল না। বিনো সেনের চলে যাওয়ার অশোভন ব্যস্ততা—তার মনে একটা উত্তাপের সৃষ্টি করেছিল।

উত্তপ্ত মনে অসুস্থ দেহে সে ফিরে এসেছিল। মাথায় যন্ত্রণা।

ঘরে গুমোট গরম। আকাশ ছিল মেঘাচ্ছন্ন। মনে তিক্ততা। বাইরের বারান্দায় ডেক-চেয়ার টেনে আকাশের মেঘের দিকে চেয়ে বসেছিল। ভাবতে চেষ্টা করেছিল, এর পর আর তার এখানে থাকা উচিত হবে না। বিনো-দাকে সে বলবে। না, মুখে বলতে সে পারবে না, চিঠি লিখে জানাবে। এখান থেকে কোন অজুহাতে কলকাতা গিয়ে জানাবে। সব গোলমাল হয়েছিল একটা বিদ্যুচ্চমকে। কোথা কোন দূরে মেঘ ডেকে উঠেছিল। গুরু গুরু রবে সঙ্গে সঙ্গে ঝিরঝির করে এসেছিল ঠাণ্ডা বাতাসের ঝলক। শরীরটা জুড়িয়ে গিয়েছিল। আঃ চোখ বুজে এসেছিল।

কখন ঘুমিয়ে গিয়েছিল এরই মধ্যে। হঠাৎ একটা চড়া বিদ্যুতের আলোয় ঘুম ভেঙে গেল। তারপরই কড় কড় শব্দে মেঘের ডাক। চমকে উঠেছিল সে। কাপড়চোপড় শরীর সব ভিজে ভিজে হয়ে গেছে বৃষ্টির ছাটে। বৃষ্টি নেমেছে তখন। ঘরে এসে শুয়ে পড়েছিল। আঃ বিনো সেনের মুখ। দেওয়ালে ফটোটা টাঙানো রয়েছে। টেবিলে বাতিটা জ্বলছে। কিন্তু উঠতে যে সে আর পারছে না। সে পাশ ফিরে শুয়েছিল।

পরের দিন সে যখন উঠল তখন শরীরটা ভার, মাথায় যন্ত্রণা, দেহে যন্ত্রণা। শরীর মন সব যেন ঝিম ঝিম করছে। কি হল তার? ডাকলে—অনিমাদি।

পাশের ঘরেই থাকে অনিমাদি। সাড়া দিলেন—কি?

—এস না ভাই একবার। দেখ না আমার কি হল? বড্ড খারাপ করছে শরীর।

—এ যে বেশ জ্বর রে। কপালে হাত দিয়ে বলেছিলেন অনিমাদি। তার পর তার আর কিছু মনে নেই।

সেই জ্বর বত্রিশ দিন। সুস্থ যখন হল তখন চল্লিশ দিন। সে দিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের শীর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। এ কালের চিকিৎসা—উপবাসের চিকিৎসা নয়। কঙ্কাল-সার হয় নি, তবে রোগা হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকেছিল অনিমাদি। —কি দেখছিস? কত সুন্দর হয়েছিস?

—সুন্দর হয়েছি? তোমার কি সব তাতেই ঠাট্টা?

—উঁহু উঁহু। শিল্পীর কথা, খোদ বিনো-দা বলেছেন। মায় তোর ছবি তুলে নিয়ে গেছে। ফটো।

—মানে?

—বত্রিশ দিনে তোর জ্বর ছাড়ল। তুই অঘোরে ঘুমুচ্ছিস, কাত হয়ে শুয়ে আছিস, মুখটা একটু পিছনের দিকে হেলে গেছে। হাত দুখানা প্রায় জোড়হাতের মত; চুলের তো পাঁজা, সে খোলা, মাথার উপর দিকে ছড়িয়ে আছে। বিনো-দা কলকাতা গিয়েছিলেন ফিরে এসেই বরাবর এলেন তোকে দেখতে। আমি পাশে বসে বললাম,

সকাল বেলা জ্বর ছেড়ে গেছে। উনি একদৃষ্টে তোকে দেখছিলেন, আমাকে বললেন, জানালাগুলো খুলে দিন তো। বললাম, রোদ্দুর আসবে। বললেন, সে তো পরে বন্ধ করলেই হবে। বলে নিজেই জানালা খুলে দিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, এখানে আসুন। এইবার দেখুন। বললাম, কি দেখব?—নীরাকে কি সুন্দর লাগছে। ওয়াণ্ডারফুল! শুয়ে আছে দেখুন! ঠিক যেন সতী সদ্য দেহত্যাগ করেছেন। ওয়াণ্ডারফুল! বলেই গলায় ঝোলানো ক্যামেরা তুলে ক্লিক্ ক্লিক্ করে দিলেন। তারপরই আবার ওদিকে সেই কাণ্ড! দেখবি বোধহয় সতীর দেহত্যাগ ছবি হবে।

মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা কিসের খোঁচা লেগেছিল। মুহূর্তে সারা চিত্তটা বিমুখ হয়ে উঠেছিল। কেন? কেন? সতীর দেহত্যাগের ছবির জন্য তার ছবি কেন? শক্তি থাকলে সে তখনই যেত। কিন্তু যেতে পারে নি। বিকেল বেলা বিনো-দা এলে বলেছিল, ওভাবে আমার ফটো নিয়ে ছবি আঁকবেন কেন?

বিনো-দা বলেছিলেন সেটা তুর্লভ মুহূর্ত, ছবিটা নিয়ে রেখেছিলাম। আঁকলে তোমার অনুমতি না নিয়ে আঁকতাম না। ইচ্ছে হয়েছিল কিন্তু পারলাম না। মনে হল তোমাকে যেন মেরে ফেলছি। অন্তত মৃত্যু কামনা করছি।

বড় ভাল লেগেছিল কথাটা। সব উত্তাপ জুড়িয়ে গিয়েছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে নীরা গাঢ় কণ্ঠে বলেছিল, আমি এবার চলে যেতে চাই বিনো-দা! আমি এখানে—

—হ্যাঁ। শান্তি পাচ্ছ না। সহ্য করে থাকতে পার না?

—না।

হাসলেন বিনো-দা। তারপর বললেন, জোরই বা কোথায় আমার? যাবে। তবে সে ব্যবস্থা আমিই করব অন্তত সেটুকু ভার আমাকে দিয়ো। একখানা দরখাস্ত লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সই করে দিয়ো। সরকারী স্কলারশিপ নিয়ে বিদেশে শিশু শিক্ষা সম্পর্কে পড়াশুনো করে এস। তোমার আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যত চাই।

সে উঠে তাঁকে প্রণাম করেছিল। তিনি তার মাথায় হাত দিয়ে পায়ের তলায় বসিয়ে তার চুলের রাশির খানিকটা মুঠোয় পুরে বলেছিলেন, শোন একটা কথা বলব।

—বলুন।

—বিচলিত হবে না যেন।

সেদিন সে এমনি নাটক আশঙ্কা করেছিল। ভুরু কুঁচকে প্রতীক্ষা করেছিল সে। সেদিন হলে মৃদু দৃঢ়স্বরে একটি কথায় শেষ করত।—না।

—দাদু নেই।

—অ্যাঁ!

—না। না। চঞ্চল হতে নেই। কাঁদতে নেই তাঁর জন্যে। তিনি বারণ করে গেছেন সকলকে।

উঠে গেলেন। যাবার সময় হেসে বলে গেলেন আমার মৃত্যুতেও কেঁদো না। যেখানেই থাক। আমিও তাই বলে যাব সকলকে।

কি নিষ্ঠুর মানুষ! সে কাঁদে নি। আকাশ পানে চেয়ে বসেছিল। যাবার পথে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলেছিলেন—আর একটা খবর বোধহয় জান না, প্রতিমা এখন এখানে নেই। তোমার অসুখের সময়—আবার তার শরীরটা বেশী খারাপ হওয়ার তাকে চেঞ্জে পাঠিয়েছি। পুরী গেছে সে।

কিন্তু সে কথা তার মনে ঠাঁই পায় নি। সে ভাবছিল দাদু নেই! আর বিনো সেন কি আশ্চর্য মানুষ! নিষ্ঠুর। আসক্তিহীন।

* * *

দিন পনের পরেই প্রতিমা ফিরে এল। সে বিনো সেনকে রেখে থাকতে পারবে কেন? অনিমাদি অন্তত তাই বললেন। শেষে বললেন—মরণ! তারপর নীরাকে বললেন—তা তুই যা না চেঞ্জে। না তুইও পারবি নে প্রতিমা এখানে থাকতে?

নীরা ম্লান হেসে বললে—আমি একেবারেই যাব অনিমাদি। দরখাস্তের উত্তরটা এলেই চলে যাব।

—বিলেত যাবি?

—হ্যাঁ।

তারপর এ ক'টা মাস সে সেই দরখাস্তের উত্তরের অপেক্ষা করেই রয়েছে এখানে। এর মধ্যে প্রতিমার মনের অসুখ দেহকে চেপে ধরছে। সে বড় ক্লান্ত বড় ক্লিষ্ট। বিনো-দা তাকে বিশ্রাম দিয়েছেন। বিশ্রাম করো। প্রতিমা ঘুরে বেড়ায় উদ্‌ভ্রান্তের মত। মায়া হয়।

হঠাৎ আজ—বিনো সেনের জন্মদিন। জন্মদিন প্রতিবারই প্রতিপালিত হয়। উদ্যোগ করেন অনিমাদি। এবার সে ভার নিয়েছিল। সে চলে যাবে, আসছে জন্মদিনে থাকবে না। তাই তার মনের মত করে সব করেছিল। নিজে মালা গেঁথেছিল; নিজে অভিনন্দন রচনা করেছিল। লিখেছিল, 'তোমার জীবনকেন্দ্রে আছে একটি অমৃতবিন্দু—সে বিন্দু আজ সিন্ধুর মত করুণাতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত। তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিলেন বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না,

অথচ সকলকে তুমি বাঁধো এক অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে। মন তোমার রামধনুর সপ্তবর্ণের ভাণ্ডার ; তোমার তুলিতে তুমি সৃষ্টি কর অপরূপের। রূপ তোমার পায়ে এসে নিজেকে অঞ্জলি দেয়।'

কথাটা সে প্রতিমাকে স্মরণ করেই লিখেছিল। কিন্তু বিনো সেন—। বিনো সেন ভাবলেন নীরা বুঝি নিজের কথাই লিখেছে।—অমনি বিদায়ের এই নাটকীয় মুহূর্তটি বেছে নিয়ে তাঁর লালসামদির উচ্ছিষ্ট জীবন নিয়ে এলেন তার কাছে—নাও নীরা গ্রহণ কর।

মনে পড়ছে—

বিনো সেন যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠে গেলেন সভার শেষে। বোধ করি ওখানেই একটা নাটক করবার বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। চতুর বিনো সেন সেটাকে দমন করেছিলেন তখন। তারপর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। বললেন, আমায় যেন কেউ না ডাকে। সারাটা দিনের পর সন্ধ্যায় বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন নীরার বারান্দায়। চমৎকার ক'রে ছ'কে নিয়ে এসেছিলেন নাটকের একটি দৃশ্য। মিলনান্ত নাটকের দৃশ্য। হায় বিনো সেন—তুমি নীরাকে চেন নি? সে কঠিন। সে উচ্ছিষ্টভোজী নয়। তার মূল্য অনেক। যাক। বিনো সেন বারান্দায় এসে ডেকেছিলেন—

—নীরা।

—আসুন। আপনি এমন করে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ভাবলাম শরীর খারাপ। আবার ভাবলাম, হয় তো অন্যায় কিছু লিখেছি। বলেছি।

বিনো সেন বিচিত্র দৃষ্টিতে আকাশের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—না।

তবে?

এটা ধর আগে। তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে, তোমার সেই স্কলারশিপের জন্য। একখানা খাম এগিয়ে দিলেন। সে কি বলবে ভেবে পেলে না। কিন্তু একটা বেদনা যেন সে অনুভব করলে। চলে যাবে সে এখান থেকে।

—তারপর—। চুপ করে গেলেন বিনো সেন।

—বলুন।

একটু চুপ করে থেকে বললেন এই চিঠিখানা—

—কার চিঠি?

—পড়ে দেখো। ধর। বলেই তিনি উঠে পড়লেন।—প্রতিমা আজ একটু বেশী অসুস্থ, আমি যাই দেখে আসি।

চিঠি হাতে করেই নীরা তাঁর দিকে তাকালে—প্রতিমা! প্রতিমা! প্রতিমা! চাঁদে কি কলঙ্ক থাকেই!

"নীরা,

বহু দ্বন্দ্ব করে শেষে নিজেকে নিঃসংশয়ে যাচাই করে তোমাকে পত্রখানা লিখছি। আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে তুমি বললে, 'তোমার জন্মমুহূর্তে জন্মভূমি তোমার ললাটে পরিয়ে দিয়েছিল বৈরাগ্যের তিলক, তুমি জন্ম-বৈরাগী। কোন বন্ধনে তুমি বাঁধা পড় না অথচ সকলকে বাঁধো অচ্ছেদ্য গভীর বন্ধনে।' বুকটা আমার হাহাকারে ভরে উঠল। এ হাহাকার চিরদিন আছে নীরা। যারা অভ্যাসের বশে পাথর না হয়ে যায় তাদের সবারই এ হাহাকার থাকে। ইদানীং আমি যেন সেটা বেশী করেই অনুভব করছি। প্রতিক্ষণে বিশেষ করে যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকি তখন আমি অনুভব করি আমার কেউ নেই।

কেউ আমার নয়। আপনার, একান্ত আপনার কাউকে যে আমি চাই সে সত্য আমার অন্তরাত্মা তারস্বরে আমাকে বলছে। আমার আত্মা ব্যাকুল। তোমাকে আমি চেয়েছি। অনেকদিন থেকে চেয়েছি। কিন্তু—আজ যখন চিঠি এল, বিদেশে যাবে তুমি, সব সম্পর্ক কেটে যাবে, তখন আর যে আমার নিবেদন না-জানালে নয়। আমার আত্মা শতবাহু বিস্তার করে তোমাকে চায় তার বাহুবেষ্টনের মধ্যে, হৃদয়ে চায়, মনে চায়। প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

তোমাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আমি জানি তুমি আমাকে ভালবাস। প্রতিমা কোন বাধা নয়—। তার কথা তোমাকে—।"

আর নীরা পড়েনি। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। বিনো সেন, বিনো সেন—প্রতিমার প্রতি অনুরক্ত বিনো সেন বলছে—প্রতিমা কোন বাধা নয়! আজ এই কয়েক বৎসর প্রতিমার বিনো সেন—বিনো সেন ক'রে পাগলিনী হওয়া—বিনো সেনের প্রতিমা পূজা সে যে স্বচক্ষে দেখেছে! তারপরও লিখেছেন—প্রতিমা কোন বাধা নয়! হঠাৎ তার চোখের সামনে বিনো সেনের একটা কদর্য চেহারা বেরিয়ে পড়ল। তার চিত্তলোকে পুরানো তেজ যেন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে বের হল।

হাতে চিঠি তুমড়ে মুঠোয় ধরে হন হন করে—যেন জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।—লম্পট! ভ্রষ্ট! প্রতিমার জীবনটা নষ্ট করে আবার—। এসে উঠল বিনো সেনের বারান্দায়—।

দুই হাতে দরজাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে সে দাঁড়াল বিনো সেনের সামনে।

পর মুহূর্তে শোনা গেল, বিনো সেন যেন আর্তনাদ করে উঠলেন, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, আমার অন্যায় হয়েছে। আমাকে ক্ষমা কর।

—না—না—না। চীৎকার করে উঠল নীরা—আপনি লম্পট, আপনি ভ্রষ্ট, আপনি মুখোশধারী।

রাত্রির স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে সে চীৎকার ছড়াচ্ছিল। গোটা আশ্রমটা চকিত হয়ে উঠল। কি হল।

বিনো সেন আর্তনাদ করছেন, আমাকে ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে ক্ষমা চাচ্ছি। আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

ক্ষমা! ওই প্রতিমা—। এই চিঠি!

স্তব্ধ হয়ে গেলেন বিনো সেন। অপমানে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিয়ে সে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তুমি ভণ্ড, তুমি লম্পট। নীরা যুদ্ধ করে অনেক জয় করে এসেছে। এখানেও সে হারবে না। সে জিতবে।

সে জিতেছে। সে হারে নি। আশ্রমের সকল লোক দেখেছে বিনো সেনের হেঁট মাথা, অপরাধীর মত স্তব্ধতা। ঈশ্বর সাক্ষী।

বিনো সেন সেই পরাজয়কে ঢাকবার জন্য—সকলকে বললেন—নাটক তো শেষ হল—এবার সব যাও।

অর্থাৎ একটা রঙীন কাপড়ের পর্দা ফেলে দিয়ে—সবটা ঢেকে দিতে চাইলেন। কাল সকালে বলবেন—অভিনেত্রী নীরা চলে গেছে। সব ঝুট। অভিনেত্রী অভিনয় করে গেল।

ডাকছে সামপানি চালক। ওঃ এ যে দুর্গাপুর ব্যারাজের একেবারে মুখে এসে পড়েছে। মানসমঞ্চে জীবন নাটকের অভিনয়ের মধ্যে একেবারে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

নাটক! বিনো সেন জীবন-নাটকই বটে। তবে জীবন-নাটকে সবাই তো নায়ক নায়িকা নয়, তারা পার্শ্ব চরিত্র, কাটা সৈনিক, দূত—তাদের ভূমিকায় একটু চেঁচামেচি হলেই তারা ব্যঙ্গের পাত্র হয়ে পড়ে। তাদের তখন নাটুকে বললে গালাগালি হয়। উপহাস হয়। নীরা নায়িকা। তার ভূমিকায় সে আজ জ্বলতে পেরেছে—উচ্চ কণ্ঠে সদর্পে তোমাকে অপরাধী ঘোষণা করতে পেরেছে বলেই সে বিজয়িনী। তোমার ভণ্ড স্বরূপ সে উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিয়ে সে চলল—চলল নূতন অঙ্কে—নূতন পটভূমিতে।

—পুল পারাইতে পয়সা লাগবেক দিদিমণি।

একটা টাকা তার হাতে দিল নীরা।

ওপারে নূতন দূর্গাপুর। ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে সারি সারি। নূতন ভারতবর্ষ। যুদ্ধোত্তর পৃথিবী। তার জীবনের নূতন পটভূমি।

হায় বিনো সেন।

তুমি যদি প্রতারক ভণ্ড না-হতে! তোমাকে যে অনেক শ্রদ্ধা করেছিল নীরা। তোমার ওই প্রতিমা-প্রতিমা-প্রতিমা ক'রা দেখেও শ্রদ্ধা করেছে। বরং গভীরতর শ্রদ্ধা করেছে ভালবাসা দেখে! তুমি মাটির ঠাকুর। পড়বা মাত্র ভেঙে গেলে!

না। আপশোষ কর না নীরা। নূতন পৃথিবীতে ঢুকছ। নূতন জীবন। ভেবো না আর বিনো সেনের কথা!

মুছে দাও। ডাস্টার দিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের খড়ি দিয়ে আঁকা ছবির মত মুছে দাও।

যাচ্ছে না। মন হিংস্র। আঘাত খেয়ে হিংস্র না হয়ে পারে না যে বারবার আসছে ওই মুখ।

বেশ। বারবারই মুছবে সে।

গাড়িখানা কংক্রীটের ব্রিজ বেয়ে চলল ওপারের দিকে।

পনেরো

(শেষ অঙ্ক)

যবনিকা আবার উঠল।

জীবন যেখানে নাটক—সেখানে নাটকীয় গতিবেগ জীবনে সঞ্চারিত হয়—সেখানে তো ইচ্ছে করলেই মধ্যপথে নেপথ্যে প্রস্থান করা চলে না। ঈশ্বর থাকুক বা না থাকুক—অদৃশ্য নাট্যকারের মত একটি বিচিত্র শক্তির সত্তা আছে। অথবা পৃথিবীর কার্যকারনের গতিবেগের মত মানুষের জীবনেও একটি স্বয়ংক্রিয়তা আছে—যা তার গতিবেগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত একটি নির্ধারিত গতিতে চলে—চলতে হয়—থামার উপায় নেই। মধ্যপথে যেখানে থামে সেখানে ঘটে একটা আকস্মিক কিছু! বিস্ফোরণের মত আকস্মিক প্রবল একটা সংঘটনে শেষ হয়। সেখানে প্রশ্ন করার কিছু থাকে না। তর্ক করা চলে না—কেন এমন হল! নীরার জীবনে কোন আকস্মিক বিস্ফোরণ ঘটে নি, কোন দুর্ঘটনায় তার জীবন নাট্যে ছেদ পড়ে নি। তাই দু-বছর পর আবার তাকে অকস্মাৎ দেখা গেল দমদম এরোড্রোমের দৃশ্যের পটভূমিতে। সে ইংল্যাণ্ড থেকে পূর্ব দিগন্ত যাত্রী একখানা প্লেন থেকে নামল।

ইংরিজী ১৯৫৮ সাল। অক্টোবর মাস।

ঠিক পূজোর পর। শরতের আকাশে তখনও সাদা হাল্কা বিচ্ছিন্ন মেঘপুঞ্জের যাওয়া-আসার পালা শেষ হয় নি। নীরা নামল—কাঁধে,

স্ট্র্যাপ-ঝোলানো ব্যাগ, গায়ে হাল্কা রংঙের পাতলা গরম কাপড়ের একটা ওভার-কোট ; কালো মেয়ের মুখে শীতপ্রধান দেশের বর্ণোজ্জ্বলতা কিন্তু ঠোঁটে লিপস্টিক নেই—রুজ পাউডার নেই। বরং মুখে চোখে যেন একটি শীর্ণতা। তবে দুটি ভ্রূর সংযোগস্থলে একটি তিক্ততার কুঞ্চন ফুটে রয়েছে, সেটি ছোট কুম্‌কুমের টিপেও ঢাকা পড়ে নি। আয়ত চোখ দুটির দৃষ্টিতে একটি শাণিত দীপ্তি। একটি প্রচ্ছন্ন ক্ষুব্ধতার তীব্রতা সকল মানুষকেই যেন থমকে দাঁড়াতে বলে। কিন্তু তার উপরে যেন একটা ছায়া পড়েছে। বর্ষার দিগন্তে জলভারাবনত ঘন কালো মেঘ উঠলে—নির্মেঘ মধ্য আকাশের মধ্যাহ্ন সূর্যের দীপ্তির উপরেও যেমন একটা ছায়া পড়ে তেমনি ছায়া। দু-বছর পর সে ইংলণ্ডে পড়া শেষ করে ফিরছে। লীডস ইউনিভারসিটিতে শিশু-শিক্ষায় বিশেষজ্ঞতা অর্জনের জন্য যে সরকারী স্কলারশিপের কাগজপত্র বিনো সেন দিতে এসে তাঁর সেই প্রণয়পত্র দিয়েছিলেন—সেই স্কলারশিপের পড়া শেষ ক'রে সে দু-বছর পর আজ ফিরে এল।

বেশ খানিকটা রোগাও হয়ে গেছে সে। এবং আরও খানিকটা গম্ভীর। মনস্তাত্ত্বিকেরা কেউ বলতে পারে, কার্যকারণে হয় তো। না সে গম্ভীর নয়—কিছুখানি বিষণ্ণভাবে রূঢ়। যাক, ঠিক এই সময়টিতে অর্থাৎ প্লেন থেকে যখন নামল তখন তার মনের এই বিচিত্র প্রতিফলন-টুকু আশ্চর্যরূপে স্পষ্ট, অত্যন্ত অকপটভাবে ব্যক্ত তার মুখে চোখে সর্বঅবয়বে ; তার পদক্ষেপে পর্যন্ত।

কারণ ছিল—।

ইংল্যাণ্ড থেকে ফেরার পথে—এই দীর্ঘ সময়টাতে—আবার একবার সে জীবনটা খতিয়ে দেখতে চেষ্টা করেছে। প্লেনের মধ্যে

নিঃসঙ্গ অবসরে—আবার একবার তার মানসমঞ্চে জীবন-নাটকের অভিনয় হয়ে গেছে। তার তখন এই মুহূর্তটিতে সদ্য নাটকাভিনয় দেখে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে-আসা দর্শকের মত একটা আচ্ছন্ন ভাব।

তৃতীয় অঙ্ক পর্যন্ত সেই পুরানো নাটক। নূতন অভিনয়ে কোন কাটছাঁট হয় নি, বাহুল্য মনে হয় নি—মিথ্যা বা অবাস্তব মনে হয় নি, ব্যাখ্যায়-রূপায়নে পুরানো নূতন নাট্যবস্তু অভিনয় এক এবং অভিন্ন সুতরাং নির্ভুল।

শুধু তৃতীয় অঙ্ক নূতন। অসমাপ্ত তৃতীয় অঙ্ক।

সেদিন দুর্গাপুরের ব্যারেজের সংলগ্ন ব্রিজের মুখে দ্বিতীয় অঙ্কের যে যবনিকা পড়েছিল—সেই যবনিকা এই পথের মধ্যে প্রথমবার উঠেছে।

না। প্রথমবার নয়। এই দু-বছরের মধ্যে বিদেশে থাকবার সময় উঠেছে, উঠতে চেয়েছে। কিন্তু কখনও সুরু হয়েই থেমে গেছে—না হয় উঠতে উঠতে ওঠে নি। কাজ এসেছে কখনও, কখনও তিক্ততায় অথবা বেদনায় মনে হয়েছে—থাক। কি হবে, যা হয়ে গেছে তার অভিনয় দেখে? থাক। ও থাক।

এবার আসবার পথে প্লেনে যবনিকা উঠেছিল—উঠেছিল শুধু অবসরের সুযোগ নয়—মনের তাগিদে। অকস্মাৎ এই বিদেশেও বিনো সেন—অক্ষম আক্রোশে তার সর্বাঙ্গে রঙের তুলি ছিটিয়ে তাকে উত্যক্ত করেছেন। দূরান্তরে থেকেও সে শুনেছে বিনো সেন ব্যঙ্গভরে বলছেন—নাটক করে সে দিন তুমি যে অপবাদ আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে মাথাটা হেঁট করতে চেয়েছিলে—সে মাথা হেঁট হবার নয় গো

শ্রীমতী নীরা। সেটা উঁচুই আছে। তোমার নাটুকেপনার আড়ালে লুকনো স্বরূপকে আমি এঁকে দিয়েছি।

এবার তার শেষ বোঝাপড়া করতে হবে তাকে। হ্যাঁ, করতে হবে। তার জীবনের নাটক শেষ হবে তার জীবনের শেষ মুহূর্তে কিন্তু এই তৃতীয় অঙ্কে তোমাকে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। নিষ্ঠুর ক্ষমাহীনা নীরা কাউকে ক্ষমা করে নি—তোমাকেও করবে না। তাই তার আগে—একবার অভিনয় দেখে খতিয়ে নিচ্ছিল। যা করেছে বিনো সেন—তাও কি তার অধিকার ছিল। যে রূপকে তার স্বরূপ বলে ব্যক্ত করেছে—সে কি সত্য ?

রাত্রে প্লেন উঠেছে তখন পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট উর্দ্ধে। তখন এয়ার-হোস্টেস্‌দের আপ্যায়ন হয়ে গেছে। প্লেনে বিপদের সময় কি ভাবে আত্মরক্ষার জন্য লাইফভেস্ট পরে জানালা খুলে লাফ দিয়ে পড়তে হবে সে সব হয়ে গেছে। মনটা বারেকের জন্য চঞ্চল হয়েছিল—তারপর একটু হাসিও পেয়েছিল। হোক না তাই। কেউ কাঁদতে নেই, তারও কাউকে মনে পড়বে না ;—কিন্তু সেই মুহূর্তে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়েছিল—মনে পড়েছিল বিনো সেনকে ; বিনো সেনের সঙ্গে বুঝাপড়া হবে না। সেটা না-করে মরতে মন সায় দেয় নি। হ্যাঁ, করতে হবে ওটা।

তারপর আলো কমে গেল। ক্ষীণ জ্যোতি ক'টি আলো যেন স্বপ্নালুতার আবছায়া সৃষ্টি করে জ্বলতে লাগল। যাত্রীরা ঘুমিয়ে পড়ল। শোনা যাচ্ছে শুধু প্লেনের একটানা গর্জন। বাইরে অন্ধকার উপরে আকাশে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। ঝলমল করছে। চাঁদ নেই। থাকলে সেও ছুটত সঙ্গে সঙ্গে। মহাশূন্যে মহা নৈশব্দের মধ্য দিয়ে

একটানা গর্জন করে প্লেন ছুটছে। বিশাল ডানা দুটোর পিছনে লাল নীল সাদা আলো পরপর জ্বলছে নিভছে।

এরই মধ্যে উঠল যবনিকা।

সেই প্রথম অঙ্ক, সেই দ্বিতীয় অঙ্ক। এক অভিন্ন।

তারপর? তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উঠবে কোথায়? দুর্গাপুরে? না। দুর্গাপুর স্টেশন থেকে কলকাতায় পৌঁছুনো—হোটেলে ওঠা এগুলো অঙ্কান্তরের বিরতির মধ্যেই থাক।

কলকাতায় হোটেল ছাড়া কোথায় উঠবার জায়গা তার ছিল? দাহু নেই। কোথায় কার কাছে যেতে পারত? নিজের বাড়ি? জ্যাঠতুত ভাইদের কাছে? না। সে-কদর্যতার মধ্যে যেতে তার মন চায় নি। যা মৃত, যাকে সমাধি দিয়ে চলে এসেছে অথবা চিতায় তুলে আগুন দিয়ে চলে এসেছে তা খুঁড়ে দেখতে অথবা ছাই ঘেঁটে দেখতে তার প্রবৃত্তি হয় নি। বরং কোন তীর্থে গিয়ে পিতৃপক্ষে তর্পণ করবে—যে চাস্মাকং কুলে জাতাঃ অপুত্রো গোত্রিনো মৃতঃ—অথবা যারা অপঘাতে মরেছে আমার দুর্ভাগ্যক্রমে আমার জ্ঞাতি—তারা আমার এই মাটিতে ফেলে দেওয়া জলে আর এই কাপড় নেঙড়ানো জলে তৃষ্ণা নিবারণ কর।

হোটেল ভাল। সে নীরা আজ সে নয়। আজ তার থেকে অনেক সক্ষম—অনেক সবল—আজ সে পৃথিবীর বুকে অবাধ বিচরণে বেড়াবে, তাকে জানবে, শিক্ষা নেবে, তার জন্য পা বাড়িয়েছে সে—তার হোটেলেই ভাল।

হাতে তার টাকা তার অবস্থার পক্ষে ভালই ছিল। ওখানকার তিন বছরের মাইনের টাকা—প্রভিডেন্ট ফাণ্ড নিয়ে প্রায় আড়াই

হাজার টাকা। স্থির সে করেই এসেছিল—ভবিষ্যৎ। যে স্কলারশিপ সে পেয়েছে—তাই নিয়ে সে ইংল্যাণ্ড যাবে। শিক্ষা শেষে ফিরে আসবে ভারতবর্ষে। এই হবে তার জীবনের ব্রত। বিবাহ কল্পনা চুকে গেছে অনেকদিন। এই ক' বছরে যদিই তার মূল থেকে আবার কোন শাখা বের হবার উপক্রম করছিল—যা সে নিজে অনুভব করতে পারে নি—তাও নিষ্ঠুর দাওয়ের কোপে—নির্মূল করে দিয়েছে বিনো সেন। বিনো সেনের সঙ্গে বিবাহ কামনার কোন সম্পর্ক নেই কিন্তু বিনো সেন সব পুরুষের উপরেই ঘৃণা ধরিয়ে দিয়েছেন। বিবাহ নয়। ঘর নয়। নূতন যুগের নারী—নূতন তার কল্পনা, নূতন তার জীবন—নূতন তার পথ।

দু-একবার মনে হয়েছিল—বিনো সেনের উদ্যোগে পাওয়া স্কলারশিপ সে নেবে না। কিন্তু না। কেন নেবে না? এই স্বাধীন দেশের মেয়ে সে—তারও তো অধিকার আছে। সে তো পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে তবে যাবে। তবে পাবে।

এই সপ্তাহে গিয়েই তো দিল্লীতে তাকে ইণ্টারভিউ দিতে হবে। এ দেশে জন্মের অধিকারে নিজের যোগ্যতার অধিকারে যা তার প্রাপ্য সে তা নেবে না কেন?

হোটেলে উঠেছিল।

দাদুদের বাড়ি একদিন গিয়েছিল।

সে স্মৃতি মর্মান্তিক। চাঁদহীন রাত্রির আকাশ নয়, সমস্ত তারা মুছে যাওয়া কালো একটা বেদনার সমুদ্রের মত শূন্যমণ্ডল।

পালিয়ে এসে বেঁচেছিল সে।

বড় মানুষদের সংসার করা উচিত নয়। একটা জাতির জীবনে

রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী নেতাজী যাওয়ার ধাক্কাও কোন রকমে সয়ে যায়। কিন্তু একটা সংসারের পক্ষে—এমন মানুষের তিরোধানে সেই দ্বারকার কাহিনী পুনরাবৃত্তি ঘটে। শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গবিক্ষোভে দ্বারকাকে আপনার কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। মান সম্মান শুধু নয়—এমন ক্ষেত্রে যেন আলো বাতাসেরও অভাব ঘটে। চোখের লবণাক্ত জল সমুদ্রে পরিণত হয়।

এই দিন তার আপশোষ হয়েছিল কাঁদতে না-পারার জন্য। সমস্ত জীবন না-কেঁদে, কান্নাকে বাঁধ দিয়ে বেঁধে বেঁধে—এমন স্বভাব হয়েছিল তার যে বুকের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করেও বাঁধ দেওয়া কান্নার সরোবরে কয়েক ফোঁটা জলও কোন মতে বেরিয়ে আসতে পারে নি। অথচ তার সে কি মাথা কোটা! নিজেকেই নিজের পাথর কি মরা মাটি মনে হয়েছিল।

মনে হয়েছিল কাঁদতে সে চায়, চাচ্ছে—কিন্তু পারছে না।

প্লেনে আসতে আসতে সেই মুহূর্তটিতে মনে হয়েছিল—কাঁদতে সে চায়, কাঁদতে পারলে সে যেন বাঁচে, কিন্তু কাঁদতে সে পারছে না!

*　　　　*　　　　*

যবনিকা উঠছে—হাঁ, নাটকীয় ঘটনা বটে। এইখানেই যবনিকা যেন আপনি উঠে গেল।

স্মৃতি-প্রযোজক ভুল করে না।

যবনিকা উঠছে কলকাতার রিজ্যন্যাল পাসপোর্ট আপিসে। ব্রেবোর্ণ রোডে। পাস্‌পোর্টের জন্য গিয়েছিল। দিল্লীতে পরীক্ষা ভালই হয়েছিল। অবশ্য বিভাগীয় সেক্রেটারি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—

আপনি বিনয় সেনের আশ্রমে কাজ করছিলেন। ওখান থেকে B. A. পাশ করেছেন ?

সে বলেছিল—হ্যাঁ।

—ছেলেদের পড়ানোর কাজ তা হ'লে আপনার ভাল লেগেছে ?

—হ্যাঁ।

—শ্রী সেন আপনার সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করেন দেখছি। একটি সার্টিফিকেট তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন।

ভাল লাগে নি কথাগুলি তার। সে চুপ করেই ছিল।

স্কলারশিপের সংবাদ এসেছিল দিন পনেরোর মধ্যে। সরকারী তৎপরতায় সে একটু বিস্মিত হয়েছিল। অবশ্য দিল্লীর তৎপরতা সত্যই প্রশংসার। প্রদেশের মত নয়। যাক।

এ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের পটভূমি পাসপোর্ট আপিসের রিজন্যাল অফিসারের ঘরের পাশের ঘরখানি। Visitors' Waiting Room ; ঘরখানা ছোটই ; অনেকগুলি চেয়ার একখানা নিচু গোল টেবিল। অনেকগুলো পুরনো সাময়িকপত্র। চীনা, বার্মিজ, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ইয়োরোপীয়ান ভদ্রলোক কয়েকজন—দুটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে—আর এদেশের টাই-বাঁধা স্যুটপরা পুরুষ আর লিপস্টিক-মাখা, চুল বব্-করা, গগলস্-পরা মেয়ে। তারা সিগারেটও খায়।

একপাশে একখানা চেয়ার টেনে সে বসে পড়েছিল। হঠাৎ চোখের গগলস্ খুলে—মুখের সিগারেটটা নামিয়ে একজন এদেশী মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল—নীরা ?

কণ্ঠে তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

নীরার মন ব্যস্ত হয়ে ছড়িয়েছিল তার নিজের জীবনে—ভবিষ্যতের

ভাবনায়। তার সাহস অনেক—অভাব নেই—তবু দেশান্তরের ভবিষ্যত সে কল্পনা করতে চেষ্টা করছিল। মেয়েটির কথায় নীরার ছড়ানো মন সংহত হয়ে সচেতন হল—স্থান-কাল-পাত্রের অভিমুখে। মুহূর্তে সে চিনলে এবং সেও সবিস্ময়ে বলে উঠল—এনা বউদি!

—হ্যাঁ। ওরে বাপরে! কত দিন পর বল তো?

—পাঁচ বছর পার হয়ে গেছে!

—বাঃ, কি অপরূপ হয়েছ তুমি নীরা! আমি বলি নি তোমাকে?

—তা বলেছিলে। কিন্তু রূপ নিয়ে আজও মাথা ঘামাই নি আর আয়নাতে নিজেকে দেখতে সময় পাই নি!

—তা না পাও, কেউ বলে নি?

ধ্বক ক'রে জ্বলে উঠেছিল নিভন্ত ক্ষোভ। কিন্তু নিজেই সেটাকে চাপা দিয়ে বলেছিল—ওসব ছাড়ান দাও। আমি স্কুলের মাস্টারী করতাম। সুতরাং ও সব আমাদের jurisdictionএর বাইরে।

—মিছে কথা। সন্ন্যাসিনীর রূপ থাকলে তার কাছেও যদি কেউ গিয়ে বলে—এত রূপ তোমার—

বাধা দিয়ে সে বলেছিল—থাম বউদি।

—দাঁড়াও। একটা কথা বলে নি। আমি আর তোমার বউদি নই। আমার সঙ্গে তাঁর divorce হয়ে গেছে।

—divorce?

—হ্যাঁ, বনল না। তা ছাড়া অজিতের অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেছে। নানান কাণ্ড—সে এক মহাভারত। যাকগে। এখন তুমি এখানে, কি ব্যাপার? পাসপোর্ট আপিসে?

নীরা বলেছিল—ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের একটি স্কলারশিপ পেয়েছি—ইংল্যাণ্ড যাব দু-বছরের ট্রেনিং নিতে।

—বল কি? চল চল একটু বাইরে চল ভাই। শুনি। তুমি ভাই দেখালে খুব! ওঃ!

বাইরে একটু ওরই মধ্যে নিরালায় নীরার কথা শুনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—তোমাকে ওরা চেনে নি, আমি চিনেছিলাম। অবশ্য সবটা মানে এতটা নয়। ওঃ তুমি অবাক করেছ আমাকে। একবার শুধু একবার যখন সোমেশবাবু অজিতকে বলেছিলেন—তোমার বোনের সঙ্গে যদি আমার ছেলের বিয়ে দাও তবে আমি ফিল্মের লোকসানটা কোম্পানীর বলে চালিয়ে নেব—তখনই—কার।—

একটু থেমে বলেছিল—কারণ আমার কথাতেই অজিত ফিল্মে নেমেছিল, সেইজন্যে লোকসান দেনার হেতু মনে হ'ত নিজেকে—। তখন আমি তাই বলেছিলাম—ওর ভেতরে ছিলাম। ঠিক তোমাকে এতটা আঁচ করতে পারি নি! যাকগে ভাই—আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি—

নীরা জিজ্ঞাসা করেছিল কয়েকটা কথা ভাইদের সম্পর্কে।

জ্যাঠাইমা মরেছে।

অজিতদা প্রায় সর্বস্বান্ত, এখন দালালী করে, বাড়ি বিক্রি করছে—এর মধ্যে বাড়িও ছেড়েছে একরকম। বস্তীতে একটা মেয়েকে নিয়ে থাকে। বাকী ভাইগুলোও তাই।

হঠাৎ নীরার আবার মনে হয়েছিল একটু কাঁদতে পারলে যেন সে বেঁচে যেত। কাঁদতে পারে নি। স্তব্ধ হয়ে একটা জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল।

এনাক্ষীও কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়ে ছিল। একটা মমতা বোধহয়

তারও ছিল। মানুষ তো। তারপর হঠাৎ বললে—দেখ দারিদ্র্য আর অজিতের বিশ্বাসঘাতকতা দুটো সইতে পারলাম না একসঙ্গে। একটা হলে হয় তো সইত। বিয়েটা ভালবেসেই করেছিলাম। আবার চুপ করলে। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল। হঠাৎ স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বলেছিল—একটা খবর দি তোমাকে। বিদেশ যাবে। কাজে লাগবে। অজিতেরা বাড়ি বিক্রি করছে—বললাম না? তা—তোমার তো অংশ আছে বাড়িতে। সেইজন্যে কেউ নিতে চাচ্ছে না—তোমার সই ভিন্ন। ওরা তোমাকে খুঁজছে। তুমি না-হলে একটি জাল মেয়ে খাড়া ক'রে বিক্রি হয়ে যেত। তুমি যাবা মাত্র টাকাটা পেয়ে যাবে। কালই যেয়ো বুঝেছ! মোচড় দিলে বেশী পাবে। হাসি পেয়েছিল নীরার। এনাক্ষী যা বললে তাতে মনে হল—তখন পুরো না চিনলেও আজ সে তাকে চিনেছে। বললে—যাব। কিন্তু তুমি divorce তো করেছ—বিয়ে করেছ আবার?

—রাম কহো। আবার! বাবাঃ। খুব সাধ মিটেছে।

—যার সঙ্গে কথা বলছিলে ওটি কে?

—বন্ধু। ফিল্ম প্রডিউসার ডিরেক্টার একজন। ফিল্ম ফেস্টিভালে ইয়োরোপ যাচ্ছে—আমাকে নিয়ে যেতে চাইলে—বললে যাবে? বললাম যাব। I am always a sport. খেলতে এসেছি খেলে যাব, না বলব কেন?

বেয়ারা এসে তাকেই ডেকেছিল—অফিসার তাকেই ডাকছেন।

কাজ তার সহজেই হয়ে গিয়েছিল। কাগজপত্র পরিষ্কার, সরকারী বৃত্তি; অফিসার বলেছিলেন, দিন পনেরোর মধ্যে পেয়ে যাবেন। কোন গোলমাল নেই।

বেরিরে আসবার সময় এনাক্ষী হাত নেড়ে বলেছিল—গুড লাক। বিলেত পর্যন্ত যদি যাই নিশ্চয় দেখা করব। তুমি কিন্তু যেয়ো দমদমে। ভুলো না। টাকাটা পেয়ে যাবে।

দৃশ্যান্তর হল। সেই পুরনো দমদমের বাড়ি। নতুন কাল—নতুন হাওয়া—এই ক'বছরেই জনাকীর্ণ হয়ে গেছে। বাগান ভেঙে রেফেউজী কলোনী হয়েছে। ছিটেবেড়ার ঘর—টালির চাল। আবার সুদৃশ্য পাকাবাড়িও অনেক হয়েছে। রাস্তাগুলি আঁকাবাঁকাই আছে—কিন্তু পিচ পড়েছে। তাদের বাড়ির কাছটায় তো একটা বাজার বসে গেছে। চেনা শক্ত। এরই মধ্যে জ্যেঠামশায়ের পুরনো বাড়িটার চারিপাশে নতুনের খোলস পরানো বাড়িটা শ্রীহীন বিবর্ণ ধূলিধূসর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরনো দেওয়ালে নতুন পলেস্তারাতে নোনা ধরেছে। ঝুর ঝুর করে বালি সিমেন্ট খসছে। বাইরে থেকেই বুঝা যায় একটা দিক সেই একতলাই আছে। সেইটেই তার দিক। অজিতদা বাড়িতে ছিল না। বাড়িতে ছিল সুজিত। তারও চেহারা ওই বাড়িটার দেওয়ালগুলোর মত ছাতাপড়া নোনা ধরা।

সুজিত বেরিয়ে এসে বিস্মিত হয়েছিল—নীরা!

—হ্যাঁ।

সুজিতের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের অবধি ছিল না, থাকবারই কথা—কিন্তু তার সঙ্গে ছিল একটা দীনতা। সেটা নীরাকে স্পর্শ করেছিল। বাড়ির ভিতর গিয়ে চারিদিকটা একবার ভাল ক'রে দেখেছিল—শুধু মমতার টানে। সুজিতের বউকে দেখেছিল। বেশ মেয়ে—গৃহস্থ-ঘরের—দুখসইয়ে—ঘরকন্নার কাজে পটু অনুরাগিনী মেয়ে, এরা দুঃখের

ভাত সুখের সঙ্গে সাজিয়ে নিতে পারে; তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারে। সে তাকে চা করে খাইয়েছিল—ফাটা ডাঁটভাঙা কাপে। নীরার মনে পড়েছিল অজিতের সেই মূল্যবান চায়ের সেট।

মনের ভিতরটায় সেই ব্যথাটা অনুভব করেছিল। যেটা সে দাদুর বাড়ি থেকে অনুভব করতে সুরু করেছে। সুজিত দুঃখের কথা বলতে বলতে কেঁদেছিল। বলেছিল—মধ্যে মধ্যে মনে হয় নীরা—হয় তো তোর দীর্ঘনিশ্বাসেই আমাদের লক্ষ্মী ঝড়ে খড়ের চালের মত উড়ে গেল।

বড্ড লেগেছিল তার মনে। কিন্তু কাঁদতে পারে নি। একটু চুপ করে থেকে সে উত্তর দিয়েছিল—বিশ্বাস কর ভাই সুজিত—তুই আমার বয়সে সম্পর্কে বড়, পর নস—আপন জ্যাঠতুত দাদা—তোকে ছুঁয়ে বলছি—আমি কোনদিন তোদের অমঙ্গল কামনা করি নি। আর ভাই এত জোরে সামনে ছুটেছি যে পেছনের দিকে তাকিয়ে আপশোষ করবার বা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবার সময় পাই নি কোন দিন। এই কদিন আগে আমি যেখানে কাজ করতাম সেখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে আসবার সময় গাড়িতে বসে নিজের জীবনটা আগাগোড়া ভেবে দেখেছিলাম। কিন্তু তুই বিশ্বাস কর—রাগ হয়েছে সে সব কথা মনে করে; কিন্তু একবার, তোদের অমঙ্গল হোক এ কথা ভাবি নি।

বউটি বলেছিল—আমি তাই ওকে বলি ঠাকুরঝি। যা গল্প শুনি— তাতে সে মেয়ে শাপশাপান্ত করবে না। দোষ পরের উপর চাপিয়ো না; নিজেদের দোষগুলো সংশোধন কর। মদটদগুলো ছাড়। দুর্দশা ওই জন্যে। বাড়ি বিক্রি করবে—কর—টাকাকড়ি দেনা শোধ দিয়ে যেটুকু পাও নিয়ে—খাটো খাও।

ভারী ভাল লেগেছিল সরল মেয়েটির সাদামাটা কথাগুলি। সাদামাটা হোক—আশ্চর্যরূপে সত্য। সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল—ঠিক বলেছ বউদি। খুব সত্যি কথা।

এই সময়েই এসেছিল অজিতদা।

বস্তীতে রাত্রি যাপন শুধু নয়—এখন একরকম সেইখানেই বাস তার। মধ্যে মধ্যে আসে। প্রয়োজনে। বাড়িতে থাকবারও তার উপায় নেই। পাওনাদারেরা ছেঁকে ধরবে। এরা মোটা পাওনাদার নয়, এরা সব খুচরো পাওনাদার।

অজিতকে দেখে মনে হয়েছিল—এনাক্ষীর কোন দোষ নেই। সে ডাইভোর্স করে ঠিক করেছে। নেশাখোর অশ্লীল—কুৎসিত একটা লোক। সে তাকে দেখেই বলেছিল—মাই গড! তুই যে একেবারে ভেনারেবল লেডী হয়ে উঠেছিস রে। ওঃ—তুই যদি তখন আমার ছবিটায় নামতিস রে! ওঃ আমিও এনাক্ষীর কথা শুনলাম না। শালা—বেটা ডিরেকটারের পাল্লায় পড়ে একটা পুরনো বুড়ীকে ছুঁড়ি সাজিয়ে—

সে ধমক দিয়ে উঠেছিল—অজিতদা।

অজিত চমকে উঠেছিল। ওঠবারই কথা। চিত্ত তার রুচিতেই ছোট হয়ে যায় নি—সব কিছুতেই ছোট হয়ে গেছে সে।

সুজিত বলেছিল—নীরা গভর্ণমেণ্টের স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে পড়তে—

হাঁ হয়ে গিয়েছিল অজিত।

সুজিত বলেই চলেছিল—ও এসেছে ওর অংশের বাড়ি বিক্রি করবে বলে। ও শুনেছে—ওর সইয়ের জন্যে আমরা বাড়ি বিক্রি

করতে পারছি না। এখন ওসব ফিলিম—পুরনো কাসুন্দী ঘাঁটছ কেন? একদম ছোটলোক হয়ে গেছ তুমি। কথাবার্তা পর্যন্ত ভুলে গেছ।

অজিত আশ্চর্য রকম বিনীত এবং ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল এরপর। কোন রকমে বলেছিল—আমি জানতাম না। আমি জানতাম না।

এরপর রাগ চলে গিয়েছিল—দুঃখ হয়েছিল তার। আসবার সময় সে অনেক খুঁজে বিবর্ণ হলদে হয়ে যাওয়া—তার মা-বাবার ও তার ফটোখানা জঞ্জাল খুঁজে বের করে এনেছিল। এর জন্যে সারাটা দিন বিকেল পর্যন্ত সে ওখানে ছিল; সুজিতের বাড়িতেই খেয়েছিল সেদিন।

*

বাড়ির জন্যে সে আট হাজার টাকা পেয়েছিল; কয়েকদিনের মধ্যেই কাজটা শেষ হয়েছিল। বিলেত যাবার সময় সে দশ হাজার টাকার মালিক হয়েছিল। টাকা সে আরও বেশী পেত; দাম কমিয়ে তাকে প্রতারিত করার চেষ্টাটা সে বেশ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু সে আপত্তি করে নি। জেনেশুনেই করে নি। অজিতদারা যদি কিছু বেশী পায়—পাক।

শুধু একটু হেসেছিল।

টাকাটা হাতে নিয়ে আবার মনের মধ্যে সেই বেদনা বা কষ্ট অনুভব করেছিল।

মনে মনে বলেছিল—পিতৃপুরুষের বাস্তুদেবতা আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভাগ্য-দেবতা আমার ভাগ্যে—ঘর সংসার সন্তান লেখেন নি। শৈশবে মা-বাবা তার বিয়ের কল্পনা করেছিলেন—তার বিয়ের জন্যে ইনসিওরও একটা করেছিলেন, কিন্তু বাবার মৃত্যুতেই তার শেষ।

মা সেই তখনই বুঝেছিলেন এই রূপহীনা মেয়ের ভাগ্যে বর নেই, ঘর নেই। তিনি তার কানে-কানে সেটা বলে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। ভুল করেন নি। রূপ তার—সে একটা পেয়েছে। কিন্তু ঘর সংসার স্বামী তার প্রাপ্য নয়—সে জানে। সুতরাং তোমার দেউলে সকাল সন্ধ্যে গলায় আঁচল জড়িয়ে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখানো তো তার ভাগ্য নয়। তার শেষ ক্ষীণ কল্পনা মুছে দিয়েছে বিনো সেন। আজ সে পথে দাঁড়িয়েছে—সুদূর পথের যাত্রী। ঘর! যাদের ভাগ্যে তুমি আছ, তোমার সুখ—যাদের জন্মান্তরের পাওনা—তুমি তাদের হলে। বাস্তু দেবতা—তাদের সেবায় তুমি তৃপ্ত হবে। তারা তোমাকে ঘিরে সোনার দেউল গড়ে তুলুক।

পরে ভেবে দেখেছে, হয় তো এটা নিছক হৃদয়াবেগ, হয় তো কেন নিশ্চয়। তবু এর একটা মূল্য আছে। এতে তার লজ্জিত হবার কারণ নেই। সেদিনও বড় কষ্ট হয়েছিল—কাঁদতে চেয়েছিল—কাঁদা উচিত ছিল—কিন্তু পারে নি—চোখে জল আসে নি।

আবার একবার এমনি হয়েছিল—যখন ইংল্যাণ্ডগামী প্লেনখানা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে একটা বেড় দিয়ে কলকাতাকে পিছনে ফেলেছিল।

দেশের মধ্যে ঘর বলেই দেশ নিজের দেশ। মানুষ ঘরের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ মমতা অনুভব করে বলেই ঘরের জন্য এত মায়া। কিন্তু ঘর তার জন্য নয়—পথ—সম্মুখ—। তার স্থিতি নেই শুধু গতি। শুধু অস্থিরতা।

*　　　*　　　*

ইংল্যাণ্ডে গিয়ে কয়েকদিন এই বিষণ্ণতা বেড়েছিল। ঘরে বসে বসে ভাবত। কেন? কেন এমন হল? চলার পথে দাঁড়িয়ে কেন

ক্লান্তিবোধ? কিছুদিন পর এটা সে চেষ্টা ক'রে কাটিয়ে উঠেছিল। ডুবিয়ে দিয়েছিল নিজেকে শিক্ষার মধ্যে। ক্রমে সাফল্যের মধ্যে উৎসাহ এসেছিল। পারিপার্শ্বিক থেকে উল্লাসের উৎসাহের—জীবনে ছুটে চলার প্রচুর উপকরণ এখানে। প্রচুর। স্বচ্ছন্দগামিনী নদীস্রোতের মত চলেছে। বিচিত্র দেশ, মুক্ত, স্বাধীন। জীবন যে এত মুক্ত এবং হাস্যমুখর হতে পারে, তা সে দেখে বিস্মিত হয়েছিল। এবং তাদের সঙ্গে একদিন নিজেও হাস্যমুখর হয়ে মিলে গিয়েছিল, মিশে গিয়েছিল। শিক্ষা এবং উল্লাসের মধ্যে জীবন চলতে চলতে কিন্তু মধ্যে মধ্যে নীরার জীবনে স্তব্ধতা নেমে আসত। এটা ঘটত দেশের স্মৃতি কোন কারণে জেগে উঠলে। বড় কষ্ট পেত। মনে হ'ত যে হাসি, যে গতিবেগ তার জীবনে ছিল, তাও যেন চিরদিনের জন্য স্তিমিত হয়ে গেছে। হৃদয় যেন ভারাক্রান্ত। এ ভার আর কখনও নামবে না। সে ভাবতে বসত। এই ভাবনার মধ্যে খতিয়ে দেখত, তার তো কোন আকর্ষণের বস্তু সেখানে সে ফেলে আসে নি—তবে কেন? জীবনে তো দেনা কারুর কাছে নেই। জ্যাঠামশায়দের সংসারের সকলের সঙ্গেই তার সম্পর্কে রূঢ়তার সবটুকু ধুয়ে মুছে দিয়ে এসেছে। আর কে? গোপন করবে না—এবং সে করবেই বা কেন—হঠাৎ একদা সে আবিষ্কার করেছিল—যে রূঢ় আচরণ সে বিনো-দার সঙ্গে করে এসেছে, তা ঠিক হয়নি। আরও সহজভাবে হতে পারত। সে চিঠি লিখে জবাব দিয়ে চলে আসতে পারত। একটি কথায় জবাব হ'ত, ছি, বিনো-দা! দেবতা যখন কাঙালীপনা করে তখন মানুষ কি করে বলুন তো?

না, ওটা বড় বেশী নরম হত। সে তো লিখলে পারত—। না,

এ লেখা যেত না। আপনি প্রতিমাকে ভালবেসে আবার আজ আমাকে ভালবেসেছেন। আমি জীবনে কাউকে ভালবাসিনি। আমার এ অনুচ্ছিষ্ট হৃদয় কি যার হাত উচ্ছিষ্ট তার হাতে দেওয়া যায়? না। এ লিখতে সে পারত না। এতে যে লোকে ধরে নিত যে সে তাকে ভালবাসত। সে চিঠি লিখতে বসত বিনো সেনকে। কিন্তু লিখেও ছিঁড়ে ফেলে দিত। বিনো সেনের কাছে ক্ষমা চাওয়া যায় না। সে নিজের অপমান করা। মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে সে তাকে দেখত। বিনো সেন সকাতরে মিনতি করছেন—"ক্ষমা কর। আমি হাত জোড় ক'রে অপরাধ স্বীকার করছি। আমাকে ক্ষমা কর।" কিন্তু সে আর কি করবে? যে আঘাত সে করেছে—তা সে কি ক'রে ফিরিয়ে নেবে? এই একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে সে আবার পরিবর্তিত হয়ে গেল। উল্লাস মুখরতা রইল না—প্রচ্ছন্ন বেদনায় সে যেন বদ্‌লে, শান্ত স্তিমিত হয়ে গেল। বিনো সেন তার অপমান করেছেন—তার চরিত্রের কেউ প্রশংসা করবে না—কিন্তু লোকটি তার জন্য অনেক করেছে। অনেক। স্বদেশের দৃষ্টিভঙ্গি এদেশে এসে কিছুটা পাল্টেছে—সেই দৃষ্টিতে পিছন দিকে তাকিয়ে মনে হল—হ্যাঁ, আঘাত সে রূঢ়তম ভাবে করেছিল—ঠিক হয় নি। স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই, নইলে মন এমন হল কেন? তর্ক যুক্তি অস্বীকার ক'রেও মন যেটা মেনেছে অপরাধ বলে—তাকে অস্বীকার করার উপায় কোথা? ভেবেছিল দেশে ফিরে একবার গিয়ে বলে আসবে ভুলে যাবেন সেদিনের কথা।

* * *

সব আবার বদলে গেল। আবার সে জ্বলে উঠল। আবার জীবনে এল নাটকীয় আঘাত। আঘাত দিলেন বিনো সেন। তাই

সে সারাপথ ভাবতে ভাবতে আসছে—তার জীবন-নাটক থেকে এবার বিনো সেনকে প্রস্থান করতে বাধ্য করবে। শেষ যুদ্ধ হবে তার সঙ্গে। ঘটনাটা ঘটল সেদিন। পাশ করার পর—সে গিয়েছিল ইণ্ডিয়া হাউসে —ইউরোপের বড় শহরগুলিতে যাবার অনুমতির এনডোর্সমেণ্টের জন্য এবং ভিসার সাহায্যের জন্য। সেখানে একজন বিশিষ্ট কর্মচারী তাকে দেখে সবিস্ময়ে বলে উঠেছিলেন—স্ট্রেঞ্জ! আপনি? শুধু তিনিই নন —আরও ক'জনও সবিস্ময়ে তাকে দেখছিল। সে বিব্রত এবং বিরক্ত হয়ে বলেছিল—আপনারা কি বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি না।

অবশেষে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছিল। ইণ্ডিয়া হাউসে ভারতীয় শিল্পীদের কিছু ছবি সত্ত এসেছে। তার মধ্যে একখানি বড় ছবি এসেছে। মহাশ্বেতা! ছবিখানি যত ভাল—তত ভাল তার বিষয়টি। অপূর্ব রোমান্টিক! কবি বাণভট্টের কাদম্বরীর অন্তর্গত। সে জানে—সে জানে মহাশ্বেতার কথা।—প্রতিমাকে মহাশ্বেতা করে আঁকতে চেয়েছিলেন বিনো সেন। লক্ষ্মীর মানস পুত্র—নাম পুণ্ডরীক—ঋষিকুমার আর মহাশ্বেতা অপরূপা গন্ধর্ব রাজকন্যা। তুজনে তুজনকে দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু মিলনের পূর্বেই বিরহ সইতে না-পেরে পুণ্ডরীকের মৃত্যু হল। মহাশ্বেতাও আত্মহত্যা করতে গেল। কিন্তু দেবতা আদেশ করলেন—না। তপস্যা কর। পুণ্ডরীককে ফিরে পাবে। সে আসবে নবজীবনে তোমার কাছে। দেবতার আদেশে মহাশ্বেতা হলেন তপস্বিনী। কঠোর তপস্যা করলেন, পুণ্ডরীকও জন্মগ্রহণ করল বৈশম্পায়ন হয়ে। এক রাজার মন্ত্রীপুত্র হয়ে। রাজার পুত্র চন্দ্রাপীড়ের সখা, তার ভাবী মন্ত্রী। ক্রমে যুবক হলেন তুজনে। গেলেন একদা দিগ্বিজয়ে।

বৈশম্পায়ন গিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনী নিয়ে গন্ধর্বলোকে। সেখানকার রাজকন্যা কাদম্বরীর সঙ্গে চন্দ্রপীড়ের প্রণয়ই মূল ঘটনা—কিন্তু সে অন্য কথা। সেই অরণ্যে শিলার উপর ব্রহ্মাসনে বসে মহাশ্বেতা তপস্যা করছিলেন মৃত্যুপর থেকে দয়িতের প্রত্যাগমনের জন্যে। এলেন দয়িত। বৈশম্পায়ন অকস্মাৎ তপস্বিনীকে দেখে যেন কোন্ অস্পষ্ট অথচ দুর্নিবার স্মৃতির আকর্ষণ অনুভব করলেন। অনুভব করলেন সর্বদেহ দিয়ে ওই দেহ স্পর্শের উন্মাদনা। তিনি অগ্রসর হলেন, তুমি আমার। তুমি আমার। তপস্বিনী মহাশ্বেতা আকস্মিকতার মধ্যে চিনতে পারলেন—ঠিক। শীর্ণ দেহ তপস্বিনী প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর আয়ত চোখে আগুন ঝলসে উঠল—ফিরে আসা হারানো দয়িত সেই বহ্নিতে ভস্ম হয়ে গেল। এ সেই ছবি। কিন্তু ছবির মহাশ্বেতা আর নীরা যেন এক। আশ্চর্য সাদৃশ্য—দেখলেই চেনা যায়। মনে হয় যেন তাকে মহাশ্বেতার মডেল করে বসিয়ে শিল্পী এ ছবি এঁকেছে। দেখেছিল সে সে-ছবি। বিনো সেনের আঁকা। মহাশ্বেতা সে-ই। মনে পড়ল অসুখের পর পথ্যের দিন সে আয়নায় তার রোগক্লিষ্ট মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই সময় অনিমাদি এসে বলেছিল, বিনো সেন একদিন তার ঘুমন্ত অবস্থায় ফটো নিয়েছিল, বলেছিল, সতীর দেহত্যাগ ছবি আঁকবে। মুহূর্তে তার রাগ হয়ে গিয়েছিল। চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। ছবির মহাশ্বেতার মুখ সেই মুখ, দৃষ্টি সেই দৃষ্টি। অনিমাদির সঙ্গে কথা যখন বলছিল—তখন তার খাটের সামনেই ছিল তার শখ করে কেনা ড্রেসিং টেবিলটার আয়না। অনিমাদির কাছে যে মুহূর্তে শুনেছিল—বিনো সেন তার ফটো তুলে নিয়ে গেছেন—সেই মুহূর্তে তার মনে হয়েছিল—কি বিশ্রী

চেহারার ছবি নিয়েছেন বিনো সেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে তাকিয়েছিল আয়নার দিকে। দেখেছিল তার রোগশীর্ণ মুখে আয়ত চোখ দুটো শাণিত খড়্গের মত ঝকমক্ করছে। কিন্তু বিশ্রী মনে হয় নি। একটি তেজস্বিনীর শীর্ণ মুখে চোখের দীপ্তি সত্যই ভাল লেগেছিল। এ ছবি সেই ছবি। ঠিক সেই ছবি! আর সামনে ভস্মীভূত বৈশম্পায়নের মুখে অবয়বে বিনো সেনের নিজের আদল। ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা মূর্তির মত তবু তার মধ্যে মানুষটিকে চেনা যাবার মত করে এঁকেছে বিনো সেন। দেখতে দেখতে ইণ্ডিয়া হাউসের অনেকজনের কাছে খবর পৌঁছেছিল এবং অনেকজন উঁকি মেরে দেখেছিল তাকে। সে নিজে শুধু অস্বস্তি অনুভব করে নি, মনে হয়েছিল এরা সকলে মনে করছে এ অতি নিষ্ঠুরা অতি ভাগ্যহীনা। তারপরও যতদিন গিয়েছে এরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। একদিন কাগজওয়ালারা অতর্কিতে ফটোও নিয়েছিল। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় তার এতদিনের বেদনাতুর মন—বেদনাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার উগ্র রূঢ় হয়ে উঠেছিল। মনটা তার বিষিয়ে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছিল—ছি—ছি—ছি। আপনি তো মরেন নি বিনো-দা। তবে? ছি—ছি।

সেই ক্ষোভেই সে এত চঞ্চল হয়েছিল যে ইয়োরোপ ঘুরবার কল্পনা সংকল্প একেবারে বাতিল ক'রে দিয়ে—ভারতবর্ষে আসবার ব্যবস্থা করে প্লেনে চেপে বসেছিল। তার জীবনের নাটক থেকে বিনো সেনকে চিরদিনের মত প্রস্থান করতে বাধ্য করবে।

কলকাতায় ফিরেই সে সর্বপ্রথম বিনো সেনের কাছে যাবে

একবার। নাটক আর সে করবে না। তবে বিনো-দাকে জিজ্ঞাসা সে করবে, পুণ্ডরীক পরজন্মে বৈশম্পায়ন—তার কি প্রতিমার মত আর কোন প্রণয়িনী ছিল? এবং সে কি মহাশ্বেতার মত প্রণয়মুগ্ধ গন্ধর্ব রাজকন্যা? যাকে জীবনে পথের খোয়ায় কাঁটায় পা দুখানা ক্ষতবিক্ষত করে চলতে হয়েছে, যে জীবনের প্রেমের স্বপ্নকে রূঢ়ভাবে নিজের হাতে ভেঙে দিয়েছে, মুছে দিয়েছে, তাকে এমন ব্যঙ্গ এমন অপমান আপনি কেন করলেন? এমন অপমান যে মনা ঘোষ করে নি, সোমেশবাবুর ছেলে করে নি! ছি! ছি! ছি!

না, নাটকই করবে সে। তার জীবন-নাটক চরম নাটকীয়তার মধ্যে সমাপ্ত হওয়াই ভাল।

সে বিষ নিয়ে যাবে। বিনো সেনকে বলবে—এত ভালবাসেন তা আমি জানতাম না বিনো-দা। জেনে আজ আর আপনাকে পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতার আমার সীমা নেই। কিন্তু ওই প্রতিমাকে সামনে রেখে আপনাকে আমি পেতে চাইনে। আপনাকে পেতে চাই নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে। আসুন, দুজনে বিষ খাই। আসুন—নিন—খান—আমিও খাচ্ছি। নিন—।

সে জানে বিনো সেন বিবর্ণ হয়ে যাবেন। ভয়ে পিছিয়ে যাবেন, বলবেন—না নীরা, না—

সে অট্টহাসি হাসবে।

ঠিক সেই সময়েই প্লেনের লাউডস্পীকারে ঘোষণা হয়েছিল—Attention please.

আমরা দমদম পৌঁছে গেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই।

সে ওই সংকল্পে উৎসাহিত হয়েই নিজের বেল্ট বেঁধেছিল। প্লেনটা

নামছিল। সেই কলকাতা। ওই ওই দিকে তাদের বাড়ি ছিল। ওই গঙ্গা—ওই তেরতলা সেক্রেটারিয়েট। ওই ডোমটা—

খস করে চাকাটা রাণওয়ে স্পর্শ করল ছোট একটি ঝাঁকুনি দিয়ে।

*　　*　　*

কল্পনার উৎসাহ বোধহয় স্থায়ী হয় না। তাই নামল সে সেই বিষণ্ণ ক্লান্ত অথচ রূঢ় চিত্ত নিয়ে। বিনো সেনের সঙ্গে বুঝাপড়া সংকল্পে সে স্থিরই আছে।

দেশের মাটিতে নেমে একটা আবেগ বুকের মধ্যে পুঞ্জিত মেঘের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। ছায়া নেমেছে অন্তরে। কিন্তু তার মেঘ বন্ধ্যা মেঘ। জল বর্ষণ করে না। দু ফোঁটা চোখের জল ঝরলে সে নিজেকে ধন্য মনে করত ; তার ক্লান্তি বিষণ্ণতাও বোধহয় কেটে যেত। কিন্তু কান্না তার আসে না।

সে যাত্রীদের সঙ্গে কাস্টমস আপিসে এসে ঢুকল। এই এক পর্ব। কাস্টমস।

—নীরা !

কাস্টমসের কাজকর্ম সেরে সে লাউঞ্জে এসে ঢুকল। আন্তর্জাতিক জনতার ভিড়। সেই ভিড়ের ভিতর থেকে কে যেন তাকে ডাকলেন—নীরা।

পরিচিত কণ্ঠস্বর। নারী কণ্ঠ। কিন্তু কে ? কোন দিক থেকে কে ডাকছে। চারিদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সন্ধান করলে সে। হঠাৎ চোখে পড়ল এয়ার ইণ্ডিয়ার ওদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটি স্থূলাঙ্গী প্রৌঢ়া—অনিমাদি ! বিস্ময় একটু বোধ করলে সে। অনিমাদি

এখানে? তাকে নিতে এসেছেন? না—না—তা কেন হবে! সে জানবে কি করে? আসবেই বা কেন? সেই রাত্রি থেকে তো কোন সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে!

অনিমাদি এসে কাছে দাঁড়িয়ে তাকে আপাদমস্তক দেখে বললেন—ফিরে এলি বুঝি?

—হ্যাঁ! এই কাস্টমস থেকে বের হলাম।

অনিমাদি আবার একবার তাকে ভাল করে দেখে ম্লান হেসে বললেন—তা বেশ। বড় সুন্দর হয়েছিস রে।

অনিমাদিরও যেন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কেমন যেন—!

হ্যাঁ, অনিমাদিও অনেক পাল্টেছেন। খুব একচোট হেসে আজ আর নীরার গলা জড়িয়ে ধরে গুরুভার দেহখানি নিয়ে তার উপর ঢলে পড়লেন না।

শান্তভাবে অনিমাদি বললেন—ভাল ছিলি? উঁহু! অনেক রোগা হয়ে গেছিস। বেশ খানিকটা পাল্টে গেছিস।

—মেমসাহেব হয়েছি?

—না। কেমন যেন মরা মরা মনে হচ্ছে। তা এখন উঠবি কোথায়?

—দেখি। কোন হোটেলে বা বোর্ডিংয়ে। দাদু থাকলে সেখানে যেতে পারতাম। তা—। একটু চুপ করে থেকে বললে—তা তুমি এখানে কোথায়? কেউ আসবে বুঝি? সঙ্গে সঙ্গে মনে হল—বিনো সেন। মুহূর্তে সে ব্যস্ত হয়ে বললে—আমি যাই।

—দাঁড়া না একটু। কেউ আসছে না—আমি যাচ্ছি।

—প্লেনে? কোথায়?

—ডালহৌসি।

—ডালহৌসি? সেখানে কি? চাকরি? এখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়েছ? বেশ করেছ। নীরা খুশি হয়ে উঠে—একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে ফেললে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনিমাদি বললেন—না। সেখানে বিনো-দা থাকেন। আমিই তাকে দেখি। আর তো কেউ দেখবার নেই।

সমস্ত পারিপার্শ্বিকটা এত বড় এরোড্রোমের সব কিছু যেন এলোমেলো হয়ে কেমন হয়ে গেল। পুতুলের মত নীরা বললে—ডালহৌসিতে বিনো সেন থাকেন! তুমিই তাকে দেখ? আর তো কেউ দেখবার নেই! কি বলছ এসব?

—সে অনেক কথা নীরা। বিনো-দার টি-বি হয়েছে।

—টি বি হয়েছে?

নীরার পায়ের তলায় একটা যেন ভূমিকম্প হয়ে গেল। সে স্থান কাল ভুলে গিয়ে চীৎকার করে উঠল—কি বলছ তুমি? অনিমাদি?

আশপাশের লোকজন তার কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে তার দিকে তাকালে। অনিমার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসছিল; সে কথা কইতে পারলে না, আত্মসম্বরণের জন্য নীরব থেকেই সে ঘাড় নেড়ে জানালে—হ্যাঁ। বিনো সেনের টি—বি! সেই সবল প্রাণবান বিনো সেন? অসম্ভব! কি ক'রে হয়। অপ্রত্যাশিত অসম্ভব সংবাদের আকস্মিক আঘাতেই বোধহয় তার দীর্ঘ-পথক্লান্ত দেহের স্নায়ুতে শিরায় কম্পনের মত একটা প্রবাহ বয়ে গেল। কেঁপে উঠল সে। পা কাঁপছে, হাত কাঁপছে—ঠোঁট কাঁপছে। বুকের ভিতরটায়

ধড় ধড় করে আছাড় খাচ্ছে হৃদপিণ্ড। আকাশ যেন কেমন হয়ে গেছে। গাছপালা মানুষ-জন সব অর্থ হারিয়ে ফেলেছে নীরার কাছে।

খানিকটা স্তব্ধ থেকে আত্মসম্বরণ ক'রে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে অনিমা বললে—সে-ই সর্বনাশী। মানুষটাকে ধ্বংস ক'রে দিয়ে গেল। প্রতিমা।

ইলেকট্রিক শক্ খেলে নীরা। বললে—তার অপরাধ?

—অপরাধ? সবটাই অপরাধ। তার ছিল—সে রোগ নিয়েই তাকে জড়িয়ে ধরল। বলে নি। তুই যে দিন চলে এলি—সকল লোকের সামনে তাঁর মাথায় ওই কলঙ্ক চাপিয়ে—তখন দিন তিনেক ভেবে তিনি প্রতিমাকে নিয়ে কলকাতা এলেন। সে অনেক কথা। প্রতিমা বিধবা ছিল না। স্বামী তার বেঁচে ছিল। সদ্য ডাইভোর্স আইন পাশ হয়েছে তখন—ডাইভোর্স করিয়ে নিয়ে বিয়ে করলেন। মাস তিনেক পর রোগ প্রকাশ পেলে বাঁধভাঙা বন্যার মত। উনি সানাটোরিয়ামে দিতে চাইলেন। সে চিৎকার ক'রে কাঁদতে লাগল—না-না-না শেষ কটা দিন তোমাকে নিয়ে থাকতে দাও। উনিও তাই শুনলেন। দু-হাতে সেবা করলেন! সে মরল। ওঁর রোগ ধরল।

একটু চুপ ক'রে থেকে অনিমাদি বললে—লোকে কিন্তু বললে—এ বিনো-দা, তোর উপর অভিমানে—

—আমার উপর অভিমানের তাঁর অধিকার?

—ভালবাসার!

—সংসারে যারা দুজন চারজন মেয়েকে একসঙ্গে ভালবাসে অনিমাদি তাদের ভালবাসা ভালবাসা নয়—সেটা হল লাম্পট্য। তার আবার অভিমান কিসের? অভিমান! মহাশ্বেতা ছবি এঁকে

যে অপমান তিনি আমার করেছেন—তার শোধ নিতে দেখা করব ভেবেছিলাম। তা থাক, রুগ্ন জনকে দয়াই করব। আমি সে ছবি ইণ্ডিয়া হাউসে দেখেছি। এত ছোট বিনো সেন!

—নীরা! ওরে তোর জন্যে মানুষটা—মরণকে ডেকে নিলে; আর তুই—

নীরা বলেই গেল—থামল না—প্রতিমাকে বিয়ে করেছিলেন এর জন্যে তোমাদের বিনো-দাকে ধন্যবাদ দি। তার জন্যেই তাকে মার্জনা করতে রাজী আছি। প্রতিমাকে ভালবাসতেন—অনেক দিন থেকে—বিয়ে অনেক আগে করা উচিত ছিল—। শেষে করেছেন এবং বিবাহিতা স্ত্রীর সেবা করতে গিয়ে রোগ ধরিয়েছেন আতিশয্যে, তার মধ্যে আমাকে টানছ কেন? আমার জন্যে মরণকে ডেকে নিয়েছেন! তোমার নিজের একটু বোধ নেই অনিমাদি? এমন অন্ধ তুমি? ছি!

—তুই অন্ধ। নীরা তুই অন্ধ!

—বেশ তাই। তা—যাও তুমি—আমিও যাই। বড় ক্লান্ত আমি। কিছু মনে করো না।

—না। অনিমাদি তার হাতটা চেপে ধরলেন। আকর্ষণ করে বললেন—আয় আমার সঙ্গে একটু নিরালায়। যাবি—কিন্তু সবটা শুনে যা। যেতে হবে শুনে।

এ দৃঢ় কণ্ঠস্বর অনিমাদির কাছ থেকে কখনও শোনে নি। বিস্মিত হল নীরা। অনিমা বললে—তুই এমন একটা লোকের যা ক্ষতি করলি—বধ করলি একরকম—

—অনিমাদি!

—হ্যাঁ, হাজার বার বলব। আমি যে সব জেনেছি। তুই জানিস নে, তুই তাকে ভালবাসতিস।

—না।

—হ্যাঁ। বাসতিস। হয় তো বাসিস। আমি জানি যে। তোর অসুখের সময় বিকারের মধ্যে চেঁচাতিস। আমি মাথার শিয়রে বসে শুনেছি। প্রতিমাকে তুমি ভালবেসো না বিনো-দা। বিনো-দা।

—অনিমাদি। বিহ্বল হয়ে গেল নীরা।

অনিমাই কথা বলতে বলতে তার হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে নির্জন স্থানে এসে উপস্থিত হয়ে বললে—এইখানে দাঁড়া। না—ওই বাঁধানো বেঞ্চটায় বস। শুনে যা কি করেছিস।

প্লেনের ওঠানামার ঘর্ঘর মুখরতার মধ্যে বলে গেল অনিমা—

—আমি জানি। তোর অসুখের সময় আমি না তোর শিয়রে থাকতাম। বিনো-দা থাকতেন বাইরে। যেদিন প্রলাপ বকেছিলি—তার মধ্যে অনেক বলেছিলি। বিনো-দা বলেছিলেন, এ কথা যেন কেউ না শোনে অনিমাদি। ওকেও বোলো না। তুই নিজে যদি সত্যিই না জানিস—তবে জেনে যা। চুপ করেই রইল নীরা। মনে মনে প্রশ্ন করতেও ইচ্ছে হল না। এই ক্লান্ত বেদনার্ত মুহূর্তে কথাটা মেনেই নিলে। না-মেনে উপায় নেই। বুকের ভেতর বাঁধা বাঁধা কান্নার হ্রদে অকস্মাৎ যেন তুফান জেগেছে। মনে হচ্ছে হ্রদের গভীরে কোন এক বিরাট শিলা-চাপা উৎস-মুখ থেকে শিলাখণ্ডটাকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। এখন বাক্য, শুষ্ক বাদ প্রতিবাদ, যুক্তি-তর্ক সব মিথ্যা হয়ে গেছে। অমৃততপস্বীর মৃত্যুতে প্রকাশিত এক অমোঘ সত্যের

মত, মৃত্যুপণে অনশনব্রতীর নিষ্ঠুর ক্ষুধার মত তার অন্তরের যেন উদ্ঘাটিত হচ্ছে। সে এই পর্যন্ত বলতে পারে—ওই মানুষের শেষ সত্য নয়; তাই অমৃতের তপস্যাও মানুষ ছাড়বে না, এবং ক্ষুধার সত্য নিষ্ঠুর পীড়নের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করলেও মানুষ অনশন ভঙ্গ করে না—করবে না। সেও করবে না স্বীকার।

অনিমাদি যেন একটি বৈরাগ্যময় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিচিত্র বিষণ্ণ একটি হাসি তার মুখে ফুটে উঠল—আক্ষেপভরা কণ্ঠে বললে—প্রতিমা! আঃ ছি-ছি-ছি রে! নীরা কি যে বলব রে ভেবেই পাইনে। বিনো সেনের ভালবাসার জন্যে কি মাথা খোঁড়া সে তো দেখেছিস—অথচ বিনো-দা কোন দিন তাকে ভালবাসেন নি। ডালহৌসিতে বসে বিনো-দা সেদিন বললেন—অনিমাদি—ওকে আমি কোন দিনই ভালবাসি নি। ওর এত রূপ—প্রথম যৌবন যখন আমার তখন ওর কৈশোর; তখনও কোন দিন এতটুকু ভাল লাগে নি। ঈশ্বর সাক্ষী। ওর দাদা—আমাদের দাদা ছিলেন—ফাঁসী গেলেন। তাঁর কাছে কথা দিয়েছিলাম ওকে দেখব—ওর বিয়ে দিয়ে দেব। সেই শপথ আমার একমাত্র বন্ধন। যাঁর সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছিল—উন্মাদের মত প্রতিমা যাকে ভালবেসে ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছিল—তিনি আজও জীবিত, বাংলাদেশের বিখ্যাত লোক—শিল্পী গুণী। যে গুণীরা গুণের বদলে আঠার আনা সুখ চান—বত্রিশ আনা স্বেচ্ছাচারের স্বাধীনতা চান—সেই ধরণের গুণী। পৃথিবীর কোন আইন তাদের জন্যে নয়, একমাত্র ভাল লাগাটাই আইন। বিনো-দা বললেন—আমি জানতাম। তবে প্রতিমা ওকে এমনিভাবে পাগলের মত ভালবাসবে তা অনুমান করতে পারি নি। কারণ যে দাদা ফাঁসী

তারই বোন তো! তার সংযম থাকবে না যাচাই থাকবে ভাবতে পারি নি। আর যখন ওরা পালিয়ে এসে কলকাতায় করলে তখন আমি এ্যাবস্কণ্ডার। তারপর জেল। জেল থেকে বেরিয়ে ওদের বাড়ি গেলাম তখন ওরা খুব সুখী। খুশি হয়েছিলাম। আবার চলে গেলাম। বিয়াল্লিশ সালে ধরা পড়লাম। পঁয়তাল্লিশে বের হলাম। কলকাতায় গিয়ে বন্ধুর বাড়ি গেলাম। বন্ধু খ্যাতিমান ব্যক্তি তখন আরও খ্যাতিমান হয়েছেন—রাজনৈতিক দলের হিরো। আমাকে দেখে ভুরু কোঁচকালেন। বললেন—কি খবর? জিজ্ঞাসা করলাম—কেমন আছ? প্রতিমা কই, সে কেমন আছে। শুকনো গলায় বললেন—ভাল আছে। প্রতিমা এখানে নেই। প্রশ্ন করলাম কোথায়? চুপ করে থেকে একটু পরে বললেন—সে এখানে থাকে না বিনয়। জিজ্ঞাসা করলাম মানে? হেসে বললেন—দেখ তাকে বিয়ে করাটা আমার ভুল হয়েছিল। শুধু রূপময় খানিকটা মাংসস্তূপ নিয়ে যারা ঘর করে তাদের একজন আমি নই। মন—শিক্ষিত মন প্রয়োজন। সেই মনের খোঁজ যেদিন পেলাম—পেলাম অবশ্য কালচারাল ফাংসনে ঘুরতে ফিরতে এবং বুঝতে পারলাম—তাকে নইলে আমার সৃষ্টিশক্তি শেষ হয়ে যাবে। তবুও কিছুদিন চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এমন ঘটল—যে তাকে বিবাহ আমাকে করতেই হল। এবং বিবাহ করলাম। শর্ত হল—প্রতিমাকে পরিত্যাগ করব। সুতরাং—। অবশ্য আমি তাকে কিছু ক'রে খরচ দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু প্রতিমা নেয় নি। চলে গেছে। জানিনে ঠিক কোথায় থাকে। তবে আনার বদনাম করে বেড়ায়। হেসে বললেন, তা বেড়াক। আমার তাতে ক্ষতি হবে না। বিনো-দা বললেন—অবশ্য আমি খুব

বিস্মিত হই নি এতে। কিন্তু বিস্ময়ের সীমা আমার রইল না যে। প্রতিমাকে দেখলাম সন্ধ্যায় এসপ্ল্যানেডে সেজেগুজে ফিরছে, চো অসুস্থ দৃষ্টি। আমাকে দেখে ছুটে পালাতে চেষ্টা করলে। কি পারে নি। আমি ওকে ধরে গাড়ি করে নিয়ে এলাম। গাড়িতে আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করলে। ঘেন্নায় দেহ-মন রি রি করে উঠল। কিন্তু দাদার মুখ মনে পড়ল। আর দেখলাম ও সত্যি অসুস্থ। জ্বর ভোগ করছে। তারপর অনেক বুঝিয়ে ওকে সানা টোরিয়ামে দু-বছরের উপর রেখে সুস্থ করে তুললাম। টি-বি ওর তখন থেকে। তার মধ্যে ভাল হয়েছিল। ও স্বামীর উপর আক্রোশ করে বিধবা সাজলে। বললাম তাই সাজ। কিন্তু গুণী লোক তার নামটা প্রকাশ কর না। ওকে আশ্রমে এনে ছেলেদের ভার দি ওকে মা ক'রে দিতে চাইলাম। কিন্তু আমার কপালে এই আছে— কপাল ছাড়া আর কি বলব? ও কিছুতেই মায়ের মনে পৌঁছুল না কি যে হল ওর মনে ধারণা আমি ওকে ভালবাসি এবং আমাকে নইলে ওর জীবন ব্যর্থ বৃথা—আমায় পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠল। একদিন আত্মহত্যা করতে চেষ্টা করলে। আফিং খেলে। উন্মাদের মত বলতে লাগল, না আমি বাঁচব না। কি বেঁচে লাভ? আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, একবার বল ভালবাসি। সেই দিন ওকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বললাম। নইলে ডাক্তারদের চেষ্টা ও জোর করে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। বললাম—বাসি। কিন্তু একটা কথা প্রতিমা। তার মধ্যে মিলনের আশা রেখো না। কারণ তুমি আমার বন্ধুর স্ত্রী। তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা হবে। এবং পাপ হবে। বিবাহ অসম্ভব। কারণ হিন্দু বিবাহে ডাইভোর্স হয় না। এবং সে যে লোক তাতে